ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারী‘আহ্ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
এম.এম. রফিকুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-২২৭/২০১২-২০১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর ২০১৭

এম.ফিল থিসিস

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারী'আহ্ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

এম.এম. রফিকুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৭

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারী‘আহ্ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
এম.এম. রফিকুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-২২৭/২০১২-২০১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর ২০১৭

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা ও মমতাময়ী মা এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের প্রতি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সীমাহীন উৎসাহ-উদ্দীপনা আর অফুরন্ত দু‘আকে পাথেয় করে এ স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

ঘোষণা পত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি যে, **ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারী'আহ্ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** শীর্ষক শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও দিক-নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণাকর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোন গবেষক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

তারিখ, ঢাকা
ডিসেম্বর ২০১৭

এম.এম. রফিকুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-২২৭
শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Md. Akhteruzzaman
Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka

সূত্র : তারিখ : ০৭ ডিসেম্বর ২০১৭

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক এম.এম. রফিকুল ইসলাম কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারী'আহ্ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে লিখিত ও সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটা সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম; কোন যুগ্মকর্ম নয়। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে নানামুখী বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারী'আহ্ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে সর্বপ্রথম পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু মহান আল্লাহর দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সর্বপ্রথম সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রতি। তিনি অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণ থেকে শুরু করে গবেষণা কর্মের শেষ পর্যন্ত অবিরাম উৎসাহ-উদ্দীপনা, অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় ও উপ-অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ সযত্ন পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন-বিয়োজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটিকে এর অবয়ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ দৃষ্টিনন্দন ও প্রাণবন্ত স্তরে উন্নীত করতে নিরন্তর সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সহজ ও সম্ভব হয়েছে এবং এটা মানসম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করি। কাজেই আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ও বিশেষভাবে ঋণী।

কর্মময় জীবনে নানাবিধ ব্যস্ততার মাঝেও যার আন্তরিক উৎসাহ, প্রেরণা ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশের ফলে এ গবেষণা কর্ম ত্বরান্বিত হয়েছে তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ স্যার, বিভাগীয় অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। স্যারের এ ঋণ সম্মান ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি ও মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি। সাথে সাথে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ বিশেষভাবে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর ড. শেখ মোঃ ইউসুফকে। তার অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ এ গবেষণা কাজে যথেষ্ট সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়া আরও অনেকে যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে নিজেকে অপরাধী মনে করব। তাদের মধ্যে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান। আমার অনূজ মোঃ মেহেদী হাসান, সহকারী অধ্যাপক, এ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের সকলের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ এবং তাদের সকলকে সম্মানের সাথে স্মরণ করছি।

বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মা এবং পরিবারের আপনজন যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে নানাভাবে আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান, কল্যাণ কামনা ও দু'আ করেছেন যার ফলে গবেষণকর্মটি শেষ পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে, আমি মহান আল্লাহ্র দরবারে তাদের জন্য প্রার্থনা করছি যেন তিনি তাদের সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ আমার সহধর্মিনী মিসেস জাহানারা ইসলাম, দুই পুত্র জিহান আল ফুয়াদ ও রুহান আল ফুয়াদ তাদের

মূল্যবান সময় নষ্ট করে গবেষণা কর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তাদের ত্যাগ-তিতীক্ষা কখনো ভুলবার নয়। মহান আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

উক্ত অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব লাইব্রেরি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় আমি মুগ্ধ। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্স একাডেমী লাইব্রেরি, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক ইকনমিক রিসার্চ ব্যুরো লাইব্রেরি, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের খুলনা শাখা লাইব্রেরি প্রভৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রেজিস্ট্রার অফিস এবং এম.ফিল শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ আমাকে গবেষণাকর্মের জন্য দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় কাজকর্মে যথেষ্ঠ সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন। মহান আল্লাহ্ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন এ কামনা করি।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমি ইসলামি ব্যাংকিং, ইসলামি শারি'আহ্ ইত্যাদি বিষয়ের উপর লিখিত দেশি-বিদেশি লেখকের রচনা, প্রতিবেদন, প্রামাণ্য পত্র-পত্রিকা ও জার্নালের সহযোগিতা গ্রহণ করেছি এবং যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সেসব লেখকের নাম, তাদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম স্বশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেছি এবং তাদের কাছেও বিশেষভাবে ঋণী।

অভিসন্দর্ভটি দক্ষতা, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণ ও সুবিন্যস্ত করে গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করার জন্য জনাব এ.বি.এম নূরুল্লাহ'র কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্র কাছে আকুল প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর এ নগন্য বান্দার ক্ষুদ্র সাধনা কবুল করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

এম.এম. রফিকুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক

প্রতিবর্ণায়ন (رموز تلفظ الحروف العربية بالبنغالية)

‘আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
اَ ء	অ	ض	দ/জ্ব	ـَـ	া	وُ	উ
ب	ব	ط	ত্ব	ـِـ	ি	وُوْ	ঊ
ت	ত	ظ	য	ـُـ	ু	وِيْ	বি/ভী
ث	ছ	ع	‘	ـَا	া	يَ	ইয়া
ج	জ	غ	গ	ـِيْ	ী	يِ	ই
ح	হ	ف	ফ	ـُوْ	ূ	يِيْ	ঈ
خ	খ	ق	ক্ব/ক	أَ	আ	يُ	য়ু
د	দ	ك	ক	أ	আ	يُوْ	য়ূ
ذ	য	ل	ল	إِ	ই	عَ	‘আ/‘য়া
ر	র	م	ম	إِيْ	ঈ	عَا	‘আ/‘য়া
ز	য	ن	ন	أُ	উ	عِ	ই
س	স	ه	হ	أُوْ	ঊ	عِيْ	ঈ
ش	শ	و	ও	وَ/وَا	ওয়া	عُ	উ
ص	ছ	ي	য়	وِ	বি	عُوْ	ঊ

ع সাকিন হলে (‘) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, شريعة = শারি‘আহ, شرعي = শারই‘, بيع = বায়‘, جامع = জামি‘, رعد রা‘দ প্রভৃতি।

ء আলিফের মত। তবে সাকিন হলে (’) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, تَأْجِيْرٌ = তা’জীর, تَأْثِيْرٌ = তা’ছীর, تَأْمُرُ = তা’মুরু প্রভৃতি।

বহুল প্রচলিত বাংলা শব্দের বানানগুলো অনেক ক্ষেত্রে যথা অবস্থায় রাখা হয়েছে। যেমন- মুনাফা, কর্জ, আলিম, ফরজ, মাজহাব প্রভৃতি।

শব্দ সংক্ষেপ

অনুঃ	:	অনুবাদ
অনূঃ	:	অনূদিত
আইবিবিএল	:	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
এআইবিএল	:	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
এসআইবিএল	:	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
এসজেআইবিএল	:	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আইবিএফ	:	ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন
আ.	:	‘আলাইহিস সালাম
আঃ	:	আয়াত
১ম	:	প্রথম
২য়	:	দ্বিতীয়
৩য়	:	তৃতীয়
৪র্থ	:	চতুর্থ
৫ম	:	পঞ্চম
৬ষ্ঠ	:	ষষ্ঠ
৭ম	:	সপ্তম
৮ম	:	অষ্টম
৯ম	:	নবম
১০ম	:	দশম
প্রাগুক্ত	:	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
বি.	:	বিশেষ
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
তাং	:	তারিখ
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
পাণ্ডু	:	পাণ্ডুলিপি
মু.	:	মুদ্রণ
মূ.পা.	:	মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল অনুরূপ)
পরি.	:	পরিশিষ্ট
সা.	:	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

রা.	:	রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু/‘আনহা
র./রহ.	:	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি
দঃ/দ.	:	দরুদ
হি.	:	হিজরী সাল
খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিষ্টাব্দ/খৃষ্টাব্দ
খৃ.	:	খৃষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দ
খৃ.পূ.	:	খৃষ্টপূর্ব
ড.	:	ডক্টর (পিএইচ.ডি./ Doctor of Philosophy)
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
সং	:	সংস্করণ
লিঃ	:	লিমিটেড
AAOIFI	:	Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
ADB	:	Asian Development Bank
AIBL	:	Al-Arafah Islami Bank Limited
Amt.	:	Amount
ATM	:	Automated Teller Machine
BAB	:	Bangladesh Accreditation Board
BB	:	Bangladesh Bank
BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
BCCI	:	Bangladesh Chamber of Commerce and Industries
BCI	:	Bangladesh Chamber of Industries
BCPBS	:	Basel Core Principles for Banking Supervision
BCSIR	:	Bangladesh Council of Science and Industrial Research
BEPZA	:	Bangladesh Export Processing Zone Authority
BGMEA	:	Bangladesh Garments Manufacturing and Export Association
BIBM	:	Bangladesh Institute of Bank Management
BIIT	:	Bangladesh Institute of Islamic Thought
BIM	:	Bangladesh Institute of Management
BITAC	:	Bangladesh Industrial and Technical Assistance Centre
BJMA	:	Bangladesh Jute Mills Association
BKMEA	:	Bangladesh Knit ware Manufacturers and Exporters
BMDC	:	Bangladesh Management Development Centre

BMRE	:	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion
BOI	:	Board of Investment
BOO	:	Build, Own and Operate
BOT	:	Build, Operate and Transfer
BRPD	:	Banking Regulation and Policy Department
BSCIC	:	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation
BSTI	:	Bangladesh Standard and Industry Testing Institution
BTMA	:	Bangladesh Textile Mills Association
BUET	:	Bangladesh University of Engineering and Technology
CAMELS	:	Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity of market risk
CAR	:	Capital Adequacy Ratio
CBN	:	Cost of Basic Needs
CCCI	:	Chittagong Chamber of Commerce and Industry
CDS	:	Central Depository System
CETP	:	Central Influent Treatment Plant
CIP	:	Commercially Important Person
CRIE	:	Centre for Research in Islamic Economics
CRISL	:	Credit Rating Information & Service Ltd.
CRR	:	Cash Reserve Ratio
CSR	:	Corporate Social Responsibilities
DCCI	:	Dhaka Chamber of Commerce and Industry
DCI	:	Direct Calorie Intake
DFI	:	Development Financing Institution
DIB	:	Diploma in Islamic Banking
DIB	:	Dubai Islamic Bank
EBS	:	Egyptian Banking System
EC-NCID	:	Executive Committee of the National Council for Industrial Development
ed.	:	edition
eds.	:	edited
EOSP	:	Employee Owned Stock Program
EPB	:	Export Processing Bureau
EPZ	:	Export Processing Zone
FBCCI	:	Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industries
FDI	:	Foreign Direct Investment
FIBE	:	Faisal Islamic Bank of Egypt

FICCI	:	Foreign Inventors Chamber of Commerce and Industries
GAIN	:	Global Alliance for Improved Nutrition
GATS	:	General Agreement on Trade in Services
GDP	:	Gross Domestic Product
GNP	:	Gross National Product
HPSM	:	Hire Purchase under Sherkatul Melk
HRD	:	Human Resources Development
HTML	:	Hyper Text Markup Language
HTTP	:	Hyper Text Transfer Protocol
IBB	:	Institute of Bankers Bangladesh
IBBL	:	Islami Bank Bangladesh Limited
IBF	:	Islamic Foundation Bangladesh
Ibid	:	ibidem, which means 'in the same place'
IBTRA	:	Islami Bank Training and Research Academy
ICCI	:	The Islamic Chamber of Commerce and Industry
IDB	:	Islamic Development Bank
IERB	:	Islamic Economic Research Bureau
IIIE	:	International Institute of Islamic Economics
IIIT	:	International Institute of Islamic Thought
IIUM	:	International Islamic University Malaysia
ILO	:	International Labour Organization
IP	:	Industrial Policy
IPO	:	Initial Public Offering
IRA	:	Investment Risk Analysis
IRTI	:	International Research and Training Institute
ISO	:	International Standard Organization
JIB	:	Jordan Islamic Bank
KFH	:	Kuwait Finance House
KYC	:	Know your Customer
L/C	:	Letter of Credit
Ltd.	:	Limited
M.Phil	:	Master of Philosophy
MCCI	:	Metropolitan Chamber of Commerce and Industries
MDGs	:	Millennium Development Goals
MF	:	Micro Finance
MGISB	:	Mit Ghamar Islamic Savings Bank
MIS	:	Management Information Centre

MOI	:	Ministry of Industry
MOST	:	Micro Nutrient Statistics and Technology
MPI	:	Murabaha Post Import
NASCIB	:	National Association of Small and Cottage Industries Bangladesh
NBR	:	National Board of Revenue
NCB	:	National Commercial Bank
NCB	:	Nationalized Commercial Banks
NCID	:	National Council for Industrial Development
NFCD	:	Non Resident Foreign Currency Deposit
NGO	:	Non Government Organizations
NIA	:	Negotiable Instrument Act
NPDA	:	New Partnership for Development Act
NPO	:	National Productivity Organization
NRB	:	Non Resident Bangladeshi
OIC	:	Organization of Islamic Countries
p.	:	Page
PAYE	:	Pay as you earn
PCB	:	Private Commercial Bank
Ph.D	:	Doctor of Philosophy
PIDE	:	Pakistan Institute of Development Economics
PKSF	:	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
pp.	:	Pages
PRSP	:	Poverty Reduction Strategy Paper
PRSP	:	Poverty Reduction Strategy Paper
PSD	:	Private Sector Development
PSI	:	Pre-Shipment Inspection
QIB	:	Qatar Islamic Bank
R&D	:	Research and Development
RBIC	:	Al-Rajihi Banking and Investment Corporation
RMG	:	Readymade Garments
RRC	:	Regulatory Reform Commission
SBA	:	Small Business Administration
SBB	:	Shamil Bank of Bahrain
SCI	:	Small and Cottage Industries
SCITI	:	Small and Cottage Industries Training Institute
SEC	:	Security and Exchange Commission
SIBL	:	Social Islami Bank Limited

SJIBL	:	Shahjalal Islami Bank Limited
SLR	:	Statutory Liquidity Reserve/Ratio
SME	:	Small and Medium Enterprise
SMEF	:	Small and Medium Enterprise Foundation
SOE	:	State Owned Enterprise
SSB	:	Supreme Shariah Board
TIC	:	Technology Incubation Centre
TK	:	Bangladesh Taka
TRIPS	:	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
USIS	:	United States Information Service
VAT	:	Value Added Tax
vol.	:	Volume
VRR	:	Variable Rate of Return
WB	:	World Bank
WEAB	:	Women Entrepreneurs Association of Bangladesh
WEF	:	World Economic Forum
WTO	:	World Trade Organization

সূচিপত্র

- উৎসর্গ ii
- ঘোষণা পত্র iii
- প্রত্যয়ন পত্র iv
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
- প্রতিবর্ণায়ন vii
- শব্দ সংক্ষেপ viii
- সূচিপত্র xiv

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- গবেষণা প্রস্তাবনা ২
- গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ৩
- গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩
- গবেষণার পদ্ধতি ৪
- গবেষণা কর্মের পরিধি ৪
- গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস ৫
- তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ৫
- গবেষণার সময়কাল ৬
- গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা ৬
- ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও শারি'আহ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ৭
- অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা ৮
- উপসংহার ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও এর ইতিহাস

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ : ব্যাংক-এর পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১২
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামি ব্যাংক-এর পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৪২
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামি ব্যাংক-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ ৬৫
- ❖ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামি ব্যাংকিং এ চুক্তি ও ক্রয়-বিক্রয় ৭১

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ পরিচিতি ৮৫
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা ৯০
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম ১১০

চতুর্থ অধ্যায়
শারি‘আহ আইন এর পরিচয়

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ : শারি‘আহ আইন-এর সংজ্ঞা, উৎস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১১৪
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শারি‘আহ আইন-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৬৫
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ব্যবসা-বাণিজ্যে শারি‘আহ-এর নীতিমালা ১৯১

পঞ্চম অধ্যায়
ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ নীতিমালা

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ : রিবা-এর শারঈ‘ দৃষ্টিকোণ ১৯৬
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আমানত সংগ্রহ ও মুনাফা বণ্টনে শারি‘আহ-এর নীতিমালা ২১৪
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিনিয়োগ পদ্ধতিতে শারি‘আহ-এর নীতিমালা ২২০
- ❖ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শারি‘আহ নীতিমালা তদারকি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ২৩৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ্ আইনের প্রায়োগিক বাস্তবতা

❖	প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ইসলামি ব্যাংকিং-এ শারি‘আহ লঙ্ঘন	২৫০
❖	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	শারি‘আহ আইন-এর প্রায়োগিক বাস্তবতা : ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ	২৫৮
❖	তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	শারি‘আহ আইন-এর প্রায়োগিক বাস্তবতা : গ্রাহক দৃষ্টিকোণ	২৬৯
❖	চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	গবেষণালব্ধ প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা নিরসনে সুপারিশমালা	২৭৯

- ❖ উপসংহার ২৮৯
- ❖ সাক্ষাৎকার অনুসূচি ২৯২
- ❖ গ্রন্থপঞ্জি ২৯৯

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- ❖ গবেষণা প্রস্তাবনা
- ❖ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব
- ❖ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- ❖ গবেষণার পদ্ধতি
- ❖ গবেষণা কর্মের পরিধি
- ❖ গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস
- ❖ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ
- ❖ গবেষণার সময়কাল
- ❖ গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা
- ❖ ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও শারি‘আহ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা
- ❖ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা
- ❖ উপসংহার

গবেষণা প্রস্তাবনা (Introduction)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে পরিপূর্ণতা দেয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমগ্র মানব জাতির ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি। ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হলো এর অর্থনীতি– আর অর্থনীতির বুনিয়াদ বহুলাংশে নির্ভর করে শক্তিশালী ও টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর। কল্যাণমূখী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা রাসুল সা.-এর প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে এবং তারপর ইসলামি শাসকবর্গ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার আদলে অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তারই ধারাবাহিকতায় এবং সে অনুভূতির ও দায়িত্ববোধের জাগরণ বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়ার দিকে আধুনিক ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার চিন্তার সূত্রপাত ঘটে এবং ক্রমেই তা গতিশীল আন্দোলনে রূপ লাভ করে। অবশেষে মিশরের মিটগামারে ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের প্রথম শারি'আহভিত্তিক ইসলামি ব্যাংক, যার সাফল্য বিশ্বব্যাপী ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার নৈতিক শক্তি যুগিয়ে আসছে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের কোন পর্যায়েই সুদভিত্তিক লেনদেনকে সমাজ-সংস্কৃতির ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে সকল যুগের সকল ধর্মে ও বিভিন্ন মানবিক দর্শনে সুদকে সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও পরিত্যাজ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ ও আধুনিক জীবনব্যবস্থা হওয়ায় ইসলামের চিরন্তন আদর্শের আলোকে ব্যাংকব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার স্বপ্ন ও দাবি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে দিনের পর দিন। জনগোষ্ঠীকে সুদের কবল থেকে মুক্ত করার দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত কিছু মানুষের সক্রিয় উদ্যোগে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামি আদর্শের সংযুক্তি ঘটে এবং একই সাথে সারা বিশ্বে আগ্রাসী মানবতা বিধ্বংসী সুদি ব্যাংকব্যবস্থার বিপরীতে শারি'আহভিত্তিক ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা রীতিমত একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ইসলামি ব্যাংকের যে মৌলিক দর্শন, মূল্যবোধ ও তত্ত্ব অর্থনৈতিক সুফল আনয়ন, সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের পিছনে মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে তা হল ইসলামি শারি'আহ যা 'আদল ও ইহসান ভিত্তিক। ইসলামি শারি'আহ মুসলিম জীবন–সাধনার এক অপরিহার্য ও অনন্য উপাদান। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমগ্র মানবজাতি কিভাবে জীবন পথে চলবে, কিভাবে অর্থনৈতিক সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করবে, তারই নির্দেশক হচ্ছে ইসলামি শারি'আহ। তাছাড়া শারি'আতের অপর দুই উৎস হচ্ছে ইজমা ও কিয়াস যা অর্থব্যবস্থা তথা আধুনিক ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় গতিশীলতা আনয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ইসলামি ব্যাংকসমূহ ইসলামি শারি'আহ অনুযায়ী যাবতীয় কর্মকাণ্ড তথা আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদান ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যাংকের এ নৈতিক প্রতিশ্রুতি গোটা ব্যাংকব্যবস্থার উপর শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক শোষণের তথা সুদের কবল থেকে মুক্ত জনকল্যাণমূখী অর্থনীতি বিনির্মাণে শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা আজ অবিকল্প ও শক্তিশালী উপাদান হিসেবে অত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকসূমহে শারি'আহ-এর পরিপূর্ণ আদর্শ বাস্তবায়ন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। দীর্ঘ দিনের সুদি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কেবল মুনাফা অর্জনের বাণিজ্যিক ও বস্তুবাদী দাবি ইসলামি শারি'আহ আদর্শের

ঐতিহ্যকে কখনো কখনো ম্লান করে দিতে পারে, কখনো কখনো অনিবার্যক্রমে শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। সে কারণে সুপরিকল্পিতভাবে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে, শারি'আহ সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি রোধে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এবং সর্বোপরি শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা উত্তরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং পরিষেবার মানোন্নয়ন, সীমানা সম্প্রসারণ তথা জনকল্যাণমূখী অর্থনীতি বিনির্মাণে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা অত্র গবেষণার প্রয়াস।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and importance of the study)

ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রচলনে বহির্বিশ্বে যে ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং বর্তমানেও তা সমান তালে চলছে সে তুলনায় আমাদের দেশ কিছুটা পিছিয়ে আছে। ব্যাপক জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও এদেশের ইসলামি ব্যাংকিং প্রসারে অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে এতদসংক্রান্ত প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য বই-পুস্তকের অভাব। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই-পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইসলামি পদ্ধতির আলোচনা এখন পর্যন্ত এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থান পায়নি বললেই চলে। ফলে এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা-সংশয় এখনও বিরাজ করছে। এমনকি বর্তমানে যারা ইসলামি ব্যাংকিং-এর সাথে জড়িত আছেন, ব্যাংকার হিসেবে হোক বা গ্রাহক হিসেবেই হোক, তাদের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ক ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিশেষ করে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি শারি'আহ আইন সম্পর্কে ব্যাংকার, বিদ্যমান গ্রাহক ও সম্ভাব্য অনাগত গ্রাহকগণের পরিস্কার ধারণার ব্যাপক অভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যতদিন না এ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করা সম্ভব হবে ততদিন এ অবস্থা চলতেই থাকবে। আর এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সামনে এগিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও ইসলামি ব্যাংকিং জগতে সম্ভাবনার এক অপার সম্ভাবনাময় দ্বার উন্মোচনের লক্ষ্যে **ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারী'আহ্ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** শিরোনামে এ গবেষণার প্রয়াস।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার প্রধান আকর্ষণ ইসলামি শারি'আহ-এর নীতিমালা অনুসরণ, যা 'আদল ও ইহসান ভিত্তিক। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুফল প্রাপ্তি অনেকাংশে নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে শারি'আহ পরিপালনের উপর। কিন্তু এ কথা সত্য যে, শারি'আহ পরিপালনের দিক-নির্দেশনা সম্বলিত প্রায়োগিক প্রকাশনার অভাব রয়েছে। এ গবেষণার কাজটি মূলত সে প্রায়োগিক অভাব পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই করা হয়েছে যা এখন সময়ের দাবি। এ ছাড়াও এ গবেষণার অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. ইসলামি ব্যাংক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা।

২. আর্থিক কর্মকাণ্ড কিভাবে সুদমুক্ত করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

৩. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে কিভাবে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা যায় সে সম্পর্কে তথ্য লাভ করা।

৪. শারি‘আহ আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা।

৫. ইসলামি ব্যাংকসমূহ কিভাবে শারি‘আহ পরিপালন করে সে সম্পর্কে তথ্য লাভ করা।

৬. বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনায় যে সকল কারণে শারি‘আহ লঙ্ঘিত হয় তা নিরূপণ করা।

৭. শারি‘আহ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা উত্তরণের সম্ভাব্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।

গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

গবেষণা হলো সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে[১] যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন কিছু সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টাকে গবেষণা বলা হয়ে থাকে। গবেষণা বিদ্যমান জ্ঞানের সাথে নতুন কিছুকে সংযোজন করে। গবেষণার উদ্দেশ্য ও নীতিমালা ঠিক রেখে আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। বিষয় নির্বাচনের পর ধারাবাহিকভাবে গবেষণার নক্সা তৈরি, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আদর্শ ও যথাযথ আর্থ-সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে কার্যোপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক ও পর্যবেক্ষণমূলক ধাপসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামি ব্যাংকের তাত্ত্বিক ধারণার প্রায়োগিক দিক সরেজমিনে জানার জন্য পর্যবেক্ষণ, একান্ত সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা। তবে তত্ত্ব-উপাত্ত ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের জন্য ইংরেজি, আরবি, উরদু ও ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে। ইসলামি অর্থনীতি ও ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ নির্বাচন করে তার সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া কুরআন, হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রের উদ্ধৃতি ভাবানুবাদের আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা বাংলা ভাষায় রচিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

গবেষণা কর্মের পরিধি (Scope of Research)

সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার উপর পরোক্ষভাবে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার পাশাপাশি ব্যাংকব্যবস্থায় শারি‘আহ পরিপালন বিষয়ে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা গবেষণা পরিধির আওতাভূক্ত। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামি শারি‘আহ আদর্শের ধারণা এবং প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলাদেশে এর ক্রমবিকাশ। কল্যাণমুখী সমাজ কাঠামো বিনির্মাণে ইসলামি ব্যাংকের দায়িত্বশীল ভূমিকার অনুসন্ধান এ গবেষণায় স্থান পেয়েছে। এছাড়া ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে শারি‘আহ আইন প্রয়োগের ব্যাপারে মানুষের মাঝে যে ভুল ও অস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত আছে সে বিষয়টিও এ গবেষণাকর্মে স্থান

---

১. মানসম্পন্ন গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ৪টি ধাপ হলো, ১. ঐতিহাসিক (Historical) ২. বর্ণনামূলক (Descriptive) ৩. বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) এবং ৪. পর্যবেক্ষণমূলক (Observational)। একটি গবেষণার জন্য উল্লিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করলে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর খুব গভীরে প্রবেশ করা যায় এবং একটি মানসম্পন্ন সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো সম্ভব হয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে ইতিহাস, বর্ণনা, বিশ্লেষণ এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ এ ৪টি দিক যথাযথভাবে সমন্বয় করতে পারলে লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত হয়। এ গবেষণার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ধাপসমূহ সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার অর্জিত ফলাফল যাতে টেকসই কৌশলে পরাজিত কিংবা অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত না হয় সে বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

পেয়েছে। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামের কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখাও এ গবেষণার পরিধিভূক্ত। তাছাড়া শারি'আহ আইনের ধারণা, ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি ও দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইনের প্রয়োগে এর অবদান, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান এবং এতদবিষয়ে কতিপয় সুপারিশ গবেষণা কর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস (Sources of Data)

প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। উভয়বিধ উৎস অনুসরণে গবেষণা রীতির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে– ব্যাংকের নিজস্ব প্রতিবেদন, অফিসিয়াল রেকর্ড, ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার, ইসলামি ব্যাংকারগণের মতামত বিশ্লেষণ, গঠণমূলক সুপারিশ ইত্যাদি। ব্যাংকের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, সাময়িকী, অর্ধবার্ষিকী, কিংবা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন, বিভিন্ন ঘোষণা সম্বলিত বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা, বিবরণী, পুস্তিকা, জার্নাল, ক্রশিউর পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, মাঠ জরিপ ইত্যাদি গবেষণা কর্মের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source)

দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে কুরআন, হাদিস, ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থাদি। এছাড়া আরো রয়েছে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত ব্যাংকিং ও ইসলামি ব্যাংকিং সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী, প্রচলিত ও ইসলামি ব্যাংকসমূহের জার্নাল, বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলির বিবরণ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ। বিশেষত ইসলামি ব্যাংকিং এ শারি'আহ পরিপালন বিষয়ক গ্রন্থাবলী এ গবেষণা কর্মের দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis)

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য, তত্ত্ব ও উপাত্তসমূহ সম্পর্কে আলোচনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। শারি'আহ আইনের প্রয়োগে ইসলামি ব্যাংকের বিভিন্ন ডাটাসমূহ, তুলনামূলকভাবে আলোচনার মাধ্যমে অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকের উপর ইসলামি শারি'আহভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংকসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। শারি'আহ পরিপালনে ইসলামি ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন পদক্ষেপ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

---

২. দ্বৈতয়িক উৎসসমূহের মধ্যে শারী'আহ্ পরিপালন বিষয়ক জার্নাল ও গ্রন্থসমুহ যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। ইসলামী শারী'আহ্ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হওয়ায় এ সংক্রান্ত তথ্যাবলি সম্বলিত বই-পুস্তক গবেষণা উৎসের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

গবেষণার সময়কাল (Research Time Frame)

এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে চার বছর সময় লেগেছে। এ সময়কালকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বই-পুস্তক, সাময়িকী, জার্নাল, সরকারি-বেসরকারি রিপোর্ট, এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নিজস্ব প্রকাশনা, রিপোর্ট, জার্নাল, সাময়িকী ও ডাটাসমূহ সংগ্রহ করেছি। ইসলামি ব্যাংক ও ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কিত বেশ কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করেছি। ইসলামি ব্যাংকের শীর্ষ স্থানীয় কতিপয় নির্বাহী-কর্মকর্তা ও গ্রাহকগণের সাথে আলোচনা আকারে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ যাছাই-বাছাই করে গবেষণা কর্মের মানদণ্ড বজায় রেখে কার্য সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে ড্রাফটিং, পুনঃসম্পাদনা এবং চূড়ান্ত প্রুফসহ সময় লেগেছে প্রায় চার বছর। গবেষণাকর্মে নিয়োজিত মোট সময়কে নিচের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

নিয়োজিত সময়ের তালিকা

কাজের প্রকার	নিয়োজিত সময়
১ম পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	৮ মাস
২য় পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	৮ মাস
উভয় পর্যায়ের উৎসের মাঝে সমন্বয় সাধন	৬ মাস
প্রশ্নপত্র তৈরি ও সম্পাদনা	৪ মাস
জরিপ (ব্যাংকার ও গ্রাহক)	৪ মাস
তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	৬ মাস
কম্পিউটার কম্পোজ	৬ মাস
১ম, ২য় ও ৩য় প্রুফ	৪ মাস
চূড়ান্ত মুদ্রণ, সম্পাদনা ও বাঁধাই	২ মাস

গবেষণাকর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Study)

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার সময় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ব্যাংকের দায়িত্বশীল নির্বাহী-কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা, সহযোগিতা ও তথ্য প্রদানে অনীহা এর মধ্যে অন্যতম। নিম্নে সীমাবদ্ধতাসমূহের কতিপয় উল্লেখ করা হল :

১. **তথ্য প্রদানে অনীহা :** গোপনীয়তার অজুহাতে অনেক ব্যাংক কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেছেন। এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে হয়রানি করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা গেছে। তবে বিশেষ কৌশলে বিকল্প পন্থায় সেসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. **তথ্য ভাণ্ডারের অপর্যাপ্ততা :** সারা বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হলেও ইসলামি ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আশানুরূপভাবে তা পাওয়া যায়নি। প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে একাধিকবার বিভিন্ন অফিসে যোগাযোগ করতে হয়।

৩. **গবেষণার সময় :** এম.ফিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ শিক্ষার স্তর হওয়ায় বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। যার জন্য পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। এ জন্য আরো

বেশি সময় পেলে গবেষণা কর্মটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হত।

৪. **নির্বাহী-কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা :** ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করার সময় তাদের যথেষ্ট ব্যস্ত দেখা গেছে। যার ফলে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লেগেছে।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও শারি'আহ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা (Literature Review)

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা, ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার গোড়ার কথা, ইসলামি ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দেশের অর্থনীতি ও শিল্পনীতিতে এ ব্যাংকের ভূমিকা, ইসলামি ব্যাংকের চলার পথে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক বিভিন্ন সমস্যা ও উত্তরণের উপায় সংক্রান্ত বিষয়ের উপর কিছু সংখ্যক বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এবং সামান্য দিক ও বিভাগ নিয়ে গবেষণাও হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হল নিম্নরূপ–

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম রচিত '*ইসলামের অর্থনীতি*' (১ম প্রকাশ ১৯৫৬) নামক গ্রন্থে অর্থনীতির গোড়ার কথা, অর্থনীতির সামাজিক উন্নয়ন শক্তি, জাতীয় উন্নয়নে অর্থব্যবস্থার অবদান, অর্থোৎপাদনের পন্থা, শিল্প, ভূমি ও বণ্টননীতি, ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, ইসলামি ব্যাংকের পরিকল্পনা, ইসলামি ব্যাংকের পূর্ব ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক সুশাসনে ইসলামি ব্যাংকের অংশগ্রহণ, বৈদেশিক বিনিময় ও ইসলামি ব্যাংক প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তবে এ বইতে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় সম্পর্কে তেমন একটা বিবৃত হয়নি।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, অনূঃ আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান '*সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*' (১ম প্রকাশ ১৯৮৭) নামক গ্রন্থে আদর্শগত দিকগুলো উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে ইসলাম, পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজমসহ ইসলামের বিধান, বাণিজ্যিক বিনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়সমুহ প্রাধান্য পেয়েছে।

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন '*ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*' (১৯৯৬) শীর্ষক গ্রন্থে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার পটভূমি, ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য, সুদ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা, ইসলামি ব্যাংকের তহবিলের উৎস, ইসলামি ব্যাংকের কার্যাবলি, বিনিয়োগ, মুদারাবা কারবারের শর্তাবলি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিময় এবং ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব অত্যন্ত সুচারুভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার নৈতিকতা সামাজিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কতখানি অবদান রাখে তার একটা চিত্র এ গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। তবে সত্যিকার অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে রচিত তথাকথিত পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থার সীমাহীন ব্যর্থতা এবং অর্থনীতি তথা সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে ইসলামি আদর্শের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় বিষয়ে লেখক তেমন কিছু আলোকপাত করেননি।

ইসলামি ব্যাংকিং এর তাত্ত্বিক বিষয় সম্বলিত আরেকটি গ্রন্থ হলো '*ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব • প্রয়োগ • পদ্ধতি*' (১ম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৪), লিখেছেন যৌথভাবে আব্দুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ।

গ্রন্থখানিতে ব্যাংক ও অর্থব্যবস্থা, ইসলামি ব্যাংকিং, সুদ, ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার বিনিয়োগ পদ্ধতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

ড. মুসতাফা হুসনী আস-সুবায়ী, অনূঃ এ.এম.এ. সিরাজুল ইসলাম, '*ইসলামী শরীআহ ও সুন্নাহ*' নামক গ্রন্থে ইসলামি শারি'আহর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো উপস্থাপিত হয়েছে। এ গ্রন্থে শারি'আহ ও সুন্নাতের সংজ্ঞা, সংগ্রহ, লিপিবদ্ধকরণ ও ইতিহাস, বিভিন্ন যুগে সুন্নাতের উপর যে সব সন্দেহের অবতারণা ঘটেছে তার বর্ণনা ও ইসলামি শারি'আতের সাথে সুন্নাতের সম্পর্ক এবং মুজতাহিদ চার ইমাম ও শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের জীবনীর আলোচনা প্রভৃতি বিষয়সমুহ প্রাধান্য পেয়েছে।

ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এবং ইসলামি শারি'আহ বিষয়ক আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই যেমন- এ. জেড. এম. শামসুল আলম রচিত '*ইসলামী ব্যাংকিং*' (১ম প্রকাশ, মে ১৯৯৯)। বইয়ে লেখক ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি, কর্মপদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বিনিয়োগ, বীমা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। মুহাম্মদ মুবারক হুসেইন রচিত '*ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*' (১ম প্রকাশ, ১৯৯৯)। এ বইয়ে লেখক ইসলামি ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা, প্রায়োগিক দিকসমূহ ও আনুষঙ্গিক মৌলিক বিষয়াদির উপর আলোচনা করেছেন। এম এ মান্নান রচিত '*ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব • প্রয়োগ*' (১৯৮৩)। এটা ইসলামি অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর লিখিত একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ.এ.এম হাবীবুর রহমান রচিত '*ইসলামী ব্যাংকিং*' (১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪) গ্রন্থে ইসলামি ব্যাংক ও অর্থনীতি, ইসলামি সাধারণ জ্ঞান, বিনিয়োগ, জামানত, বিবিধ ব্যাংকিং আইন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। শাহ আব্দুল হান্নান-এর '*ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল*' দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিষয়গুলো চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। উল্লিখিত গ্রন্থাবলি অধ্যয়নপূর্বক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় সম্বলিত তাত্ত্বিক বিষয়কে গ্রহণপূর্বক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কিভাবে শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক সমস্যাবলি খুঁজে বের করা যায় এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় কি সে সম্পর্কে গবেষণা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা (Structure of the Study)

গবেষণাকর্মের সুবিধার জন্য **ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারী'আহ্ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** শিরোনামে এ এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৬টি অধ্যায় ও প্রত্যেকটি অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোকপাত করা হয়েছে। অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম ও পরিচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে করা হয়েছে :

প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা'। এ অধ্যায়ে মূলত গবেষণার বাস্তবতা সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার শিরোনামোক্ত বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার ভূমিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা কর্মের পদ্ধতি, গবেষণা কর্মের পরিধি, গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, গবেষণার সময়কাল, গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা, তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা, অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্রমানুসারে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও এর ইতিহাস'। ব্যাংকের পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ইসলামি ব্যাংকের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিষয়াবলি এ অধ্যায়ে স্থান লাভ করেছে। এ অধ্যায়ে যেসব বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা হলো, ব্যাংকের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি ও এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইসলামি ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ইসলামি ব্যাংকিংয়ে চুক্তি ও ক্রয়-বিক্রয়। উল্লিখিত শিরোনামে বিষয়বস্তুর আলোচনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব ও উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং সূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং'। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান পরিচিতি, বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার আগমন, বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকসমূহে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। যেসব বিষয়কে এ অধ্যায়ভূক্ত করা হয়েছে তা হলো, বাংলাদেশ পরিচিতি, বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম। শিরোনামোক্ত বিষয়বস্তুকে আরো বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে যথাস্থানে তত্ত্ব ও উপাত্ত সংযুক্ত করা হয়েছে এবং তথ্যসূত্রসহ প্রয়োজনীয় টিকা-টিপ্পনি সংযোজন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'শারি'আহ আইন-এর পরিচয়'। ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পাথেয় হলো শারি'আহ আইন। শারি'আহভিত্তিক পরিচালিত হয়ে কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তন করা যায়। শারি'আহ আইন-এর সংজ্ঞা, উৎস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শারি'আহ আইন-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্যে শারি'আহ-এর নীতিমালা কি তা এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত শিরোনামাধীন বিষয়গুলো আলোচানা-পর্যালোচনা করে আরো সুস্পষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট স্থানে তৎসংক্রান্ত তত্ত্ব ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ নীতিমালা'। রিবা-এর শারই' দৃষ্টিকোণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে শারি'আহ-এর নীতিমালা পরিপালন কীভাবে হতে পারে, আমানত সংগ্রহ ও মুনাফা বণ্টনে শারি'আহ-এর নীতিমালা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতিতে শারি'আহ-এর নীতিমালা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট খাতে শারি'আহ-এর নীতিমালা পরিপালনে তদারকি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শিরোনামাধীন বিষয়গুলো আলোচানা-পর্যালোচনা করে আরো সুস্পষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট স্থানে এতদ্‌সংক্রান্ত তত্ত্ব ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক বাস্তবতা'। গবেষণা অভিসন্দর্ভকর্ম শেষ করে ও সমীক্ষার মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকের নির্বাহী-কর্মকর্তা ও গ্রাহকগণের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সংগ্রহ করে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইনের কী লঙ্ঘন হচ্ছে, শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা কোথায় তা উদ্ঘাটন করে শারি'আহ আইনের

প্রায়োগিক সমস্যা নিরসনের উপায় সম্বলিত একটি সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার লেখা হয়েছে।

উপসংহার

উপসংহার হিসেবে এতে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে যে অনুভূতিতে এর উপাত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে সে বিষয়ে একান্ত অভিব্যক্তি উপসংহারে প্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে।

এরপর ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ বিষয়ে ব্যাংকার ও গ্রাহকদের উপর জরিপের প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি সংযুক্ত করা হয়েছে। সবশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে যা অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, শিক্ষার্থী, শারি'আহ পরিপালনে আগ্রহী ও ইসলামি অর্থনীতিবিষয়ক গবেষকবৃন্দসহ অনুসন্ধিৎসু আপামর জনসাধারণের বিশেষভাবে উপকারে আসবে বলে প্রত্যাশা করি। এ অভিসন্দর্ভ থেকে ইসলামি ব্যাংকিং ও শারি'আহ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, দেশ ও দেশবাসী যদি যৎকিঞ্চিত উপকৃত হন তাহলেই এ শ্রম সাধনা সার্থক হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও এর ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ব্যাংকের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	ইসলামি ব্যাংকিং-এ চুক্তি ও ক্রয়-বিক্রয়

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও এর ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যাংক-এর পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ব্যাংক ইংরেজি শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ হলো খাল বা নদীর তীর বা তটরেখা, খেতের আল, জলাশয়, ধনভাণ্ডার, কোষাগার, লম্বা টুল বা বেঞ্চ, অধিকোষ বা কোন বস্তু বিশেষের স্তূপ বা স্তূপীকৃত কোন বস্তু বা অর্থগচ্ছিত করা প্রভৃতি।[১] বাংলা একাডেমির অভিধানে বলা হয়েছে– ব্যাংক হলো নদী বা খালের তীর, তট, কূল, কিনার, ঢালু জমি বা মাটি, যা অনেক সময়ে সীমানা বা বিভাজন রচনা করে, ঢাল, স্তূপীকৃত বা রাশীকৃত হওয়া।[২] ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন ইতিহাসবিদ এবং গ্রন্থকারের মতে, প্রাচীন ল্যাটিন শব্দ বা ইটালিয়ান শব্দ Banco বা Bangk বা Banque বা Bancus প্রভৃতি শব্দ থেকেই ব্যাংক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এ মতের অনুসারীদের যুক্তি হলো, প্রাচীন এ ল্যাটিন শব্দের অর্থ বেঞ্চ বা বসার জন্য ব্যবহৃত লম্বা টেবিল বা টুল। এ বেঞ্চ বা টুলের উপর বসেই প্রাচীনকালে ব্যবসায়ীরা লেনদেন বা ঋণের কারবার করত। এ লম্বা টুলকে Banco বা Banca বলা হতো যা থেকে পরবর্তী পর্যায়ে Bank শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। কোন ব্যবসায়ী তার দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে পাওনাদারগণ তার বেঞ্চ ভেঙ্গে ফেলত এবং তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করত। এভাবেই দেউলিয়া বা Bankrupt শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

আবার কেউ কেউ উপরোক্ত ধারণায় সন্দেহ প্রকাশ করে Bank শব্দটার উৎপত্তি সম্পর্কে আরেকটি ঐতিহাসিক তথ্য পেশ করেন। তাদের মতে, ব্যাংক শব্দটি জার্মান শব্দ Back থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হলো– 'যৌথ মূলধনী তহবিল' বা সম্মিলিত তহবিল (Joint Stock Fund)। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে জার্মানি সম্প্রসারণবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ইতালির এক বিরাট অংশ দখল করে নেয় এবং সেখানে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে Back শব্দটাকে ইতালিয় Banco শব্দে রূপান্তর করা হয়।[৩] সাহিত্যেও Bank শব্দটার উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক Bambridge-এর সাহিত্যে দেখা যায় যে, তিনি ভেনিসের মহাজন এবং স্বর্ণকার শ্রেণি যারা অর্থ বেচাকেনার কারবার করতেন, তাদেরকে Monte বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ Monte এবং Bank জার্মান শব্দ দু'টো গোটা ইউরোপের প্রায় সবদেশেই সমার্থে ব্যবহৃত হতো। আবার বিশিষ্ট ব্রিটিশ লেখক চেম্বার্স প্রণীত 'Twentieth Century

---

১. ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দিন, *আধুনিক ব্যাংকিং ও বীমা*(ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, বাংলাবাজার, জুন ২০০৫), পৃ. ২

২. Edited by Zilhur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*(Dhaka : Bangla Academy Press, 31st Reprint, 2008), p. 59

৩. মো. ছদর আলী, *ব্যাংকিং (ট্রেনিং প্রবন্ধ)*(ঢাকা : অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সংকলন, তা.বি.), পৃ. ২

Dictionary' তে দেখা গেছে ফরাসি শব্দ Banque এবং ইটালিয়ান শব্দ Banca কে বর্তমানের ইংরেজি Bank শব্দের মতই ব্যবহার করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত বিভিন্ন যুক্তিনির্ভর ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রকৃত প্রস্তাবে Bank শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে একক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, উপরোল্লিখিত সমস্ত শব্দের সাথে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং মোটামুটি যুক্তিনির্ভরভাবে বলা যায় যে, Banco, Bancus, Banque, Monte প্রভৃতি শব্দ থেকে পরবর্তীতে Bank শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে।[৪]

ব্যাংকের পরিচয়

ব্যাংক একটি সেবামূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের প্রসার এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করে সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থ সংক্রান্ত লেনদেনে নিয়োজিত থাকাই ব্যাংকের কাজ। ব্যাংক অন্যের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আবার অন্যকেই ধার দেয়। তাই এটাকে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়। নিম্নে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারের দৃষ্টিকোণ থেকে 'ব্যাংক' এর সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো–

অধ্যাপক জে.সি.উড বলেন, 'ব্যাংক হলো অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী।'[৫]

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ক্রাউথার বলেন, 'ব্যাংক হলো নিজেদের ও অন্য লোকদের ঋণের ব্যবসায়ী।'[৬]

আর.এস. সেয়ার্স–এর মতে, 'ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার ঋণসমূহ অন্য লোকেদের ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।'[৭]

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেয়ার্নক্রস–এর মতে, 'ব্যাংক হলো একটি আর্থিক মধ্যস্থ কারবারী– ধার ও ঋণের ব্যবসায়ী।'[৮]

অধ্যাপক চেম্বারর্স-এর মতে, 'অর্থ সংরক্ষণ, ঋণদান এবং বিনিময় ইত্যাদি কার্যে নিয়োজিত কার্যালয় বা প্রতিষ্ঠানই হলো ব্যাংক।'[৯]

আর.পি. ক্যান্টের মতে, 'ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ ও ঋণের দলিল বিনিময়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।'[১০]

---

৪. ড. এ.আর.খান, *উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং*(ঢাকা : এস এস পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ১৯৯৯), পৃ. ৫

৫. 'Bank is the trader of money and loan.' উদ্ধৃত ড.এ.আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৬. 'A Bank is a dealer in debts of his own and of other peoples.' উদ্ধৃত ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৭. 'A Bank is an institution whose debts are accepted in final settlement of other peoples debts.' R.S. Sayers, *Modern Banking*, উদ্ধৃত ড. মো. আশরাফ আলী খান, ড. মো. আলাউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৮. 'A Bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts.' উদ্ধৃত ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৯. 'A Bank is an office or institution for the keeping, lending and exchanging etc. of money. উদ্ধৃত ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১০. 'A Bank is an institution the principal function of which is to collect the unutilized money of the people and to lend it to others.' উদ্ধৃত ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন ১৮৮১-এর বর্ণনা মতে, ‘ব্যাংক বলতে ব্যাংক ব্যবসায়ে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, কর্পোরেশন বা কোম্পানিকে বুঝায়।’[১১]

১৯৪৯ সালের ভারতীয় ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৫(বি) ধারায় বলা হয়েছে, ‘ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ঋণদান অথবা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জনসাধারণ থেকে অর্থ আমানত গ্রহণ করে এবং জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র চেক, হুন্ডি অথবা যে কোন প্রকারে ফেরত দেয়।’[১২]

ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ৫(ত) ধারা অনুসারে, ‘ব্যাংক ব্যবসা অর্থ কর্জ প্রদান বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জনগণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করা, যাহা চাহিবামাত্র বা অন্য কোনভাবে পরিশোধযোগ্য এবং চেক, ড্রাফট, আদেশ বা অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রত্যাহারযোগ্য।’[১৩]

এস.এম. মাহফুজুর রহমান-এর মতে, ‘ব্যাংক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা অর্থের কারবার করে, নিজ হিফাজতে অর্থ আমানত রাখে এবং আমানত হিসাব থেকে চেকের মাধ্যমে আমানতকারীকে অর্থ প্রদান করে, ঋণ মঞ্জুর করে, বিনিময় বিল বাট্টা করে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা করে।’[১৪]

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলি মিয়ার মতে, ‘যে প্রতিষ্ঠান জনসাধারণ ও বিভিন্ন সংস্থার নিকট হতে আমানত গ্রহণ করে, যার চলতি ও সেভিংস হিসাবে টাকা জমা রাখে এবং গ্রাহকদের চেক প্রদান করে ও চেক গ্রহণ করে টাকা পরিশোধ করে, এ সংস্থাকেই ব্যাংক বলে।’[১৫]

আধুনিককালে ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার গ্রাহকদের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে, গৃহীত আমানত অধিক লাভে বিনিয়োগ প্রদান করে এবং আমানতের বিপরীতে ইস্যুকৃত চেক, রশিদ বা অন্য কোন অঙ্গীকারনামা যথানিয়মে পরিশোধ করে। মূল্যবান সম্পদ বা দলিলাদির নিরাপদ সংরক্ষণ, অর্থ স্থানান্তরসহ সার্বিক আর্থিক লেনদেনের আইনানুগ প্রতিষ্ঠানই হলো ব্যাংক।

সুতরাং বলা যায় যে, ব্যাংক হচ্ছে অর্থ ও ঋণের তথা বিনিয়োগের ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যা স্বল্প সুদে বা স্বল্প মুনাফায় জনগণের নিকট থেকে জমা গ্রহণ করে অধিক সুদ বা অধিক লাভের বিনিময়ে অন্যকে ঋণ বা ধার দেয় এবং পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে, অর্থের লেনদেন করে, ঋণ সৃষ্টি ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা যা এখন দৃশ্যমান তা সুদীর্ঘকালের নানাবিধ বিবর্তন ও ধারাবাহিকতার ফসল। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে ব্যাংক ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বর্তমানে মানুষ

---

১১. ‘A Bank includes a person, or a corporation, or a company acting as banker.’ উদ্ধৃত ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১২. কাজী ফারুকী, *ব্যাংকিং ও বীমা*(ঢাকা : কাজী প্রকাশনী, মে ২০০৩), পৃ. ১৬

১৩. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকলিক, *ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)*(ঢাকা : বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৩), পৃ. ৫

১৪. এস এম মাহফুজুর রহমান, *ব্যবসায় শব্দকোষ*(ঢাকা : এ ওয়াই পাবলিকেশন্স, আগস্ট ২০০০), পৃ. ২৪

১৫. ড. মোহাম্মদ হায়দার আলি মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং ঃ কাস্টমস এন্ড প্রাকটিস*(ঢাকা : সাহেরা হায়দার প্রকাশিত, বনানী, সং. ৪, ২০০৮), পৃ. ৮৮

যে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে পরিচিত তা কোন একক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সভ্যতা কর্তৃক সৃষ্ট নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সভ্যতা ও চিন্তাবিদদের হাতে এর বিবর্তন ঘটেছে। ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অতি বিচিত্র। কোথায়, কিভাবে এটি গড়ে উঠেছে তা আজও সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে একটি ব্যাপারে সবাই একমত যে, মানব সভ্যতার আদিকালেই ব্যাংক ব্যবস্থার সুপ্ত বীজের অঙ্কুরোদগম হয় এবং কালের গতি প্রবাহের সাথে সাথে তা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার রূপ ধারণ করে।[১৬] ব্যাংক ব্যবস্থা ক্রমশ আধুনিক জীবন ধারার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, আমদানি-রপ্তানি, সঞ্চয়-বিনিয়োগ, তহবিল স্থানান্তর, এমনকি মূল্যবান দলিলপত্র ও অলঙ্কারাদির নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য এখন ব্যাংকের দ্বারস্থ হয় জনগণ। ব্যাংকের ইতিহাস মুদ্রার ইতিহাসের ন্যায়ই অতি প্রাচীন। বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলনের প্রথম যুগ থেকেই সমান্তরালভাবে ব্যাংক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছে। কারণ মুদ্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই মূলত ব্যাংক ব্যবসায়ের ধারণা গড়ে উঠেছে। এ জন্য যথার্থই বলা হয় যে, 'অর্থ (মুদ্রা) হলো ব্যাংকের জন্মদাতা এবং ব্যাংক হলো অর্থের সংরক্ষক।' সুতরাং ব্যাংক ও অর্থের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে ব্যাংক ব্যবসার বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস নিম্নরূপ–

(ক) মুদ্রার প্রচলন; (খ) ব্যবসায় ও বাণিজ্য; (গ) সভ্যতার দৃষ্টিকোণ ও (ঘ) সময় ও যুগের দৃষ্টিকোণ

নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ব্যাংকিংকে বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ সাম্প্রতিককালের একটা আধুনিক কর্মপদ্ধতি বলে ধারণা করেন। কিন্তু আর্থিক কার্যক্রমের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের দিকে তাকালে নানাবিধ ভাবনার উদ্ভব ও সাযুস্যতা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত: খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইতালিতে প্রচলনের অনেক আগেই প্রাচীনকালের জ্ঞাত প্রায় সকল সভ্যতায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুশীলন হয়েছে। দ্বিতীয়ত: ইসলাম এ ধরনের কার্যক্রমকে কেবল অনুমোদনই করেনি, একে এমনভাবে উৎসাহিত করেছে, যা আগের জ্ঞাত সবকিছুকে অতিক্রম করে। তৃতীয়ত: ইতালিয়ান ব্যাংকাররা ব্যাংকিং-এর কৌশল মুসলিম এবং মুসলিম বিশ্বের খ্রিস্টান ও ইহুদি বণিকদের কাছ থেকে শিখেছে। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে এদের সঙ্গে ইতালিবাসীর ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

আর. লোপেজ বলেছেন, 'ইতিহাস হলো অধ্যয়নের এমন একটা ক্ষেত্র যা শুরু থেকে শুরু হয় না।'[১৭] বর্তমানের রূপ নেয়া বাণিজ্যের সবচেয়ে বিশেষায়িত ধরন ব্যাংকিং–প্রাচীন সভ্যতাগুলোর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর আবির্ভাব ঘটে এবং বলতে গেলে প্রায় সকল কালে তা ছিল বিভিন্ন জাতির সমৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে। তবে, অরসিজ্ঞার বলেছেন, 'এ পর্যন্ত প্রাপ্ত দলিলের ভিত্তিতে, কখন প্রথম ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল, তার প্রকৃতিই বা কেমন ছিল অথবা এর বিকাশের

---

১৬. ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১৭. আর. লোপেজ, সেন্টার ফর মেডিয়াভল এন্ড রেনেসাঁ স্টাডিজ কর্তৃক সম্পাদিত *The Down of Medieval Banking*(লস এঞ্জেলস : ইউনিভার্সিটি অব কলম্বিয়া, ১৯৭৯), পৃ. ১

ব্যাপারে ধারাবাহিক নিরবিচ্ছিন্ন প্রমাণ দেয়া দূরূহ ব্যাপার।'[১৮] তাই, বার্জিয়ারের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ মনে করেন, 'ব্যাংকিংয়ের জন্ম ইতালিতে।'[১৯] এর প্রথম কারণ, 'ব্যাংক' শব্দটি ইতালিয়ান 'ব্যাঙ্কো' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ এমন কোন টেবিল বা বেঞ্চ যার উপর ইতালিয়ান মুদ্রা বিনিময়কারীরা তাদের মুদ্রা সাজিয়ে রাখত এবং নথি বা লেনদেন লেখার কাজ করত। দ্বিতীয়তঃ তারা দেখান যে, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে 'ব্যাংক' নামের প্রথম স্থাপনাগুলো ইতালির ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া ও লাক্কায় স্থাপিত হয়েছিল।[২০] তাই ব্যাংকিংকে প্রায়ই সাম্প্রতিককালের একটি আধুনিক উদ্ভাবন বলে মনে করা হয়। কিন্তু, আর্থিক কার্যক্রমের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অন্যরকম চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। যেমন–

প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে ব্যাংকিং কার্যক্রমের উৎপত্তি অনুসন্ধান করার প্রচুর তথ্য-উপাত্ত বিদ্যমান রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম সভ্যতায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিকাশ ঘটেছে। রোমান সভ্যতার পতনের পর থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে সে সময় ইটালিতে এর নাটকীয় বিকাশ ঘটার পিছনে কারণ ছিল দক্ষিণ-ইউরোপ ও মুসলিম সাম্রাজ্যের সঙ্গে দেশটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইসলামি সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে শুরু হওয়া 'ইসলামি ব্যাংকিং' পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ব্যাংকের উৎপত্তির সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যাংকিং

আর.লোপেজ বলেছেন, 'ব্যবসা ও বাণিজ্য সচল রাখার জন্য প্রথম কখন ঋণ ব্যবহার করা হয়েছিল, তা কেউ জানে না। সম্ভবত এটা হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক কোন এক সময়ে। কিন্তু, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, গ্রিস ও রোমে এক ধরনের ব্যাংক চালু ছিল।'[২১]

এস.হোমার লিখেন, 'সম্ভবত শিল্প, ব্যাংকিং, মুদ্রার প্রচলন, এমনকি আদি রূপে অর্থের প্রচলন হওয়ার আগেও ঋণের প্রচলন ছিল।'[২২] তিনি উপসংহার টানেন এভাবে– 'আমরা ঋণকে বৃহত্তর অর্থে বিবেচনা করলে এর প্রাচীন ধরন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারি। প্রাচীনকালের ঋণকে আমরা দেখতে পারি পুত্র, ভাই বা কোন প্রতিবেশীকে বীজ ধার দেয়া হিসেবে, যা ফসল তোলার পর ফেরত দেয়া হতো। অথবা কোন পশু বা কোন সরঞ্জাম বা কোন খাবার ধার দেয়া হত। ফেরত পাওয়ার আশা করা না হলে এ ধরনের স্থানান্তরকে বলা হত উপহার। ফেরত পাওয়ার আশা করলে তা হত ধার এবং লাভসহ ধার হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত দেয়া, যা ধারের চেয়েও বেশি বলে আশা করা হত।'[২৩]

---

১৮. আর. অরসিজ্ঞার, *Banks of the World* (লন্ডন : ম্যাকমিলান, ১৯৬৭), পৃ. ১

১৯. জে. বার্জিয়ার, *From the Fifteenth century in Italy to the sixteenth century in Germany: A new Banking Concept*, সেন্টার ফর মেডিয়াভেল এন্ড রেঁনেসা স্টাডিজ কর্তৃক সম্পাদিত *The Down of Medieval Banking* (লস এঞ্জেলস : ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৭৯), পৃ. ১০৫

২০. R.D. Ruver, "*New Interpretation of the History of Banking*" in Journal of World Historyt(Hawai : University of Hawai Press, Vol. II, 1954), p. 87

২১. আর. লোপেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

২২. এস. হোমার, *A History of Interest Rares* (নিউজার্সি : রিউটজেরাস ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ব্রানস্কি, ১৯৬৩), পৃ. ১৭

২৩. এস. হোমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

প্রথম লিখিত চুক্তি ও আর্থিক লেনদেন শুরু হওয়ার আগে মানুষ গবাদিপশু, খাদ্যশস্য, রৌপ্য বা মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি এমন যে কোন কিছু ব্যবসা ও ঋণ হিসেবে ব্যবহার করত।[২৪] দুঃখজনক হলো প্রাগৈতিহাসিক সময়ে এ রকম বা অন্য কোন ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রমের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মুদ্রার প্রচলন ও ব্যাংক : ব্যাংকের উৎপত্তি ও এর ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই যে বিষয়টি এসে যায় সেটি হলো মুদ্রা। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে প্রত্যক্ষ পণ্য বিনিময়ের অসুবিধাগুলো দূর করে যখন বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রচলন হয় তখন থেকেই ব্যাংক ব্যবসা শুরু হয়। অর্থনীতিবিদ বান্নার মতে, 'মুদ্রার প্রয়োজনেই ব্যাংক এসেছে। তৎকালীন সময়ে জনসাধারণ তাদের সঞ্চিত অর্থ ধনবান ও বিশ্বস্থ লোকদের নিকট আমানত রাখত এবং একই সময়ে একসাথে জমাকৃত টাকা তুলে নিতে আসত না। তাই জমাগ্রহণকারীরা এসব অর্থ মূলধন হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগ করত। এভাবেই জমাগ্রহণ ও ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে মূলত ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। এ জন্যই বলা হয়, 'Money is the mother of banks and banks are the reformer of money.' এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথমদিকে জমাগ্রহণকারীরা আমানতকারীদের নিকট থেকে সামান্য চার্জ আদায় করত। পরবর্তীতে ঋণদান প্রথা চালু হওয়ায় এটা রহিত হয়ে যায় এবং আমানতকারীকে বরং কিছু প্রদান করার প্রথা চালু হয়। এ কার্যক্রমই পর্যায়ক্রমে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় রূপ ধারণ করে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংক : ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতে হলে মুদ্রার প্রচলনের পর যে বিষয়টি ব্যাংক ব্যবস্থার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে সেটি হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। কারণ মুদ্রার প্রচলনের পরপরই শুরু হয় বিনিয়োগের ও ঋণের প্রচলন। এক শ্রেণির লোকেরা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ নিরাপদ সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা যেমন অনুভব করতে থাকে তেমনি অন্য শ্রেণি অর্থের অন্বেষণে ঋণ পেতে সচেষ্ট হতে থাকে। এ ঋণের উপর কালক্রমে সুদ ধার্য করা হয়। আর এভাবেই সমাজে মহাজন শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এ ব্যবসায় যথেষ্ট লাভজনক হওয়ায় মহাজনরা সমাজের উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহে যথেষ্ট যত্নবান হয়। এভাবে প্রাপ্ত অর্থের বিনিময়ে আমানতকারীকে একটি স্থায়ী অংশ প্রদানের প্রথা চালু হয়। আর এভাবেই সমাজে ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রাথমিক সূত্রপাত ঘটে।

প্রাচীন সভ্যতা ও ব্যাংকের ক্রমবিকাশ : ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসার লাভ করেছিল তেমনি ব্যাংক ব্যবসায়ের উন্নতি সাধিত হয়েছিল ব্যাপকভাবে। ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতিতে বিভিন্ন সভ্যতার অবদান আজ সকলের কাছে স্বীকৃত। এখানে বিভিন্ন সভ্যতায় ব্যাংক ব্যবসায়ের অস্তিত্ব ও এর উন্নতির নিদর্শন উপস্থাপন করা হলো–

সিন্ধু সভ্যতায় ব্যাংক : সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০-২০০০ অব্দ। এ সভ্যতার যুগে ব্যাংকিং-এর ধরন ছিল অতি চমৎকার। পাকিস্তানের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে মুদ্রার প্রচলন ছিল,

---

২৪. জি. ডাভিয়েস, *A History of Money from Ancient times to the Present Day*(কার্ডিফ : ইউনিভার্সিটি অব ওয়ালেস প্রেস, ২০০২), পৃ. ১২

বাণিজ্যিক লেনদেনের তথ্যও পাওয়া যায়। সিন্ধুর ব্যবসায়ীগণ রোম, মিশর, গ্রিস প্রভৃতি দেশের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করত এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের মীমাংসার জন্যে এক ধরনের বিনিময় বিলের ব্যবহার করত।

ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুগ হলো 'সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা', যা 'হরপ্পা সভ্যতা নামেও পরিচিত। সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পা নগরীতে প্রথম খনন কাজ চালানো হয়েছিল বলে এ নামকরণ। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে এর বিকাশ ঘটে। বর্তমান পাকিস্তানের পুরো অংশ এবং বর্তমান ভারতের কিছু অংশ জুড়ে এ সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। এটা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো সভ্যতাগুলোর একটি এবং মেসোপটেমিয়া ও মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ সালের দিকে সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছে এ সভ্যতা। বাণিজ্যভিত্তিক শহুরে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে এখানে এবং এর অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি ছিল কৃষি।

প্রতিবেশী সভ্যতা মেসোপটেমিয়ার মত সম্ভবত এখানেও প্রচুর বাণিজ্যিক লেনদেন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম চলত। তবে, এ বিষয়ে বিস্তারিত তেমন কিছু জানা যায়নি। তাছাড়া, হরপ্পা থেকে পাওয়া পান্ডুলিপিগুলোর পাঠোদ্ধারে ইতিহাসবিদদের সকল প্রচেষ্টা এ যাবত ব্যর্থ হয়েছে। সম্ভবত, আবহাওয়া পরিবর্তন বা আর্যদের হামলার কারণে খ্রিস্টপূর্ব নবম থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে এ সভ্যতার বিলুপ্তি ঘঠে। সে সময়ে ঐ অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। নিজাম-এর মতে, 'খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টীয় ২০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সুশৃঙ্খলভাবে বাণিজ্য, শহুরে বাজার, মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হত। জোচ্চুরি, মজুতদারি, পাচার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র, গুদাম নির্মাণ ও বাজার নিয়ন্ত্রণের মত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত।'[২৫]

নিজাম আরও উল্লেখ করেন যে, 'প্রাচীন ভারতে খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টীয় ২০০ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের, বিশেষ করে অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ছিল। ঋণকে ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হত। ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং বিভিন্ন সজ্ঘ ঋণ দিত ও ব্যাংকিং কার্যক্রম চালাত বলে ধারণা করা হয়।'[২৬]

সালেটরি প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের আগে সে সময়ের অন্যান্য সভ্য অঞ্চল যেমন– ব্যাবিলন, রোম, গ্রিস, মিশর, পারস্য ও চীনের সঙ্গে ভারতের ব্যাপক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকার লোকজন আমানত, প্রতিশ্রুতি, বন্ধকী ও কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী আয়ের উৎস হিসেবে সম্পদ দেয়া এসব কাজ করত। এসব লেনদেনে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও সুদের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকত।[২৭] তিনি বক্তব্য শেষ করেন এভাবে– 'একেবারে প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে শুল্ক আরোপ এবং সুদ আদায় ছিল ব্যাংকিং কার্যক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো কাজ।'[২৮]

---

২৫. এস. নিজাম, *Economic Organisations in Ancient India (200 BC-200AD)*(নয়াদিল্লি : মুন্সিরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃ. ৩০৫-৩০৬

২৬. এস. নিজাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭-৩১১

২৭. আর.এন. সালেটরি, *Early Indian Economic History*(লন্ডন : লর্ড কার্জন প্রেস, ১৯৭৫), পৃ. ৩৫-১০১

২৮. আর.এন. সালেটরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮

বৈদিক সভ্যতায় ব্যাংক : এ সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ। এ সভ্যতার যুগে ব্যাংকিং-এর ধরন ছিল অন্যরকম। ভারত উপমহাদেশে ঋণ ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয় বৈদিক যুগে। মনুতে সুদ ও ঋণ লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়। মনু, যিনি অনেকগুলো সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তার লেখায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার রীতিনীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তার কিছু কিছু পুস্তিকায় আমানত, বন্ধকী ঋণ এবং সুদের হারেরও উল্লেখ রয়েছে। কথিত আছে এ সময় ভারতে উপসনালয় ব্যাংকিং বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

রোমান সভ্যতায় ব্যাংক : এ সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-১০০০ অব্দ। চেক, হুন্ডি, ব্যাংক ড্রাফটের ন্যায় ইনস্ট্রুমেন্টের ব্যবহার চালু হয় এ সভ্যতায়। হোমারের বর্ণনা মতে, রোমানরা ছিল কৃষক ও সৈনিকের জাতি। নির্মাণ, বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর মত কাজগুলো তারা মূলত বিদেশীদের কাছে ছেড়ে দিয়েছিল। প্রাচীন রোমান ব্যাংকারদের বেশিরভাগ নাম গ্রিক এবং তাদেরকেও ট্রাপিজিটেজ বলা হত।[২৯] অরসিজ্যার লিখেন, ‘রোমান যুগে কোন একচেটিয়া ব্যাংকিং ছিল না। তাই ব্যাংকিং কার্যক্রম স্বাধীনভাবে বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়।’[৩০] প্রথম শতাব্দীর মধ্যে রিপাবলিক ও সাম্রাজ্য এবং সম্ভবত সে সময়ের জানা বিশ্বের মধ্যেও ব্যাংকিং কেন্দ্র হয়ে দাড়ায় রোম। তখন ব্যাংকারদের সংখ্যা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, ট্রাপিজিটেজ ছাড়াও তাদেরকে মেনসুলারি, আরজেনতারি, মাম্মালারি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হত।[৩১] খ্রিস্টপূর্ব ৯০ সালের পর থেকে রিপাবলিকের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকিং কার্যক্রমেও অস্থিরতা সৃষ্টি হতে থাকে এবং স্থবিরতা নেমে আসে। যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার সময় মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক স্থবিরতা ও দেউলিয়াত্ব দেখা দেয়। আবার, শান্তি ও অগ্রগতির সময় আর্থিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম ও ব্যবসা-বণিজ্যের উন্নতি ঘটে। তৃতীয় শতাব্দীর বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের সময় চরম মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং দিওক্লিতিয়ান (২৮৪-৩০২ খ্রিস্টাব্দ) ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর এ গোলযোগপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে। ফ্রাঙ্ক-এর মতে, ‘তখন পতনের পথে রোম। চারদিকে নৈরাজ্য ও লুটপাট চলছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ রোমের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। শিল্প ও বাণিজ্য ভেঙ্গে যায়। এমনকি ল্যাতিন ভাষাও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে।’[৩২]

চীনা সভ্যতায় ব্যাংক : এ সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-৬০০ অব্দ। চীনের শানসি ব্যাংক বিশ্বের সর্বপ্রথম সংগঠিত ব্যাংক। এ ব্যাংক খিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংক আধুনিক ব্যাংকের অনেক কাজ করত। নোট ইস্যু তন্মধ্যে অন্যতম। ১০৫ সালে চীনে কাগজের আবিষ্কার ব্যাংক ব্যবস্থার অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রাখে। চীনে মমির সাথে হাজার বছরের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।

এ যাবত চীনের প্রথম যে রাজবংশের কথা জানা যায়, তা হলো জিয়াং রাজবংশ। যদিও এর অস্তিত্ব এখন পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে স্পষ্ট হয়নি। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা হেনান উপত্যকায় প্রাচীন শহর, ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ও সমাধি আবিস্কার করেন। চীনা

২৯. এস. হোমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
৩০. আর. অরসিজ্যার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬
৩১. এস. হোমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৩২. টি.ফ্রাঙ্ক, *An Economic Survey of Ancient Rome*(হপকিন্স : বাল্টিমোর পাবলিকেশন্স, ১৯৩৩), পৃ. ৩০০

সভ্যতার প্রাচীন শান যুগের সাক্ষ্য বহন করছে এগুলো। খ্রিস্টপূর্ব ১৫২৩-১০১৭ সাল পর্যন্ত মোটামুটি এ রাজবংশের শাসন টিকে ছিল। এ সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক। শিকার ও পশুপালনের মধ্য দিয়ে এর সমৃদ্ধি ঘটে।[৩৩] কড়ি এবং মূল্যবান ধাতব অস্ত্রশস্ত্র যেমন– বর্শা, কুঠার ও ছুরি বাণিজ্যিক বিনিময়ের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হত।[৩৪] ইতিহাসবিদদের মতে, এ যুগের পূর্বের অবস্থা কেমন ছিল তা নিয়ে কিংবদন্তিগুলো থেকে বাস্তবতাকে পৃথক করা সুকঠিন। এ যুগে সেখানে উঁচু স্তরের সভ্যতার প্রমাণ হিসেবে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। এর একটা হল লিখন পদ্ধতির আবিস্কার। চীনারা কচ্ছপের খোলস ও পশুর হাড়ে লিখত। অন্য ঘটনাটা ছিল ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহার।[৩৫]

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের দিকে চীনে প্রথম কাগুজে মুদ্রার প্রচলন ঘটলেও ৯৬০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এর ব্যবহার ছিল সীমিত। মুদ্রা তৈরির জন্য তামার ঘাটতি দেখা দিলে চীনা সম্রাট প্রথম সাধারণভাবে নোটের প্রচলন করেন। মূল নোটগুলো নির্দিষ্ট এলাকা ও মেয়াদের জন্য চালু ছিল। সম্রাট হিয়েন সাং ৮০৬-৮২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার শাসনামলে এ ধরনের কাগুজে মুদ্রা চালুর পিছনে কারণ ছিল ধাতব মুদ্রা তৈরির জন্য তামার ঘাটতি। চীন থেকে মুদ্রা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এর আংশিক কারণ ছিল উত্তর থেকে আসা হানাদারদের কাছ থেকে রক্ষা পেতে তাদেরকে কাগুজে মুদ্রা মুক্তিপণ হিসেবে দেয়া হত। ফলে, এ মুদ্রার উপর মানুষের নির্ভরতা বেড়ে যায়। ১০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ কাগুজে মুদ্রা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এর পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে বেশ কয়েক দফা চরম মুদ্রাস্ফীতির ঘটনা ঘটে। ফলে, কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের প্রায় ৫০০ বছর পর ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে চীনারা এ মুদ্রা পরিত্যাগ করে।[৩৬]

গ্রিক সভ্যতায় ব্যাংক : এ সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৪০০-৩০০ অব্দ। উপসনালয় ব্যাংক (Temple Banking) ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল। উপসনালয়গুলোই ছিল ব্যাংকিং লেনদেনের কেন্দ্র।

অরসিজ্ঞার-এর মতে, 'স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবস্থা, স্থানীয় আইনের কঠোরতা এবং বাণিজ্য ও লেনদেনের করুণ হালের কারণে আর্থিক মুদ্রা আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন গ্রিসে ব্যাংকিং-এর বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল।'[৩৭] এখানে যে প্রশ্নটা উত্থাপিত হয় তা হলো এ মুদ্রার আবিস্কারক কে এবং কখন? অরসিজ্ঞার তার উত্তর দিয়েছেন এভাবে– 'সম্ভবত চীনারা, তবে এরও কোন নিশ্চয়তা নেই।'[৩৮] প্রথম খাঁটি সোনার পিণ্ডের প্রচলন ঘটানোর কৃতিত্ব লিডিয়ার রাজা ক্রোয়েসাস-এর। তার শাসনামল হল ৫৬০-৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। সে সময় শীর্ষস্থানীয় স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশ ছিল লিডিয়া। সপ্তম খ্রিস্টপূর্বাব্দে লিডিয়ায় সরকারিভাবে মুদ্রার প্রচলন ঘটেছিল

---

৩৩. জে. ফিন্ডলিং এন্ড এফ. থ্যাকারে, *The History of China*(ওয়েস্টপোর্ট : গ্রিনউড প্রেস, ২০০১), পৃ. ১২-১৩

৩৪. জি. ডাভিয়েস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৩৫. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *কলাম্বিয়া এনসাইক্লোপেডিয়া*(নিউইয়র্ক : কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ৬ষ্ঠ সং., ২০০১), পৃ. ১০০-১৪৫

৩৬. ওয়েবসাইট: http://www.en.wikipedia.org/wiki/indus_Valley_Civilization#Economy; visited on 12.10.2016

৩৭. আর. অরসিজ্ঞার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৩৮. আর. অরসিজ্ঞার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

বলে বিভিন্ন মনীষী উল্লেখ করেছেন।[৩৯] প্রথম মুদ্রার প্রচলন ঘটান লিডিয়ার রাজা সিগেস ৬৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এগুলো ছিল ইলেক্ট্রাম যা সোনা ও রূপার মিশ্রণ দ্বারা প্রস্তুত। এটা গ্রিসে ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রচলন ও চর্চাকে উৎসাহিত করে থাকবে। কারণ, শিগগিরই কিছু বিক্রেতা মূল্যবান ধাতু দিয়ে তৈরি বিভিন্ন আকার ও ওজনের মুদ্রা মূল্যায়ণ ও বিনিময়ের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেন।[৪০] গ্রিক ব্যাংকারদের ট্রাপিজিটেজও বলা হতো। গ্রিক শব্দ ট্রাপেজা থেকে এ নামকরণ। যার অর্থ টেবিল বা বেঞ্চ। এর উপর রেখে তারা মুদ্রা প্রদর্শন বা লেনদেন যেমন– বিনিময়, আমানত সংগ্রহ, বিভিন্ন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে ঋণ দেয়া, ঋণের স্বীকৃতিপত্র ইস্যু, প্রমিসরি নোট বা চেক-এর দাবি আদায় এবং এ সবের পূর্ণ বিবরণ লিখে রাখাসহ অন্যান্য কাজ করতেন। হোমার মনে করেন, 'গ্রিকদের বাণিজ্যিক মেধা এর পর আর কখনোই এতটা উচ্চ পর্যয়ে পৌঁছাতে পারেনি।'[৪১] সম্ভবত পূর্ববর্তী সখ্যতাগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রিসেও মন্দিরগুলো আমানত সংগ্রহ ও ধার দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো। দেলফি মন্দিরকে একসময় গ্রিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্যাংক হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো।[৪২] কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যে নেতৃত্ব দেয়ার মত অবস্থানে এথেন্স ছিল না। হোমার লিখেন, 'আসন্ন শতাব্দীগুলোতে গ্রিস নয়, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ইতিহাসকে প্রভাবিত করে রোম। সাম্রাজ্য হারানোর পর গ্রিস আর কখনোই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে তার অবস্থান ফিরে পেতে সক্ষম হয়নি। রোমান নীতির কারণে বাণিজ্য রোডস, এ্যানটিউক, সেলেনসিয়া এবং বিশেষভাবে আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চলে চলে যায়।'[৪৩]

মিশরীয় সভ্যতায় ব্যাংক : এ সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ। ফারাও বা ফেরাউনগণ তৎকালে ব্যাংক ব্যবসায়ে জড়িত ছিল। ফেরাউনদের শাসনামলে আধুনিক ব্যাংকিং-এর মত বহুবিধ কার্যাবলী সম্পন্ন হত। মিশরে মমির সাথে হাজার বছরের পুরনো মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিশরীয়রা ব্যাংকিং ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে। প্রাচীনকাল থেকে তারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে পারদর্শী ছিল।

অরসিঙ্গার-এর মতে, 'আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের আগে মিসরে আদিম ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মিশরে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটান টলেমি এবং গ্রিসের মত এখানেও ঠিক একইভাবে এর বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। গ্রিসের মতো এখানেও ট্রাপিজিটেজদের দেখা মেলে। তবে, এরা ছিল এক ধরনের সরকারি প্রতিনিধি; এদের অনেকের নাম ছিল গ্রিক এবং প্রথম দিকের ট্রাপিজিটেজরা গ্রিস থেকে আসে।'[৪৪] মিশরে মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগেই ব্যাংকিং ব্যবস্থা শুরু হয় সরকারি গুদামে ফসল জমা রাখার মাধ্যমে।[৪৫]

---

৩৯. এস. হোমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; আর. অরসিঙ্গার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯; জি. ডাভিয়েস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬৩; পি. এইনজিগ, *Primitive Money*(লন্ডন : ইয়েরি এন্ড স্পটিশউজ, ১৯৪৯), পৃ. ২২৫

৪০. আর. অরসিঙ্গার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৪১. এস. হোমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৪৪. আর. অরসিঙ্গার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৪৫. Netfundu (ওয়েবসাইট), www.netfundu.com/junior/historyofbanking.htm, visited on 07.04.2017

ডাভিয়েস বর্ণনা করেন, রাষ্ট্রীয় গুদামে ফসল জমা রাখার মধ্য দিয়ে একটি ব্যাংকিং পদ্ধতি গড়ে উঠে। নিরাপত্তা ও সুবিধার জন্য যাদের শস্য সেখানে রাখা হত, সেগুলো ফেরত নেয়ার সময় তারা লিখিত নির্দেশ দিত। এছাড়া রাজাকে ঋণ হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে দেয়া শস্যও সেখানে রাখা হত। এ প্রক্রিয়া শিগগিরই কর সংগ্রহকারী, পুরোহিত ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন জনের ঋণ পরিশোধের সাধারণ পদ্ধতি হয়ে দাড়ায়। বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সরকারি শস্যাধার মিলে একসময় শস্য ব্যাংকের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যা শেষ পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্ম দেয়। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের শস্যব্যাংকগুলোর রেকর্ড জমা রাখা হত। এ ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক কাজ করতো 'ঋণ হস্তান্তর' পদ্ধতিতে (giro system)। এক হাত থেকে অন্য হাতে টাকা স্থানান্তর ছাড়াই এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে 'পরিশোধ' করা যেত।[৪৬] খৃস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ধনসম্পদ ও সমৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংকিং শিল্পকলায় উন্নতির শিখরে পৌছে মিশর।[৪৭] কিন্তু, খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের দিকে রোমান সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা মিশরের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার বাধা ভেঙ্গে দেয়। আর তা হয় কেবল মিশরে প্রচলিত ছিল এমন সরকারি মুদ্রা (fiat currency) ইচ্ছাকৃতভাবে বাইরে ইচ্ছাকৃতভাবে বাইরে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে।[৪৮]

মেসোপটেমীয় সভ্যতায় ব্যাংক : এ সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০-২০০ অব্দ। তাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর উর্বর তীরাঞ্চলে সময়ের বিবর্তনে এখানে বেশ ক'টি সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকলেও একই ভূখণ্ডে গড়ে উঠায় একত্রিতভাবে বলা হত মেসোপটেমীয় সভ্যতা। 'মেসোপটেমীয়া' একটি গ্রিক শব্দ। যার অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। মেসোপটেমীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, অ্যাসিরীয় সভ্যতা ও ক্যালডিয় সভ্যতা। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ। উপাসনালয় ভিত্তিক ব্যাংকিং চালু ছিল এ সভ্যতায়। উক্ত সভ্যতায় নমরুদ ও সাদ্দাদের আমলে মুদ্রা এবং ব্যাংকিং ব্যবসায়ের প্রচলন ছিল। এ সময় লেনদেনের ক্ষেত্রে উন্মোচিত হয় নতুন দিগন্ত। ধারকর্জের ব্যবসায়ও এখানে দ্রুত প্রসার লাভ করে। ব্যাবিলনীয়রা তাদের উপসনালয়গুলোকে অর্থ সম্পদ জমা রাখার সুরক্ষিত, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য স্থান মনে করত। তারা খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-২০০ অব্দ পর্যন্ত মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা করত। ঐ সময় বিনিময় পত্র, চেক ও ব্যাংক নোটের প্রচলন ছিল।

যদিও কখন ও কোথায় প্রথম ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছিল তা প্রমাণ করা অসম্ভব। তবে, হোমুদ-এর মতে এটা স্পষ্ট যে, 'সংঘবদ্ধ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সূচনাপর্বে বিনিময়ের একটা মাধ্যম হিসেবে মুদ্রা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এর উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে।'[৪৯] সভ্যতা হিসেবে সুমেরীয় ও ব্যাবিলিয়ানরা প্রথমে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছিল বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব ৩৪ শতকের দিকে এ সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। আর. অরসিঞ্জার লিখেন, 'পুরাতাত্ত্বিক খনন কাজের মাধ্যমে ব্যাবিলনিয়ান সাম্রাজ্যের দুই পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন উরুক ও শালদিয়ে মন্দির আবিষ্কৃত হয়। সেগুলোই এ যাবতকালের জানা সবচেয়ে পুরনো ব্যাংকিং

৪৬. জি. ডাভিয়েস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫৪
৪৭. এস.এইচ. হোমুদ, *Islamic Banking*(লন্ডন : এরাবিয়ান ইনফরমেশন, ১৯৮৫), পৃ. ১৮
৪৮. এস. হোমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৪৯. এস.এইচ. হোমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

ভবন। আমাদের সময়ের ৩৩০০ বছর পূর্বে সে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হত।'[৫০] আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক প্রমাণগুলো থেকে জানা যায়, তখনকার ব্যাংকিংয়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেগুলো ছিল মন্দিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেগুলো ছিল খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্য রাখার নিরাপদ স্থান। জি. ডাভিয়েস উল্লেখ করেছেন, 'গচ্ছিত রাখা জিনিস কেবল আসল মালিককেই ফেরত দেয়া হত না, তৃতীয় পক্ষকেও দেয়া হত। মেসোপটেমিয়ার অনেক ব্যক্তি মালিকানাধীন আবাসও ব্যাংকিং কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিল।'[৫১]

মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া পান্ডুলিপিগুলোর একটাতে দেখা যায়, এক কৃষক তিল কেনার জন্য মন্দিরের যাজিকার কাছ থেকে কিছু পরিমাণ রুপা ঋণ করেন। ফসল তোলার পর ঋণ নেয়ার প্রমাণপত্র বহনকারীকে তিনি রৌপ্যমূল্যের সমপরিমাণ তিল ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করেন।[৫২] এটা থেকে অন্তত চারটা তথ্য অনুধাবন করা যায়–

এক. এতে মন্দিরকে ব্যাংকের ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে– ধর্মীয় উপাসানালয় ও যাজকদের প্রতি মানুষের আস্থা ছিল অন্য যে কোন কিছুর থেকে বেশি। এসব ধর্মীয় স্থাপনার সাধুতার সুনামের কারণে বিশ্বাস করা হত যে, এখানে আমানতের সঠিক ও পরিপূর্ণ হিসেব থাকবে এবং এসব স্থান অন্যান্য স্থানের চেয়ে অনেক নিরাপদ। পবিত্র মন্দিরে চুরি করার সাহস কেউ করবে না।

দুই. গ্রহীতা ছিলেন একজন উৎপাদক। অন্য কথায় ঋণ দেয়া হয়েছিল উৎপাদনের জন্য; ভোগের জন্য নয়।

তিন. ঋণ দলিলটি ছিল একটি প্রতিশ্রুতিবহ (Promissory) নোট বা হুন্ডির মত, যা ঋণ নেয়ার প্রমাণ হিসেবে গ্রহীতা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এটা ছিল বহনকারীর কাছে পরিশোধযোগ্য, অর্থাৎ হস্তান্তরযোগ্য।

চার. এ লেনদেনে মুনাফার কোন বিষয় ছিল না। ঋণ গ্রহীতা যে রুপা নিয়েছেন, ফসল তোলার পর সে পরিমাণ রৌপ্যমূল্যের সমপরিমাণ তিল ফেরত দেয়ার কথা আছে। এ পরিমাণ ধার করার সময়ের চেয়ে কম, সমান বা বেশি হতে পারে। এর পরিমাণ বেশি হলেও তা সুদ নয়। কারণ, সুদ হল ঋণ করা পুঁজির উপর বাড়তি যে অর্থ পরিশোধ করা হয় এবং তা হবে ঠিক একই ধরনের। যেমন, রুপার বিনিময়ে রুপা বা তিলের বিনিময়ে তিল। কিন্তু, রুপার বিনিময়ে তিল বা তিলের বিনিময়ে রুপা হলে তা সুদ হবে না।

সে যুগে বড় পুঁজির ব্যাংকারদের মধ্যে ছিলেন রাজা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ। অর্থ বা বীজ বিনিয়োগ হিসেবে নেয়া হত। অর্থের জন্য শতকরা ২০ ভাগ এবং বার্লির জন্য শতকরা ৩৩ ভাগ সুদ নেয়া হত। ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ বা কেউ ঋণ খেলাপি হলে ঋণ গ্রহীতা, এমনকি তার পরিবার পর্যন্ত দাসত্ববরণের ঝুঁকিতে পড়ে যেত। মুদারাবার প্রায় অনুরূপ সীমিত অংশীদারিত্ব (Partnership) ব্যাবিলনবাসীর আবিষ্কার। মন্দির ও বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিকদের ব্যাংকিং কার্যক্রম এতটাই

---

৫০. আর. অরসিজ্ঞার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
৫১. জি. ডাভিয়েস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৫২. এস.এইচ. হোমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

বেড়ে গিয়েছিল এবং এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যে, ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা হাম্মুরাবি (১৭২৮-১৬৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এর জন্য একটি মানসম্মত বিধিমালা তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ভূমির মালিকানা, কৃষি শ্রমিক নিয়োগ, ফৌজদারি বাধ্যবাধকতা, ঋণ, সুদ, অঙ্গীকার, গ্যারান্টি, প্রমাণ থাকা বা না থাকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্ষতি, চুরি ইত্যাদির ফলে সৃষ্ট প্রায় সব ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তিতে এ বিধিমালা প্রয়োগ করা হত।[৫৩] ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্যের কাছে স্বাধীনতা হারায় মেসোপটেমিয়া। মহানগরী হিসেবেও জৌলুস হারায় ব্যাবিলন। সে সময় সুদের হার শতকরা ৪০ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এভাবেই একটা পুরনো সভ্যতা হারিয়ে গিয়ে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেয়।[৫৪]

পারস্য সভ্যতায় ব্যাংক : এ সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-৬০০ অব্দ। এ সময়ে মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং লাভজনক ব্যবসায় ছিল। পারস্য প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম সুতিকাগারই ছিল না। মধ্য এশিয়ার উর্বর ইরানিয়ান উপত্যকার পূর্বদিকে সভ্যতার বিকাশ ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সালের দিকে এসে। আর্ম জাতিগোষ্ঠী বিশেষভাবে মেদেসদের হাতে এ সভ্যতা স্থিতিশীল হয়। পারস্য সভ্যতার প্রথম মহানায়ক ছিলেন আখেমেনেস। খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সালের দিকে আখেমেনীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। আখেমেনীয়রা পারসেপোলিসে বিশাল এক রাজধানী শহর গড়ে তোলে। সে সময় বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং বিশেষ করে ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন বিজয়ের পর ব্যাংকিং কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার ঘটে। পারস্যের ব্যবসায়ীরা ব্যাবিলনীয়দের ব্যাংকিং পদ্ধতি শিখে নেয়। বণিকরা উটের কাফেলা ও সাগর পথে জাহাজে দু'ভাবেই ইরান ও ভারতের মধ্যে পণ্য আনা-নেয়া করত। পার্সিয়ান ও সাসানিয়ান যুগে বাণিজ্যের প্রসার এবং ব্যবসায় ব্যাংক নোট ও মুদ্রার ব্যবহারের ফলে দেশটিতে মুদ্রা ও নগদ অর্থের বিনিময় শুরু হয়। কিছু লোক মুদ্রা খাঁটি কিনা তা চেনায় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠে। ৫১৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে আখিমেনীয় রাজা দারিউস দ্যা গ্রেট কর্তৃক লিদি বিজয়ের পর দেশটাতে ব্যাংক নোট ও স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়।[৫৫] সাম্রাজ্যজুড়ে ওজন ও পরিমাপ এবং বিশেষ করে মুদ্রা ব্যবহারের প্রচলন ঘটায় আখিমেনীয়রা। যা বৈদেশিক বাণিজ্য জোরদার এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সহজতর করে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে ব্যাবিলনের ইজিবি ব্যাংকের মত এখানেও বহু বেসরকারি ব্যাংক গড়ে উঠে। ব্যাবিলনের ব্যাংক থেকে পাওয়া রেকর্ডপত্রে দেখা যায়, এটি অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে বন্ধকী ঋণ এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধযোগ্য ঋণ (floating loan) বিতরণ করত। পরবর্তীকালে নিপ্পুর এ প্রতিষ্ঠিত মুরাসশুর মত আরেকটি ব্যাংক ইজারা দিতে, খাল খনন করে কৃষকদের কাছে পানি বিক্রি করত।

---

৫৩. এস. হোমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; আর. ওরসিঙ্গার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৫৪. এস. হোমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৫৫. তেজারত, *The Internal Publication of Bank Tejarat*(তেহরান : ব্যাংক তেজারত, উইন্টার, সংখ্যা ৮, ১৯৯৮), পৃ. ৭৬; সি.এল. স্কট, *India v. Indo-Persian Commercial Relations*, ইরানিকা ওয়েবসাইট : http://www.iranica.com/articlenavigation/index.html, visited on 20.02.2017; সি.হেরার্ট, *Ancient Persia and Iranian Civilization*(লন্ডন : রুটলেজ এন্ড কেগান পল, ১৯৭২), পৃ. ৮৯

ইসলামি সভ্যতায় ব্যাংক : ইসলামি সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্ট পরবর্তী অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দী থেকে নতুনভাবে যাত্রা। বায়তুলমালের প্রবর্তন ও ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতির ব্যাপক অনুশীলন, সুদ নিষিদ্ধ ছিল এ সময়ে। মুসলিমদের নেতৃত্বে বিশ্বের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতি সুদ ছাড়াই পরিচালিত হয়েছে। মুসলিম সভ্যতা দুর্বল হয়ে গেলে পাশ্চাত্যে ইহুদি-খ্রিস্টানদের নেতৃত্বে সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার উত্থান ঘটে। আবার বিংশ শতাব্দীতে কল্যাণমুখী ধারার ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে।

ইউরোপে ব্যাংকিং

রোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ৩০০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্পেন ও ইতালি ছাড়া ইউরোপের বাকি অঞ্চল এক হতাশ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় পার করে। যা ইতিহাসে 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে পরিচিত। ইসলামি সাম্রাজ্যের অধীনে আল-আন্দালুস নামে পরিচিত স্পেনে অষ্টম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক মহাসভ্যতার বিকাশ ঘটে। আর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কৌশলগত বাণিজ্যিক অবস্থানে থাকা ইটালির সঙ্গে ইসলামি বিশ্বের মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি বণিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ হত। এমনকি এক সময় মুসলিম অংশ ছিল সিসিলি ও ভেনিস। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিম ইউরোপে বহু বর্বর রাষ্ট্রের জন্ম হয়। গভীর পশ্চাদপদতায় নিমজ্জিত হয় পশ্চিম ইউরোপের বাণিজ্য। এস.হোমার-এর বর্ণনা মতে, 'অর্থনীতি ব্যাপকভাবে কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে।'[৫৬]

যার কারণে ইউরোপের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ এইচ. পিরেনি পশ্চিম ইউরোপ সম্পর্কে বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'La terre etait tout et le commerce rien.' যার অর্থ ভূমিই বা কৃষি ছিল সব। বাণিজ্য কিছুই ছিল না।[৫৭] এর মানে এ নয় যে, পশ্চিম ইউরোপে কোন ধরনের বাণিজ্য হত না। এখানে বলা হচ্ছে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অনিশ্চয়তা, উচ্চ পরিবহণ ব্যয়, উচ্চ কর ও শুল্ক চোরাচালান, ঘুষ ও অজ্ঞতার কারণে তখন বাণিজ্যিক কর্মকান্ড ছিল সীমিত। আর, বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লেও ব্যাংকিং কার্যক্রমও সে পথেই অগ্রসর হবে এটাই স্বাভাবিক।

এস.হোমার লিখেছেন, 'কথিত সে 'অন্ধকারযুগে' ল্যাতিন ভাষা হারিয়ে গেল, উধাও হল সংস্কৃতি, চরম বিস্তৃতি ঘটল কুসংস্কারের। তবে, কৃষ্ণ যুগের সবচেয়ে অন্ধকার সময়টিতেও নিয়মিতভাবে মুদ্রা ব্যবহৃত হলেও বাণিজ্য না থাকায় এর লেনদেন সীমিত হয়ে পড়ে।'[৫৮] আর. অরসিজ্ঞার দেখান যে, 'রোমান সাম্রাজ্য পতনের পর থেকে একাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত পুরো সময়টাতে পশ্চিম ইউরোপে ব্যাংকিং শিল্প বলতে ছিল কেবল মুদ্রা বিনিময়। মধ্যযুগের দ্বিতীয়ভাগে ক্রুসেডারদের যুগ হল অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা বিকাশের সূচনা বিন্দু।[৫৯] দশম শতাব্দীকে বলা হয় ক্রান্তিকাল। আগে থেকেই বিভিন্নস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের উদ্ভব ও অন্যান্য কারণে দুর্বল হয়ে পড়া মুসলিম সাম্রাজ্য, মোঙ্গল ও তাতারদের অব্যাহত হামলার কারণে আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে একদিকে ক্রুসেডাররা মুসলিম সাম্রাজ্যকে আরো

---

৫৬. এস. হোমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৫৭. এইচ. পিরেনি, *Economic and Social History of Medieval Europe*(নিউইয়র্ক : হারকোর্ট ব্রেস এন্ড কোং, ১৯৩৭), পৃ. ২০

৫৮. এস. হোমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৫৯. আর. অরসিজ্ঞার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

দুর্বল করতে থাকে এবং অন্যদিকে, মুসলিম সভ্যতা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে, কিভাবে সেচ বাড়ানো যায়, হস্তশিল্প, অংশীদারিত্ব, বাণিজ্য ও ব্যাংকিং পশ্চিম ইউরোপে স্থানান্তর হতে থাকে। যার ফলে একবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে সাধারণভাবে পশ্চিম ইউরোপে এবং বিশেষভাবে ইতালিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্থান ঘটতে শুরু করে। তাই, আর.লোপেজ বিষয়টা বর্ণনা করেছেন, 'অবশেষে ইতালি তার ইউরোপ মহাদেশ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মধ্যবর্তী অবস্থানের সুযোগটাকে কাজে লাগাতে শুরু করে। মাঝারি গোছের সফল কৃষক খামারিদের এ জাতি, রোমান যুগে বাণিজ্যের জন্য পূর্বাঞ্চলের নির্ভরশীল ছিল। তারা তাদের জনবহুল হয়ে পড়া রাজধানীর খাদ্য চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছিল। তাই বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক ও শিল্পভিত্তিক জাতি হওয়ার পথই কেবল খোলা ছিল তাদের সামনে।'[৬০]

সে সময় সম্ভবত ভেনিস ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরী। সেখানে কোন ভূমিদাস (serfdom) ছিলো না এবং পোপের বিরোধিতা সত্ত্বেও সেখানকার বেশিরভাগ মানুষ সমুদ্র পথে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে জড়িত ছিল। মুদ্রা ও অর্থ বিনিয়োগকারীদের শক্তি ও মর্যাদা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তখন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যে ইসলামি অংশীদারিত্ব চুক্তি মুদারাবার মতো পরোক্ষ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থা কমেন্ডা (commenda) বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৬১] লিয়েবার তার পর্যবেক্ষণে সম্ভবত বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, 'ইটালির বণিকরা ব্যবসার সুক্ষ্ম কৌশলগুলো ব্যবহারের প্রথম শিক্ষা ভূমধ্যসাগরের অপর পাশে তাদের প্রতিপক্ষদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এদের বেশিরভাগ ছিল মুসলিম; ইহুদি ও খ্রিস্টানও কিছু ছিল।'[৬২]

বিষয়টি এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, হোমুদ দেখান, 'ব্যাংকের উৎপত্তির ধারণায় **১১৫৭** খ্রিস্টাব্দে ভেনিসে স্থাপিত প্রথম ব্যাংকের নামকরণটি গুরুত্ব পেয়েছে। আর ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরুর দিনক্ষণ নিয়ে সাধারণ ধারণাটি লামবারদিয়া'র মুদ্রা বিনিময়কারীদের সঙ্গে জড়িত। তারা একটি কাঠের টেবিলের পিছনে বসে কাজ চালাত। এ টেবিলগুরোর নাম ছিল বাংকো।'[৬৩] তাই, লোপেজ মন্তব্য করেন, 'ইতালি ছিল মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায়, আর ইংল্যান্ড ছিল আধুনিকতার পথে। শিল্প বিপ্লব প্রথম ইংল্যান্ডের কিছু এলাকার অর্থনীতি ও সমাজকে বদলে দেয় এবং পরে তা বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু, ব্যবসা ও ব্যাংকিংসহ বাণিজ্য বিপ্লব প্রথম ইতালির কয়েকটি শহরে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে তা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।'[৬৪]

যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : সময় ও যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করা যায়। তবে ব্যাংকের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সবচেয়ে অত্যুজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হবে যদি তা সময়ের নিরিখে

---

৬০. Robert S. Lopez, *The Trade of Medieval Europe : the South, Economic History of Europe*(Cambridge : Cambridge University Press, 1952, vol. ii), p. 273

৬১. এস. হোমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৮; এ.এইচ. মিসকিমিন, *The Economy of Early Renaissance Europe 1300-1460*(নিউজার্সি : প্রেন্টিস হল, ইঙ্গেলউডস ক্লিফস, ১৯৬৯), পৃ. ১১৮

৬২. এ.ই. লেইবার, *Eastern Business Practices and Medieval European Commerce*(লন্ডন : ইকনমিক হিস্ট্রি রিভিউ কমিটি, ভলিউম-২১, ১৯৬৮), পৃ. ২৩০

৬৩. এস.এইচ. হোমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৬৪. Robert S. Lopez, Ibid, p. 291

পর্যালোচনা করা যায়। ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সময় তথা যুগের ক্রমধারায় বিবেচনা করা হলে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাংকিং (Banking in pre-historic Days); (২) প্রাচীন যুগের ব্যাংকিং (Banking in Ancient Period); (৩) মধ্যযুগের ব্যাংকিং (Banking in Middle Age) ও (৪) আধুনিক যুগের ব্যাংকিং (Banking in Modern Age)

যুগের বিবর্তনে ব্যাংকিংব্যবস্থা

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাংকিং : এ যুগের ব্যাপ্তি খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ। এ সময়ে অর্থের প্রচলন শুরু হয়, উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখা শুরু হয় এবং ঋণ প্রদান শুরু হয়।

প্রাচীন যুগের ব্যাংকিং : এ যুগের ব্যাপ্তি খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ পর্যন্ত। এ যুগে মুদ্রার প্রচলন ও মহাজনী ব্যবসার সূত্রপাত হয়। উপাসনালয় ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ঋণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয় এবং শানসি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মধ্যযুগের ব্যাংকিং : এ যুগের ব্যাপ্তি খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে ১৪০০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগে উপাসনালয় ব্যাংক, ব্যাংক অব ভেনিস, বায়তুল মাল ব্যবস্থা যা মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (৬১১ খ্রি.), ব্যাংক অব সান জর্জিও (১১৭৮ খ্রি.), ব্যাংক অব বার্সিলোনা (১৪০১ খ্রি.) ও ব্যাংক অব জেনোয়া (১৪০৭ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আধুনিক যুগের ব্যাংকিং : এ যুগের পরিব্যাপ্তি ১৪০০ খিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এ যুগে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংঘবদ্ধ ব্যাংক, দি ব্যাংক অব আমস্টারডাম (১৬০৯ খ্রি.), ব্যাংক অব হিন্দুস্থান (১৭০০ খ্রি.), সরকারি সনদপ্রাপ্ত ব্যাংক, ভিন্ন দেশে শাখা প্রতিষ্ঠা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (১৬৯৪ খ্রি.), বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা (২০ অক্টোবর, ১৯৭৫ খ্রি.), বিশ্বব্যাপী ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রচলন– যার মধ্যে চার শতাধিক ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুনামের সাথে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে ই-ব্যাংকিং, যা আধুনিক ব্যাংকিংকে নতুন দিগন্তে উন্নীত করেছে।[৬৫]

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের দৃষ্টিকোণ : ব্যাংকের উৎপত্তি ও এর ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতে হলে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে। কারণ কখন ব্যাংক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কখন মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়েছিল, কখন ঋণ প্রদান শুরু হয়েছিল এসব অনেক প্রশ্নের উত্তর পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় ও আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইদানিং প্রচুর সংখ্যক পুরাতাত্ত্বিক নির্দশন আবিষ্কৃত হচ্ছে যেগুলো দ্বারা ব্যাংকের উৎপত্তি ও এর ইতিহাস সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থান খনন করে যেসব প্রত্নতত্ত্ব পাওয়া গেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো মুদ্রা। এসব মুদ্রাগুলো বিভিন্ন সভ্যতা ও যুগের পরিচয় বহন করছে এবং এগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে কোথায় কখন কি ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল। কারণ মুদ্রার সাথে ব্যাংকের সুস্পষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে।

৬৫. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, জুন ২০১২), পৃ. ১৬

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ও শিকড় অনুসন্ধানে তাই পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের বিকল্প নেই। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আলোকেই এটা সর্বজনস্বীকৃত যে পাকিস্তানের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ থেকে ২০০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে মুদ্রার প্রচলন ছিল। মিশর, গ্রিক, রোম, পারস্য প্রভৃতি সভ্যতায় যে মুদ্রার প্রচলন ছিল তা অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়ার মাধ্যমে। সাম্প্রতিক সৌদি আরবে হাজার হাজার বছর পূর্বের হযরত সুলাইমান আ.-এর ধনসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে যার মধ্যে স্বর্ণমুদ্রাও আছে। এসব নিদর্শন তাই তৎকালীন সময়ের ব্যাংক ব্যবস্থার একটি চিত্র সকলের কাছে অতি নিখুঁতভাবে তুলে ধরছে।[৬৬]

ব্যাংকের পূর্বসূরির দৃষ্টিকোণ থেকে : ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে ব্যাংকের পূর্বসূরিদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বহু আলোচনা ও পর্যালোচনার পর ঐতিহাসিকগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সভ্যতার প্রথম থেকেই মুদ্রা ব্যবস্থার সাথে একদল লোক কাজ করে আসছে। তাদের কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এ বিশেষ শ্রেণির লোকগুলো যুগ যুগ ধরে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কোন না কোনভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহায়ক হিসাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। বিভিন্ন সময়ে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এরা মহাজন, কাবলিওয়ালা, সাহুকার, স্যাকরা, শরাফ, চেটি, স্বর্ণকার, ঋণের ব্যবসায়ী ইত্যাদি নামে পরিচিতি ছিল। তবে আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তিতে স্বর্ণকার শ্রেণির ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাদের সচ্ছলতার কারণে তারা সমাজে সৎ ও বিশ্বাসী বলে পরিচিত ছিল, তাদের কাছে স্বর্ণালংকার নিরাপদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। তারা জমাদানকারীকে আমানতকৃত সম্পদের বিপরীতে রসিদ প্রদান করত। এগুলো হস্তান্তর করা যেত। এ রসিদগুলোই কালক্রমে ব্যাংক নোটে রূপান্তরিত হয়েছে। তাছাড়া আমানতকারী চাওয়া মাত্র নির্দিষ্ট অংকের অর্থ পরিশোধের জন্য একটি নির্দেশপত্র দিতেন। এ নির্দেশপত্রই পরবর্তীতে চেকরূপে আবির্ভূত হয়েছে। স্বর্ণকাররা জনগণের জমাকৃত অর্থ থেকে কিছু অংশ ঋণ হিসেবে প্রদান করত এবং বিনিময়ে সুদ গ্রহণ করত। তাছাড়া স্বর্ণকাররা অর্থের নিরাপত্তা বিধানের পরিবর্তে সামান্য সার্ভিস চার্জ আদায় করত। মধ্যযুগের এক পর্যায়ে ইংল্যান্ডে স্বর্ণকাররা সরকার কর্তৃক জারিকৃত রুপার মুদ্রা সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে শুরু করে। কারণ এ রুপার মুদ্রার আক্ষরিক মূল্যের চেয়ে প্রকৃত মূল্য অনেক বেশি ছিল বিধায় তারা এগুলো গলিয়ে অলংকার বানিয়ে বিক্রি করত। তারা এভাবে অগাধ বিত্তের মালিক হয় এবং এক পর্যায়ে বিপুল অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা রাখতে শুরু করে। পরবর্তীতে তারা প্রাইভেট ব্যাংক ব্যবসায়ের বীজ বপন করে। কাজেই আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরি হিসাবে স্বর্ণকারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অপরদিকে মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে একদল ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণির উদ্ভব হয়। তারা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। আর্থিক সচ্ছলতার কারণে তারা জনগণের কাছে বিশ্বাসী ও আস্থাভাজন ছিল। নিরাপত্তার জন্য জনগণ তাদের কাছে অর্থ জমা রাখত। এ অর্থের একাংশ তারা ঋণের ব্যবসায়ে খাটাত। এভাবেই ব্যবসায়ী শ্রেণি আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। ব্যাংক ব্যবসায়ের সুদক্ষ রূপকার হিসেবে মহাজন শ্রেণির ভূমিকা অগ্রগণ্য। মহাজন শ্রেণি অতি প্রাচীনকাল থেকেই সুদের ব্যবসায়

---

৬৬. ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দিন, প্রগুক্ত, পৃ. ২৫

করে আসছে। এরা জমিজমা ও অলংকারাদি বন্ধকের মাধ্যমে বিত্তহীন কৃষক ও ব্যবসায়ীদেরকে বেশি সুদের বিনিময়ে ঋণ দিত। প্রথম ইতালিয় ইহুদি মহাজন শ্রেণির মধ্যেই সুদভিত্তিক এ ঋণের ব্যবসা ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছিল। উত্তর ইতালির ফ্লোরেন্সে 'মেডিসি' নামক মহাজন শ্রেণির লোকেরা ব্যাংক ব্যবসায় খ্যাতি লাভ করেছিল।[৬৭] সে সময় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি প্রভৃতি দেশেও এ ধরনের মহাজনী ব্যাংক ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরি

প্রাচীনকালে সমাজে যখন অর্থের প্রচলন ছিল না তখন ব্যাংক ব্যবস্থারও প্রয়োজন ছিল না এবং ব্যাংকের আস্তিত্বও ছিল না। সমাজে অর্থের প্রচলনের সাথে সাথে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হতে থাকে। তবে সমাজে ব্যাংক ব্যবস্থা একদিনে গড়ে উঠেনি। বহু শতাব্দীর ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ব্যাংক ব্যবস্থা উদ্ভবের প্রারম্ভে কোন কোন সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থের লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের অনুরূপ কিছু কিছু কার্যাবলি সম্পাদন করত। এদেরকেই আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরি বলা যায়। অধ্যাপক জিওফ্রে ক্রাউথার আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরিদেরকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বর্তমানকালের ব্যাংকারদের পূর্বসূরি হলো তিনটি শ্রেণি, ইহুদি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, মহাজন শ্রেণি ও স্বর্ণকার সম্প্রদায়।'[৬৮]

স্বর্ণকার শ্রেণি : প্রাচীনকাল ও মধ্যযুগে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক ব্যবস্থা ছিল না। তখন স্বর্ণকারগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাংক ব্যবসায়ে বা অর্থের ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পুরনো যুগে মানুষ তাদের সঞ্চিত অর্থ ও মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে গচ্ছিত রাখার জন্য স্বর্ণকারদের কাছে জমা রাখতেন। তাদের ধারণা ছিল যে স্বর্ণকারগণ সচ্ছল, সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার জন্য তাদের লোহার সিন্দুকও ছিল যা খুব নিরাপদ বলে তারা মনে করতেন। বিভিন্ন দেশে ব্যাংকিং ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বর্ণকারগণ ব্যাংক ব্যবস্থা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রাচীনকালে ইংল্যান্ড, ইতালিসহ ইউরোপ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বর্ণকারগণ ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রসার ঘটায়। এরা সমাজের সবচেয়ে বেশি বিত্তবান, বিশ্বস্ত ও সম্মানী ব্যক্তি ছিল। তাই তাদের নিকট সমাজের অন্যান্য সকল লোকজন স্বর্ণ, মণিমুক্তা, হীরক, রুপা প্রভৃতি নির্দ্ধিধায় জমা রাখত। আর তারা নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে এগুলো সংরক্ষণ করত এবং এর জন্য লোহার শক্ত সিন্দুক ব্যবহার করা হত। পর্যায়ক্রমে স্বর্ণ জমাকারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার স্বর্ণকারগণ জমার প্রমাণস্বরূপ হাত চিঠি-হাতে লেখা রসিদ (slip) জমাকারীকে সরবরাহ করত যা আজকের জমা রসিদ (Deposit slip) নামে পরিচিত। স্বর্ণ জমা গ্রহণকারীগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত এক ধরনের রসিদ জমা দিয়ে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ স্বর্ণ বা অর্থ উত্তোলন করতে পারত। এ রসিদই আজকের উত্তোলন চিঠি Withdral slip বা চেক (Cheque) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। জমাগ্রহণকারী বা স্বর্ণকারগণ

---

৬৭. ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দিন, প্রগুক্ত, পৃ. ৩২

৬৮. 'The present day banker has three ancestors; the jews mercent, the money lender and the goldsmith.' see. জিওফ্রে ক্রাউথার, *An Outline of Money*(Delhi : Universal Book Stall, 1995), p. 22

কর্তৃক প্রদেয় রসিদ হস্তান্তরযোগ্য ছিল। তাই এটিকে বর্তমানের ‘ব্যাংক নোট’ (Bank Note)-এর সাথে তুলনা করা যায়। পরবর্তীতে এ কাজের জন্য সামান্য হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করত যা আধুনিক যুগের ব্যাংক সেবা প্রদানের বিনিময়ে নিয়ে থাকে।

এভাবে স্বর্ণ বা অর্থ জমা গ্রহণের পর এক পর্যায়ে পরিদৃষ্ট হল যে, তাদের হাতে প্রচুর অর্থ, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি জমা পড়েছে। কিন্তু এক সাথে সকল জমাকারী বা স্বর্ণের মালিক এগুলো উঠিয়ে নিতে আসে না। তাই এ জমাকৃত বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ বা অর্থ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রেখে বাকি অর্থ বা স্বর্ণ ঋণ হিসেবে প্রদানের চিন্তার উন্মেষ ঘটে। ঋণ প্রদানের বিনিময়ে তারা ঋণের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করত। ধীরে ধীরে এ ঋণ দান যখন একটা লাভজনক ব্যবসায় হয়ে উঠল, তখন স্বর্ণকারগণ আরও বেশি আমানত বৃদ্ধির জন্য গচ্ছিত অর্থ, স্বর্ণ এবং মূল্যবান দ্রব্যাদির উপর সুদ প্রদান প্রথা চালু করে দেয়। এভাবে প্রাচীনকালে স্বর্ণকারদের অর্থনৈতিক কার্যাবলি লাভজনক হতে শুরু করে এবং তাদের কার্যকলাপ শক্তিশালী ব্যাংকিং জগৎ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। স্বর্ণকারদের কার্যাবলি ও সহযোগিতা ব্যতীত আজকের অত্যাধুনিক ব্যাংক ব্যবসায় গড়ে উঠা সম্ভব ছিল না।[৬৯] উল্লেখ্য যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি, বন্ধকী ঋণ, চেক, জমা রসিদ প্রভৃতি তৎকালীন স্বর্ণকারদের ব্যবসায়িক কার্যাবলি থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

মহাজন শ্রেণি : যে সকল ব্যক্তিবর্গ বিনিময়ে অর্থ ধার দিয়ে মুনাফা অর্জন করে। তাদেরকেই মহাজন শ্রেণি বলে। আইনগত বৈধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত এবং এমনকি আধুনিক যুগেও মহাজনেরা সুদভিত্তিক অর্থ ঋণ দেয়ার কাজ-কারবার চালাচ্ছে। আদিযুগে মহাজনী কারবারও ছিল খুব জম-জমাট। অর্থাৎ বিত্তবান বা ধনী ব্যক্তিরা অভাবগ্রস্থ ও দুঃস্থ লোকদেরকে অর্থ ঋণ দিত। মহাজনী কারবারে স্বর্ণ, রুপা, জমি-জমা ও মালামাল রেখেও অর্থ দেয়ার প্রথা ছিল। কম সুদে টাকা রেখে চড়াসুদে ঋণ দেয়ার ব্যাপারটা এভাবে শুরু হয়। আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রচলন ও উন্নয়নে এ শ্রেণির যথেষ্ট অবদান রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই এ শ্রেণির লোকজন সুদের ব্যবসায় করত। এসব মহাজনের নিকট দরিদ্র ও স্বল্পবিত্ত লোকজন জমি, অলংকার প্রভৃতি বন্ধক রেখে টাকা ধার নিত। এসব ধারের বন্ধকী সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যেত। এছাড়াও এ সকল মহাজনের নিকট বিত্তবান লোকেরা বিশ্বাস করে তাদের অর্থ-কড়ি, স্বর্ণ ইত্যাদি জমা রাখত। মহাজনরা জমাকৃত অর্থের একটি অংশ রেখে বাকি অংশ ব্যবসায় বা শিল্পে বিনিয়োগ করে লাভবান হত এবং লাভের কিছু অংশ জমাকৃত টাকার উপর সুদ হিসেবে জমাদানকারীকে প্রদান করত। এভাবে তাদের কার্যক্রম কালক্রমে ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠতে সহায়তা করে। ইতালিতেই এ ব্যবসায় প্রচলন বেশি ছিল। এ সময় ইতালির লোম্বার্ডি[৭০] প্রদেশের রাজধানী ফ্লোরেন্সের মেডিসি (Midici) নামক মহাজনরা এ সুদের ব্যবসায় বেশি করত। পরবর্তীতে অবশ্য এ ব্যবসায় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যান্ড,[৭১] বেলজিয়াম, সুইডেন[৭২] প্রভৃতি দেশেও প্রসার লাভ

---

৬৯. ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দিন, প্রগুক্ত, পৃ. ৩৭

৭০. ইতালীর লোম্বার্ডি প্রদেশের লোম্বাডি স্ট্রিটে খোলা রাস্তার উপর টেবিলে আধুনিক ব্যাংকের সূত্রপাত ঘটে মধ্যযুগে।

৭১. পশ্চিম ইউরোপের উত্তর প্রান্তে হল্যান্ডের আমস্টারডাম শহরে ১৬০৯ সালে স্থাপিত হয় দি ব্যাংক অব আমস্টারডাম। এ ব্যাংক আমানত হিসাবে সব ধরনের মুদ্রা গ্রহণ করত। জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র উত্তোলন করা যেত অথবা এক হিসাবে থেকে অন্য হিসাবে স্থানান্তর করা যেত। এটি ইউরোপে আধুনিক ব্যাংকিং-এর মডেল হিসেবে কাজ করেছে।

করে। পাক-ভারত উপমহাদেশেও এ ব্যবসায়ের প্রচলন ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। প্রাচীনকালে এতদাঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। তখন মহাজনী ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল। সমাজের বিত্তবান লোকেরা এ ব্যবসায় করত। তারা অল্প সুদে জনগণের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করত এবং অধিক সুদে দরিদ্র শ্রেণির লোকদের ঋণ দিত। এভাবেই এ অঞ্চলে ঋণের ব্যবসায়ের সূত্রপাত ঘটে। এ অঞ্চলে লগ্নি বা ঋণের ব্যবসায়ীদেরকে জৈন, চেটি, মহাজন, বানিয়া, স্বর্ণকার, টেট্রিয়ার, মূলতানি, মাদ্রাজি, শেঠ, সাহুকার, মাড়োয়ারি, কাবুলিওয়ালা প্রভৃতি নামে ডাকা হত। অতীতের বিখ্যাত মহাজন শ্রেণির মধ্যে ইউরোপের কুখ্যাত শাইলক, ভারতের জগৎশেঠ, মাড়োয়ারি ও কাবুলিওয়ালাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ইউরোপের মহাজন শ্রেণির লোকদের বিভিন্ন সময়ে বেস্কুসি, মেডিসি, পেরুজ্জি, পিট্টি, আরজেন্টারি, মিনসারি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হত। তৎকালে এরা আধুনিক ব্যাংকের ন্যায় আমানত গ্রহণ, ঋণদান, সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণ আমানত সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করত।

ব্যবসায়ী শ্রেণি : আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরিদের মধ্যে ব্যবসায়ী শ্রেণির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। অন্য কথায় আধুনিক ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রসারে বণিক সম্প্রদায় বা ব্যবসায়ীদের বিশেষ করে ইহুদি ব্যবসায়ীদের ভূমিকাও নগণ্য নয়। ইউরোপ ও ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবসায়ীদের কর্মতৎপরতা বেশি ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।[৭৩]

প্রাচীনকাল থেকেই এ শ্রেণির লোকেরা বিত্তশালী ছিল। এরা সমাজে সম্মানিত ও বিশ্বস্ত ছিল। তাই জনগণ নিঃসংকোচে তাদের নিকট অর্থ-সম্পদ, স্বর্ণালংকার প্রভৃতি জমা রাখত। তারা এ অর্থের অংশ বিশেষ ঋণের ব্যবসায় খাটাত। এ ব্যবসায়ীরা ইতালির ফ্লোরেন্স নগরে আধুনিক ব্যাংকিং-এর প্রসার ঘটায়। ভেনিস[৭৪] ও জেনোয়াতেও[৭৫] ব্যাংক ব্যবস্থা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ ব্যবসায়ের সাথে ইতালির লোম্বার্ডি শহরের ইহুদি ব্যবসায়ীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে যুগে ইহুদিরা নানাভাবে বন্ধু-বান্ধব, অত্মীয়-স্বজন এমনকি বিদেশে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও টাকা-পয়সা দিতেন। বিদেশে অর্থ পাঠাতে হলে বা বিনিয়োগ করতে হলে তাদের এজেন্টদেরকে লিখিত নির্দেশ দিতেন। অনেকে অনুমান করেন যে, আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতির লেটার অব ক্রেডিট, বিল অব এক্সচেঞ্জ, ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদির প্রচলন এ প্রাচীন লিখিত নির্দেশনামা থেকেই উৎপত্তি হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে এ ব্যবসায়ীগণ লম্বা টুল বা বেঞ্চে বসে অর্থ লেনদেন করত। অর্থ জমা রাখা এবং ধার দেয়ার কার্যাবলি পরিচালনা করত। এ লম্বা টুলকে বলা হত ব্যাংকো (Banco)। এ লম্বা টুল বা Banco বা Banca শব্দ থেকেই পরবর্তী পর্যায়ে আজকের ব্যাংক (Bank) শব্দটির উদ্ভব হয়েছে।

চতুর্দশ শতকে ইহুদি ব্যবসায়ীরা ইতালি থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংল্যান্ডে চলে আসে। এখানে এসেও তারা ঋণ ও সুদের ব্যবসায় গড়ে তুলে। পর্যায়ক্রমে তারা এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে অগাধ

---

৭২. ১৬৫৬ সালে রিস্ক ব্যাংক অব সুইডেন প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে এটিই প্রাচীন বলে অনেকের ধারণা।

৭৩. ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দিন, প্রগুক্ত, পৃ. ৩৯

৭৪. মহাকবি সেক্সপিয়ার তার 'মাচেন্ট অব ভেনিস' নাটকে একজন নির্দয় ইহুদি ব্যাংকারের চরিত্র এঁকেছেন নিপুণ হাতে। তার শাইলক একজন অত্যচারী মহাজনের প্রতিভূ হিসেবে যুগ যুগ ধরে মানুষের ঘৃণা কুড়িয়ে আসছে।

৭৫. ইতালির শহর জেনোয়াতে ১৪০৭ সালে ব্যাংক অব জেনোয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সম্পত্তির মালিক হয়। কালক্রমে তাদের বসবাসের এলাকার নাম লোম্বার্ডি স্ট্রিট (Lomberdy Street) নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে এ ইহুদিরা অর্থের ব্যবসাকে আরো গঠনমূলক ও কার্যকর করার জন্যই ইউরোপের দেশে দেশে ব্যাংক ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সময় থেকে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে শুরু করে। ইহুদি ব্যবসায়ীরা বৈদেশিক বাণিজ্যেও অর্থের সংস্থান করত। বিদেশে অবস্থিত নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধের জন্য তারা তাদের প্রতিনিধি বা বিদেশী বন্ধু-বান্ধবের নিকট নির্দেশ প্রদান করত। এছাড়া মার্চেন্ট হাউসের (Merchant House) মাধ্যমেও তারা বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ আদান-প্রদান করত। সুবিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত এ্যাডাম স্মিথ ১৭২৩ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ সময়ের ব্যবসায়ীদের ভূমিকাকে ফাইন্যান্স কোম্পানি (Finance Company) এর সাথে তুলনা করেছেন।[৭৬] এটি সর্বজনবিদিত যে, এ ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় ইতালিতে সরকারি উদ্যোগে প্রথম ১১৫৭ সালে 'ব্যাংক অব ভেনিস' (Bank of Venice) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপের ন্যায় এ সময় ভারতীয় উপমহাদেশেও ব্যবসায়ী শ্রেণি ঋণের ব্যবসায়ে জড়িত ছিল। এ অঞ্চলে তারা বৈশ্য, জৈন, পোদ্দার, শেঠ, মাড়োয়ারি, সাহুকার,[৭৭] চেটি শরফ, মুলতানি কাবুলিওয়ালা নামে পরিচিত ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়ের ষড়যন্ত্রকারী জগৎশেঠ, মাহতাব চাঁদ ও স্বরূপ চাঁদ সুদের ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন।[৭৮]

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার উন্নয়নে স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণির অবদান অনস্বীকার্য। বস্তুত তাদের অর্থনৈতিক কার্যাবলি, আর্থিক লেনদেন পদ্ধতি, অর্থ ব্যবসায় কালক্রমে ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাই প্রফেসর জিওফ্রে ক্রাউথার আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরি হিসেবে স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের অবদানের কথা অকপটে উল্লেখ করেছেন।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনে উল্লেখযোগ্য কতকগুলো প্রাচীন ব্যাংকের নাম, স্থান ও প্রতিষ্ঠার সালসহ নিচে উল্লেখ করা হলো–[৭৯]

১. শান্সি ব্যাংক (Shansi Bank)। ব্যাংকটি খ্রি.পূর্ব ৬০০ অব্দে চীনে প্রতিষ্টিত হয়।

২. ব্যাংক অব ভেনিস (Bank of Venice)। ১১৫৭ সালে ইতালিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক অব ভেনিস বিশ্বের প্রথম সরকারি ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃত।

৩. ব্যাংক অব সান জর্জিও (Bank of San Georgia)। এ ব্যাংকটি ১১৭৮ সালে জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

৭৬. এ্যাডাম স্মিথ, An enquiry in to the Nature and causes of Wealth of Nations, 1776, Book iv, Chapter iii, part-1.উদ্ধৃত মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *ব্যাংকিং ও বীমা*(ঢাকা : দি যুমনা পাবলিশার্স, জুন ২০০৪), পৃ. ১১

৭৭. নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন বাংলা বিহার উড়িষ্যার ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন তার বয়স ছিল ২৪ বছর। তার শাসনকালও ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ৯ এপ্রিল, ১৭৫৬ থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত। সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমিক ও সাহসী। রাজস্থানের কৃষিজীবী ব্যবসায়ী ফতেহ চাঁদের বংশধর জগৎশেঠ হিসেবে পরিচিত মহাতাব চাঁদ, মহারাজা স্বরূপ চাঁদ পলাশীর ষড়যন্ত্রের প্রধান চক্রান্তকারী ছিলেন। এরা ছিলেন জৈন ধর্মের শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের লোক। জগৎশেঠ-বিশ্ব ব্যাংকার, নগর শেঠ-শহর ব্যাংকার তৎকালে লন্ডনে জগৎ শেঠের মহাজনী ঘরের (Agency House) শাখা ছিল।

৭৮. ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দিন, প্রগুক্ত, পৃ. ৪৭

৭৯. প্রগুক্ত।

৪. ব্যাংক অব বার্সিলোনা (Bank of Barcelona)। ১৪০১ সালে ইতালিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক অব বার্সিলোনা সরকারি উদ্যোগে যাবতীয় সাংগঠনিক নিয়ম-কানুন পালন করে গণ ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে একে বিশ্বের প্রথম আধুনিক ব্যাংক হিসেবে গণ্য করা হয়।

৫. রিকস ব্যাংক অব সুইডেন (Riks Bank of Sweden)। ব্যাংকটি ১৬৫৬ সালে সুইডেনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (Bank of England)। যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ১৬৯৪ সালে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংকটি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এক নবধারার উন্মোচন করে।

৭. হিন্দুস্থান ব্যাংক (The Hindustan Bank)। হিন্দুস্থান ব্যাংক বা ব্যাংক অব হিন্দুস্থান ১৭০০ সালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি উপমহাদেশের প্রথম আধুনিক ব্যাংক। এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতে ব্যাংক ব্যবস্থায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে।

৮. ব্যাংক অব প্রুশিয়া (Bank of Prusia)। ব্যাংকটি ১৭৬৫ সালে জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯. দি বেঙ্গল ব্যাংক (Bengal Bank)। ব্যাংকটি ১৭৮৫ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০. সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Central Bank of India)। ব্যাংকটি ১৭৮৫ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১. ব্যাংক অব ফ্রান্স (Bank of France)। ব্যাংকটি ১৮০০ সালে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১২. ব্যাংক অব কলিকাতা (Bank of Calcutta)। ব্যাংকটি ১৮০৬ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩. ব্যাংক অব বোম্বে (Bank of Bombay)। ইহা ১৮৪০ সালে বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৪. ব্যাংক অব মাদ্রাজ (Bank of Madras)। ইহা ১৮৪৩ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫. র‍্যাঙ্ক ব্যাংক (Rank Bank)। ইহা ১৮৭৫ সালে জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬. ব্যাংক অব জাপান (Bank of Japan)। ইহা ১৮৮২ সালে জাপানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭. ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম (Federal Reserve System)। ইহা ১৯১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮. দি ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Imperial Bank of India)। এ ব্যাংকটি ১৯২০ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯. দি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Reserve Bank of India)। ইহা ১৯৩৫ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০. হাবিব ব্যাংক লিমিটেড (Habib Bank Ltd.)। এ ব্যাংকটি ১৯৪১ সালে ভারতের বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২১. মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড (Muslim Commercial Bank Ltd.)। এ ব্যাংকটি ১৯৪৭ সালে ভারতের কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

২২. স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (State Bank of Pakistan)। ব্যাংকটি পাকিস্তানের করাচিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৩. দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্থান (The National Bank of Pakistan)। ব্যাংকটি ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৪. ইষ্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড (Estern Merchantile Bank Ltd.) (বর্তমানে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড)। এ ব্যাংকটি ১৯৫৯ সালে বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৫. বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank)। এ ব্যাংকটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮০]

ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক

নিচে ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপিত হলো–

১. **দি অরিয়েন্ট ব্যাংক :** ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান কার্যালয় লন্ডনে। পরিশোধিত মূলধন ছিল ১২,১৫,০০০/- টাকা।

২. **দি আগ্রা এন্ড ইউপি ব্যাংক :** ১৮৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান কার্যালয় কলকাতায়। শাখা আগ্রা, মাদ্রাজ, লাহোর ও বোম্বাই। পরিশোধিত মূলধন ছিল ৭,০০,০০০/- টাকা।

৩. **দি ব্যাংক অব বোম্বে :** ১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান কার্যালয় বোম্বাই। শাখা বোম্বাই। পরিশোধিত মূলধন ছিল ৫,০০,০০০/- টাকা।

৪. **দি নর্থ ওয়েস্ট ব্যাংক :** ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান কার্যালয় লন্ডনে। শাখা বোম্বাই, সিমলা, মুসরিক, আগ্রা, দিল্লী এবং এনোপোর। পরিশোধিত মূলধন ছিল ২,২০,৫৬০/- টাকা।

৫. **দি কমর্শিয়াল ব্যাংক :** ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান কার্যালয় বোম্বাই। পরিশোধিত মূলধন ছিল ১০,০০,০০০/- টাকা।

৬. **দি দিল্লী ব্যাংক :** ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান কার্যালয় দিল্লী। পরিশোধিত মূলধন ছিল ১,৮০,০০০/- টাকা।

৭. **দি সিমলা ব্যাংক :** ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান কার্যালয় দিল্লী। শাখা দিল্লী, সিমলা। পরিশোধিত মূলধন ছিল ৬৩,৮০০/- টাকা।

৮. **দি ঢাকা ব্যাংক :** ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান কার্যালয় ঢাকা। শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ইসলামপুর। পরিশোধিত মূলধন ছিল ৩,০০,০০০/- টাকা।

৯. **দি মার্কেন্টাইল ব্যাংক :** ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান কার্যালয় বোম্বাই। শাখা লন্ডন, কলকাতা, কলম্বো এবং সাংহাই।

১০. **হাবিব ব্যাংক লিমিটেড :** ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান কার্যালয় বোম্বাই। শাখা বোম্বাই, লাহোর, করাচি।

---

৮০. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, জুন ২০১২), পৃ. ২১

১১. **রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া :**[৮১] **১৯৩৫** সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান কার্যালয় দিল্লী। শাখা দিল্লী। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর **১৯৪৯** সালের **১** মার্চ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়।[৮২]

একনজরে ব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস

গঠন কাঠামোভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : (১) একক ব্যাংক; (২) শাখা ব্যাংক; (৩) চেইন ব্যাংক; (৪) গ্রুপ ব্যাংক; (৫) মিশ্র ব্যাংক।

ব্যাংকের মালিকানাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : (১) সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক; (২) বেসরকারি ব্যাংক; (৩) স্বায়ত্বশাসিত ব্যাংক; (৪) আংশিক ব্যাংক; (৫) বিদেশি মালিকানাধীন ব্যাংক; (৬) সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক।

কারবারি সংগঠনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : (১) এক মালিকানা ব্যাংক; (২) অংশীদারি ব্যাংক; (৩) যৌথ কোম্পানি ব্যাংক; (৪) সমবায় ব্যাংক; (৫) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক।

অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : (১) আঞ্চলিক ব্যাংক; (২) জাতীয় ব্যাংক; (৩) আন্তর্জাতিক ব্যাংক; (৪) গ্রামীন ব্যাংক; (৫) গোষ্ঠী উন্নয়ন ব্যাংক।

কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : (১) কেন্দ্রীয় ব্যাংক; (২) বাণিজ্যিক ব্যাংক; (৩) কৃষি ব্যাংক; (৪) শিল্প ব্যাংক; (৫) সমবায় ব্যাংক; (৬) বিনিয়োগ ব্যাংক; (৭) সঞ্চয়ী ব্যাংক; (৮) বিনিময় ব্যাংক; (৯) বন্ধকী ব্যাংক; (১০) পরিবহন ব্যাংক; (১১) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক; (১২) খুচরা ব্যাংক; (১৩) পাইকারি ব্যাংক; (১৪) সার্বজনীন ব্যাংক; (১৫) মার্চেন্ট ব্যাংক।

নিবন্ধনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : (১) দেশীয় ব্যাংক; (২) বিদেশি ব্যাংক।

তালিকাভুক্তির ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ : (১) অতালিকাভুক্ত ব্যাংক; (২) তালিকাভুক্ত ব্যাংক।

বিশেষ গ্রাহকভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : (১) শ্রমিক ব্যাংক; (২) মহিলা ব্যাংক; (৩) স্কুল ব্যাংক; (৪) ভোক্তা ব্যাংক; (৫) গৃহ সঞ্চয়ী ব্যাংক।

এলাকাভিত্তিক শেণীবিভাগ : (১) নগর ব্যাংক; (২) পল্লী ব্যাংক; (৩) বিশেষ এলাকা উন্নয়ন ব্যাংক।

নিয়ন্ত্রণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : (১) পূর্ণ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক; (২) আংশিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক; (৩) বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যাংক।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কয়েকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম : বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক রয়েছে। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম (দেশ, প্রতিষ্ঠার সাল ও প্রকৃতিসহ) প্রদত্ত হলো−

১. **দি রিকস ব্যাংক অব সুইডেন (সুইডেন, ১৬৫৬) :** ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের প্রথম ব্যাংক। এটিকে **১৬৬৮** সালে জাতীয় ব্যাংকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়।

---

৮১. ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের ১ মার্চ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়।

৮২. ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

২. **দি ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (যুক্তরাজ্য, ১৬৯৪, ২৭ জুলাই)**[৮৩] : প্রথমে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৮ সালের ১ মার্চ জাতীয়করণ করা হয়।[৮৪] শুরু থেকেই এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এটি বিশ্বের প্রথম সংগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একে Mother of all Central Bank বলা হয়।

৩. **দি ব্যাংক অব ফ্রান্স (ফ্রান্স, ১৮০০) :** এটি সরকারি সহায়তায় বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক। ১৯৪৫ সালে এটাকে সরকারিকরণ করা হয়।

৪. **ব্যাংক অব নেদারল্যান্ড (নেদারল্যান্ড, ১৮১৪) :** এটি বেসরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত। তবে এর পরিচালনা বোর্ডে সরকারের পক্ষ থেকে সদস্য নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

৫. **ব্যাংক অব নরওয়ে (নরওয়ে, ১৮১৭) :** এটি বেসরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত। তবে এর পরিচালনা পর্ষদে নিজস্ব আইন অনুযায়ী সরকারি কর্তৃত্ব বিদ্যমান।

৬. **ন্যাশনাল ব্যাংক অব ডেনমার্ক (ডেনমার্ক, ১৮১৮) :** প্রথমে ব্যাংক অব কোপেনহেগেন নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক। তবে এর উপর সরকারি কর্তৃত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা আছে।

৭. **ব্যাংক অব স্পেন (স্পেন, ১৮৫৬) :** এটি সরকারি কর্তৃত্বাধীন বেসরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত।

৮. ব্যাংক অব রাশিয়া (বর্তমান নাম দি গস্ ব্যাংক) (রাশিয়া, ১৮৬০) : ব্যাংকটি ১৯১৭ সালে এসে সরকারিকরণ করা হয় এবং এর নতুন নাম রাখা হয়।

৯. **ডয়েস বুন্ডেস ব্যাংক (প্রাচীন নাম রিকস ব্যাংক অব জার্মানি) (জার্মানি, ১৮৭৫) :** বেসরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও নিজস্ব বিধান অনুসারেই এর উপর সরকারি কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকে। ১৯৪৮ সালের ৩২ জুলাই থেকে নতুন নামে পরিচিত।

১০. **দি ব্যাংক অব জাপান (নিপ্পন জিঙ্কে) (জাপান, ১৮৮২) :** বেসরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রথম থেকেই এর পরিচালনায় সরকারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে।

১১. **দি ব্যাংক অব ইতালি (ইতালি, ১৮৯৩) :** বেসরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক। ১৯২৬ সালে এ ব্যাংক সম্পূর্ণ নোট ইস্যুর অধিকার পায়।

১২. **দি সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (সুইজারল্যান্ড, ১৯০৭) :** ৫৫% সরকারী + ৪৫% বেসরকারি।

১৩. **দি ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৯১৪) :** ১২টি আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের সমন্বয়ে গঠিত ব্যাংক। ১৯১৪ সালের ১০ই আগষ্ট থেকে কার্য আরম্ভ করে।

---

৮৩. M.C. Vanish, *Money*, *Banking & International Trade*(London : 8th update edition, 1996), p. 251

৮৪. ১৬৯৪ সালে যুক্তরাজ্যের তৎকালীন রানীর বিশেষ সনদবলে যৌথ মূলধনী কারবার হিসেবে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৫ সালে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসলে ১৮৪৬ সালের ১ মার্চ তারিখে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে জাতীয়করণ করা হয়।

১৪. **দি ব্যাংক অব চায়না (চীন, ১৯২৮) :** বেসরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৪৯ সালে এটি রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়।

১৫. **মারকেজ ব্যাংকাসি (তুরস্ক, ১৯৩১) :** প্রথম নাম ছিল সেন্ট্রাল ব্যাংক অব দি রিপাবলিক অব তুর্কি। এটি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক।

১৬. **দি ব্যাংক অব কানাডা (কানাডা, ১৯৩৪) :** ১৯৩৮ সালে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়।

১৭. **দি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (ভারত, ১৯৩৫) :** ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়।

১৮. **দি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (পাকিস্তান, ১৯৪৮) :** ৫১% সরকারী + ৪৯% বেসরকারি শেয়ারে যাত্রা শুরু।

১৯. **বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ, ১৯৭১)**[৮৫] **:** শুরু থেকেই সরকারি মালিকানাধীনে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক।

২০. **দি ব্যাংক মারকাজি (ইরান, ১৯৬১) :** ১৯৭৯ সালে সরকারিকরণ করা হয়।

২১. **দি রিজার্ভ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়া (অস্ট্রেলিয়া, ১৯৬০) :** রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক।

২২. **দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব ইরাক (ইরাক, ১৯৪৯) :** ১৯৬২ সালে জাতীয়করণ করা হয়।

২৩. **দি কিউবান ন্যাশনাল ব্যাংক (কিউবা, ১৯৫০) :** রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক।

২৪. **দি ব্যাংক অব পর্তুগাল (পর্তুগাল, ১৯৪৬) :** সরকারি ও বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক।

২৫. **দি বেনকোডা ব্রাজিল (ব্রাজিল, ১৯৪১) :** সরকারি ও বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক।

২৬. **দি ব্যাংক অব মেক্সিকো (মেক্সিকো, ১৯২৫) :** ৫১% সরকারি + ৪৯% বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক।

বাংলাদেশে ৬ ধরনের মোট ৬২ টি ব্যাংক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[৮৬] যথা–

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১টি;
২. রাষ্ট্র-মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (SCB) ৬টি;
৩. রাষ্ট্র-মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (SSB) ২টি;
৪. বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (PCB) ৩৯টি;
৫. বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক (FCB) ৯টি;
৬. তফসিল বহির্ভূত ব্যাংক ৬টি।

---

৮৫. ১৯৭১ সালের ২৩ ডিসেম্বর নবগঠিত বাংলাদেশের মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ব্যাংক নাম রাখা হয়। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার, এই দিনটিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্মদিন হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। যদিও বাংলাদেশের নিজস্ব ব্যাংকিং পদ্ধতির সূচনা হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে। তথাপি দেশে সত্যিকার ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয় ১ জানুয়ারি ১৯৭২ সাল থেকে।

৮৬. *Bangladesh Economic Review 2016*, Economic Adviser's Wing, Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh(Dhaka : Bangladesh Government Press, November 2016), p. 61

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপ :

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক : বাংলাদেশ ব্যাংক : বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক। এর অবস্থান দেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে। মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড তদারকি করা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব। দেশের কৃষি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণখাতে ঋণের/ বিনিয়োগের প্রবাহ নিশ্চিতকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনাও বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে তৎকালীন স্টেট ব্যাংব অব পাকিস্তানের ঢাকাস্থ ডেপুটি গভর্নরের আঞ্চলিক অফিসটিকে রাষ্ট্রপতি এক অস্থায়ী আদেশবলে রাষ্ট্রায়ত্ব করেন এবং বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেন। তখন এটি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ঢাকাস্থ শাখার যাবতীয় দায়দায়িত্ব ও সম্পদ নিয়ে কাজ আরম্ভ করে। পরে বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ হতে একে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৮৭]

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আর্থ-ব্যবস্থাপনাসহ দেশের ব্যাংকিং খাতের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, সার্বিক লেনদেন ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু পরিচালনা, নোট ইস্যুকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং সরকারের যাবতীয় লেনদেন ছাড়াও দেশের মুদ্রা ও ঋণনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে টাকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মূল্যমান যুক্তিসংগত পর্যায়ে রাখা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা। গভর্নরসহ ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকায় দু'টি এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, সিলেট, রংপুর, বরিশাল ও ময়মনসিংহতে একটি করে শাখা কার্যালয় রয়েছে। এ সমস্ত শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থ-ব্যবস্থাপনাসহ দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক কার্যক্রম তদারকির গুরুদায়িত্ব পালন করছে।

বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকসমূহের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠার সাল	শাখা সংখ্যা	ব্যাংকের ধরন
বাংলাদেশ ব্যাংক	১৯৭২	১০	কেন্দ্রীয় ব্যাংক
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড[৮৮]	১৯৭২	১২০৭	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড[৮৯]	১৯৭২	৯০৮	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২	৯৩২	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২	৫৫৬	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯২	৬৮	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক

৮৭. রাষ্ট্রপতির আদেশ নং- ১২৭, ১৯৭২। যা বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডর ১৯৭২ নামে পরিচিত। মূলত তৎকালীন 'স্টেট ব্যাংক পকিস্তান' এর বাংলাদেশ এলাকায় অবস্থিত আঞ্চলিত প্রধান কার্যালয়কেই উক্ত আদেশ বলে বাংলাদেশ ব্যাংকে রূপান্তর করা হয়।

৮৮. সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম*(ঢাকা : ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৬), পৃ. ৪০

৮৯. *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠার সাল	শাখা সংখ্যা	ব্যাংকের ধরন
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ	২০১০	৩৮	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক[৯০]	১৯৭৩	১০৩০	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক[৯১]	১৯৮৭	৩৭৮	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক
পূবালী ব্যাংক লিঃ	১৯৮৪	৪৪৪	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
উত্তরা ব্যাংক লিঃ	১৯৭২	২২৭	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
এবি ব্যাংক লিঃ	১৯৮২	১০১	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	১৯৮৩	১৯১	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
দি সিটি ব্যাংক লিঃ	১৯৮৩	১২০	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ	১৯৮৩	১৩০	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	১৯৮৩	১৫৮	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ইষ্টার্ন ব্যাংক লিঃ	১৯৯২	৮০	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ	১৯৯৩	১০৪	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
প্রাইম ব্যাংক লিঃ	১৯৯৫	১৪৫	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ	১৯৯৫	৬৫	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ঢাকা ব্যাংক লিঃ[৯২]	১৯৯৫	৮৭	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ	১৯৯৬	১৬৯	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	১৯৯৯	১২১	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ	১৯৯৯	১০৪	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ওয়ান ব্যাংক লিঃ	১৯৯৯	৯১	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ	১৯৯৭	৪৮	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ[৯৩]	১৯৯৯	১০৬	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ	১৯৯৯	৯৭	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ব্যাংক এশিয়া লিঃ	১৯৯৯	১০৫	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	১৯৯৯	১০৭	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
যমুনা ব্যাংক লিঃ	২০০১	১০২	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ	২০০১	১৭৫	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ	২০১৩	৩৮	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
মেঘনা ব্যাংক লিঃ	২০১৩	২৬	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
মিডল্যান্ড ব্যাংক লিঃ[৯৪]	২০১৩	২০	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ	২০১৩	৪৪	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক[৯৫]
এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিঃ	২০১৩	৪৫	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
মধুমতি ব্যাংক লিঃ[৯৬]	২০১৩	১৫	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
এন আর বি ব্যাংক লিঃ	২০১৩	১৭	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	২০১৩	৪০	বেসকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	১৯৮৩	৩০৫	বেসকারি ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক

---

৯০. *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠার সাল	শাখা সংখ্যা	ব্যাংকের ধরন
আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিঃ[৯৭]	১৯৮৭	৩৩	বেসকারি ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ	১৯৯৫	১২৯[৯৮]	বেসকারি ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	১৯৯৫	১১১	বেসকারি ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক
এক্সিম ব্যাংক লিঃ[৯৯]	১৯৯৯	১০৩	বেসকারি ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ	১৯৯৯	১৪৮	বেসকারি ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ[১০০]	২০০১	১১৩	বেসকারি ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড[১০১]	২০১৩	৪৪	বেসকারি ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১৯৭৬	৭	বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক
হাবিব ব্যাংক লিমিটেড[১০২]	১৯৭৬	৭	বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া[১০৩]	১৯৭৫	৬	বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক
কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন পিএলসি	২০০৩	১০	বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান[১০৪]	১৯৯৪	৪	বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক
সিটি ব্যাংক এন.এ.	১৯৯৫	৪	বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক
উরি ব্যাংক[১০৫]	১৯৯৬	৫	বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক
এইচএসবিসি ব্যাংক	১৯৯৬	১৩	বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ব্যাংক আলফালাহ লিঃ[১০৬]	২০০৫	৭	বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	১৯৯৫	২১৯	তফসিল-বহির্ভূত ব্যাংক
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭৭		তফসিল-বহির্ভূত ব্যাংক[১০৭]
গ্রামীণ ব্যাংক[১০৮]	১৯৭৪	২৫৬৮	তফসিল-বহির্ভূত ব্যাংক
কর্মসংস্থান ব্যাংক	১৯৯৮	২১২	তফসিল-বহির্ভূত ব্যাংক
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক[১০৯]	২০১১	৪৯	তফসিল-বহির্ভূত ব্যাংক

গভীর বিশ্লেষণের পর বলা যায় যে, ব্যাংকিং ও ফিন্যান্স-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণে পরিদৃষ্ট হয় যে, দ্বাদশ শতকে ইতালির অনেক পূর্ব থেকেই বহু সভ্যতায় ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রচলিত ছিল। অথচ, বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ ইতালিকে 'ব্যাংকিং-এর জন্মস্থান' বলে ধারণা করেন। এর অনেক পূর্বেই ইসলামি, রোমান, গ্রিক, মিশরীয়, এমনকি ব্যাবিলনীয় ও সুমেরিয় সভ্যতায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুশীলন ছিল। বস্তুত, অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণে পরিদৃষ্ট হয়, খ্রিস্টপূর্ব ৩৪ শতকে অর্থাৎ প্রায় ৫,৪০০ বছর পূর্বে ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো অত্যন্ত আধুনিক ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনা করত। তারা সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয় সুরক্ষা ও যাদের অর্থের

৯৭. *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
১০৮. প্রাগুক্ত।
১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

প্রয়োজন হতো তাদের ঋণ দিয়ে ব্যাংকের মতই কাজ করত। এস. এইচ. হোমুদ উল্লেখ করেছেন, ‘একে অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বের বিভিন্নস্থানে লুপ্ত হয়ে যাওয়া অনেক প্রাচীন সভ্যতায় বিভিন্ন ধরন, আকার ও বেশে ব্যাংকিং প্রচলিত ছিল।’[১১০] ইউরোপে কিভাবে আধুনিক ব্যাংকিং-এর বিকাশ ঘটে এবং পরে মুসলিম বিশ্বে স্থানান্তরিত হয়, তা উক্ত বিবরণ থেকে প্রত্যক্ষ করা গেছে। সুদভিত্তিক ব্যাংকে সঞ্চয় রাখতে মুসলিমদের অনীহার কারণে মুসলিম বিশ্বে সুদভিত্তিক আধুনিক ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমে যে ঘাটতি দেখা দেয়, ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা কিভাবে সে ঘাটতি পূরণে এগিয়ে আসে, এ বর্ণনা থেকে তাও প্রত্যক্ষ করা যায়। সুদ হল রিবা এবং ইসলামে রিবা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। তাই প্রয়োজনের তাগিদেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা।

১১০. এস.এইচ. হোমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামি ব্যাংক হলো ইসলামি শারি'আহ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত কল্যাণমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামি শারি'আহ অনুযায়ী বিশ্বে কোন ব্যাংকব্যবস্থা হতে পারে এমন ধারণা অগ্রাহ্যকারীদের সংখ্যা অতীতে নিতান্তই কম ছিল না। কালের বিবর্তনে ইসলামি ব্যাংক আজ বাস্তব ও ধ্রুব সত্য। আধুনিক ইসলামি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা অনেকটা বিলম্বে হলেও এ ব্যাংকের মৌলিক ভিত্তি ও পদ্ধতিগত বিচারে বাস্তবিক পক্ষে এর উৎপত্তি হয়েছিল প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর যুগে। রাসুলুল্লাহ সা. নিজেই এ পদ্ধতির সফল ও কৃতি উদ্যোক্তা ছিলেন।

সমকালীন বিশ্ব অর্থনীতিতে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা নতুন দিগন্ত উম্মোচনকারী একটি কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা বিশ্বে আজ শুধু বাস্তবই নয়; এর সাফল্য, অগ্রগতি, নৈতিক ও আদর্শিক অবস্থান এবং চমৎকার গ্রহণযোগ্যতা বিশ্ব মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক যে আদর্শগত পার্থক্য তা জনসাধারণকে দৈনন্দিন ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহণে ইসলামি ব্যাংকে অতি মাত্রায় আকর্ষণ করছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অন্যান্য কল্যাণমুখীতার জন্য বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ ইসলামি ব্যাংকসমূহকে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ অবলম্বন হিসেবে মনে করতে শুরু করেছেন। এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় হলো ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি এবং এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।

ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি

ইসলামি ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালার বাস্তবায়ন করা।[১১১]

ওআইসি ইসলামি ব্যাংকের একটি চমৎকার ও সাবলীল সংজ্ঞা প্রদান করেছে যা নিচে উদ্ধৃত হল,

> 'Islami Bank is a financial Institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations.'[১১২]

---

১১১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৭), পৃ. ২৬১

১১২. 'ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা এর মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির সকল পর্যায়ে ইসলামী শারী'আহ্‌র নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকাণ্ডের সকল স্তরে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্‌ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্‌ অব বাংলাদেশ, ২য় সং., জুলাই ২০১০), পৃ. ৮১; Definition by the General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference accepted in the Foreign Ministers Conference held in Dakar in 1978, cited in the *'Text Book on Islamic Banking'*, IERB, 2004; Dr. Ataul Haque, *Reading in Islamic Banking* (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1987), p. 188; M. Ali & A. A Sarker, *Islamic Banking, Principles and Operational Methodology, Thoughts on Economics*(Dhaka : IERB, Vol. 5, Issue 4-5, July-December 1995) pp. 20-25

মালয়েশিয়ার ইসলামি ব্যাংকিং আইন-১৯৮৩ অনুসারে ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা হলো,

'ইসলামি ব্যাংক এমন এক কোম্পানি যা ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত; আর ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবসা এমন ধরনের ব্যবসা যার লক্ষ্য ও কার্যক্রমের কোথাও এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনি।'[১১৩]

'ইসলামি ব্যাংক' এর সংজ্ঞায় International Association of Islamic Banks বলেছে,

> 'The Islamic Bank basically implements a new banking concept, in that it adheres strictly to the ruling of Islamic Shariah in the fields of finance and other dealings. Moreover, the bank which is functioning in this way must reflect Islamic Principles in real life. The bank should work towards the establishment of an Islamic Society; hence, one of its primary goals is the deepening of the religious sprit among the people.'[১১৪]

ডক্টর মোহাম্মাদ হায়দার আলী মিঞা বলেন,

'ইসলামি ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ইসলামিক শারি'আহ্র নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং লেনদেনের কোন অবস্থাতেই সুদগ্রহণ ও প্রদান করেনা।'[১১৫]

ডক্টর শাওকি ইসমাইল শাহতা ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে বলেন,

> 'It is therefore, imperative for an Islamic bank to incorporate in its functions and practices commercial Investment and social activities, as an Institution designed to promote the civilized mission of an Islamic economy.'[১১৬]

ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমদ-এর মতে,

> "Islamic Banking is essentially a normative concept and could be defined as conduct of banking in consonance with the ethos of the value system of Islam."[১১৭]

---

১১৩. 'Islamic Bank' means any company which carries on Islamic Banking Business and holds a valid license; and all the offices and branches in Malaysia of such a bank should be deemed to be one bank. 'Islamic Banking Business' means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the religion of Islam.' লজ অব মালয়েশিয়া; ইসলামিক ব্যাংকিং এ্যাক্ট, এ্যাক্ট নং ২৭৬, সেকশন-২; ১৯৮৩ সালের ৯ মার্চ রাজকীয় অনুমোদন প্রাপ্ত; ১৯৮৩ সালের ১০ মার্চ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত, পৃ. ৮; দ্র. ড. মুহাম্মাদ হায়দার আলী মিঞা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১১৪. 'ইসলামী ব্যাংক মূলত একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়, যাতে তা অর্থায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামী শারী'আহ্র বিধি-বিধান কঠোরভাবে মেনে চলে। অধিকন্তু, ইসলামী ব্যাংক এভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বাস্তবজীবনে ইসলামী বিধি-বিধানকে অবশ্যই প্রতিবিম্বিত করবে। ব্যাংককে একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত এবং সেজন্য এর অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য হলো জনগণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা গভীরভাবে প্রোথিত করা।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

১১৫. 'Islami Bank is a financial institution which will not receive or pay interest in any of its form and its all activities will be in accordance with the principles of Islamic shariah.' দ্র. ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং : কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১১৬. 'কাজেই ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ও প্রয়োগ রীতিতে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ও সামাজিক কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরি, যেন এটি (ইসলামী ব্যাংক) ইসলামী অর্থনীতির সুশীল লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করতে পারে।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

১১৭. 'ইসলামী ব্যাংকিং হলো একটি নীতিগত ধারণা এবং এটিকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকিং হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

অতএব উপরের সংজ্ঞাসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলামি ব্যাংকিং আর্থিক মধ্যস্থতার এমন একটি পদ্ধতি যা তার লেনদেনে সুদ গ্রহণ ও প্রদান করেনা এবং এর কার্যাবলি এমনভাবে পরিচালনা করে যাতে ইসলামি অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয়। এটি এমন এক ব্যাংকিং পদ্ধতি যা লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ লেনদেনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো লাভ-লোকসানে অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনীতিতে সমতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

ইসলামি ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ব্যাংকিং হলো আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও সভ্যতালালিত বহুবিধ উপাদানের মধ্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী অনুষঙ্গ। এটি মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু ঘৃণিত সুদের সংমিশ্রণের ফলে গোটা ব্যাংকব্যবস্থাই কলূষিত হয়েছে। মুসলিমগণ কোন অবস্থাতেই সুদভিত্তিক ব্যাংকের কাছে যেতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতা'আলা সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন।[১১৮] পবিত্র কুরআনে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর কোন মু'মিনের জন্য সুদের ধারে কাছে যাওয়ারও সুযোগ থাকতে পারে না। অথচ ব্যাংকব্যবস্থায় সম্পূর্ণ সুদনির্ভর লেনদেন নীতি মুসলিমগণের ইমান-আকিদার উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে আসছে। সুদের কুফল বিষয়ে আরো অনেক কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

> 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ; কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমরা নিজের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা কাউকে অত্যাচার করবে না এবং তোমরাও অত্যাচারিত হবে না।'[১১৯]

'ইসলামি ব্যাংকিং' আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে ব্যাংকিং

একাদশ শতাব্দীতে ইসলামি সাম্রাজ্যের পতন শুরু হওয়ার পর থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী ধরে দীর্ঘ এক অবক্ষয় ও অবনতিশীল অবস্থার মধ্যে পার করে মুসলিম বিশ্ব। এ যুগটি 'অবনতির যুগ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। রোমান সাম্রাজ্য পতনের পর থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে যেমন 'অন্ধকার যুগ' বিরাজ করে, এটাও ঠিক তেমনি। রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক–জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ অবক্ষয় দেখা দেয়। এর ক্ষতিকর পরিণতি ছিল বিপর্যয়কর।

এক সময়ের ঐক্যবদ্ধ খিলাফত ছোট ছোট অসংখ্য আঞ্চলিক শক্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। স্বৈরশাসন, প্রজা উৎপীড়ন ও অবিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মোঙ্গল, তাতার, ক্রুসেডারসহ অন্যদের জন্য মুসলিম বিশ্বে হানা দেয়া সহজ হয়ে পড়ে। তারা মুসলিম রাজ্যগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার এবং অনেকগুলোকে কলোনিতে পরিণত করে।

---

১১৮. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫-২৭৬

১১৯. আল-কুরআন, ২ : ২৭৮-২৭৯

শারি'আহভিত্তিক এক সময়ের ন্যায়পরায়ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা–সামরিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়। যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সহায়ক ছিল না। দরিদ্র, দুস্থ, বৃদ্ধ ও শিশুদের পরিচর্যায় নিবেদিত বায়তুল মাল (কোষাগার) গভর্নর, উজির, সেনাপতি ও কর আদায়কারীদের একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ফলে, সাধারণ মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে। তারা নির্যাতন, অবিচার হত্যা বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে সমৃদ্ধ নগরকেন্দ্র ছেড়ে গ্রাম্য পাহাড়ি এলাকায় চলে যায়। তাদের মধ্যে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, রহস্যবাদ, মূর্তিপূজা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।[১২০]

দশম শতকের তুলনায় কৃষিকাজ সংকুচিত হয়ে নগণ্য পর্যায়ে নেমে আসে। পাশাপাশি, জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে কমতে শুরু করে। জমি বরাদ্দ দেয়া হত কর্মকর্তাদের অথবা তারা নিজেরাই নিয়ে নিত। কৃষি পদ্ধতি অপরিবর্তিত থেকে যায়। সম্ভবত ১৯৬০-এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত বেশিরভাগ কৃষক লোহার বদলে কাঠের লাঙ্গল ব্যবহার করত। এর ফলে শস্যের ফলন ছিল অত্যন্ত কম এবং ফসল ও গবাদিপশু– দু'টোই অব্যাহতভাবে খরা, পোকার আক্রমণ ও রোগের শিকার হতো।[১২১]

ঔপনিবেশিকদের নিয়ে আসা ইউরোপীয় কলের তৈরি ভোগ্যপণ্যের বন্যা স্থানীয় হস্তশিল্পের উপর চরম আঘাত হানে। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে এ হস্তশিল্পের একটা বড় অংশের বিলুপ্তি ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প পণ্যের সঙ্গে কয়েক শতক পূর্বে তৈরি হস্তশিল্পের তুলনা করলে বুঝা যাবে যে, এগুলোর উৎপাদন কেবল থেমে যায়নি বরং উল্টোদিকে চলতে শুরু করে।[১২২]

একাদশ শতাব্দী থেকে বাণিজ্য মুসলিমদের কাছ থেকে ইউরোপীয়দের কাছে চলে যেতে শুরু করে। দ্রুত এরাই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান পণ্যবাহক ও ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়।[১২৩]

ভোজেল ও হায়েস লিখেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মুসলিম বিশ্বের প্রায় প্রতিটা দেশ নতুন প্রভাববিস্তারকারী পশ্চিমা বিশ্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপের কারণে, বিশেষ করে প্রশাসন ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পশ্চিমা ধাঁচের আইন ও আইনি ব্যবস্থা চালু করতে বাধ্য হয়। শত শত বছরের পুরনো ইসলামি অর্থব্যবস্থার চর্চা রাহুতে ঢাকা পড়ে। ইউরোপের প্রভাবে বেশিরভাগ দেশ পশ্চিমা ধাঁচের ব্যাংকিং পদ্ধতি ও ব্যবসা মডেল গ্রহণ এবং ইসলামি বাণিজ্যিক পদ্ধতির চর্চা পরিত্যাগে উৎসাহিত হয়। স্বাধীনতা লাভ, বিদেশি ব্যাংক জাতীয়করণ এবং দেশিয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে বিদেশি ব্যাংকের আধিপত্যের অবসান ঘটে। কিন্তু, নতুন ব্যবস্থা এক ধরনের 'নব্য-ঔপনিবেশিক' ব্যাংকিং পদ্ধতি হয়ে উঠে।[১২৪] এটা ঠিক, বিদেশি ব্যাংক জাতীয়করণ এবং নতুন দেশিয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠার ফলে এগুলো জাতীয় ব্যাংকে পরিণত হয় এবং তা জাতীয়

---

১২০. সি. ইসাবি, *The Economic History of The Middel East 1800-1914*(শিকাগো : ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৬৬), পৃ. ৪

১২১. বি. লুইস, *Cambridge History of Islam*(ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭০), পৃ. ১০৫ ও ১১৩; সি. ইসাবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩, ২১ ও ৬৫

১২২. সি. ইসাবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮ ও ৪৬

১২৩. সি. ইসাবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; এ. লেউইস, *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*(ম্যানচেস্টার : ম্যানচেস্টার স্কুল অব ইকনমিকস, ১৯৫৪), পৃ. ১১৪

১২৪. এফ. ভোজেল এবং এস. হায়েস, *Islamic Law and Finance*(দি হেগ : ক্লুয়ার ল' ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৯৮), পৃ. ৪ ও ১৯

স্বার্থ দেখাশুনা করে। কিন্তু, এগুলোর পরিচালনা পদ্ধতি বিদেশি ব্যাংকের মতই থেকে যায় এবং এগুলো সুদের ভিত্তিতে কার্যক্রম চালাতে থাকে। অথচ এ ব্যবস্থা মুসলিম জনগণের বিশ্বাসের পরিপন্থী। ফলে, জন্ম নেয় 'ইসলামি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার ধারণা। এ ব্যাংক, মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস অক্ষুন্ন রেখেই গতানুগতিক সকল ব্যাংকিং সেবা দিবে। 'ইসলামি ব্যাংক' বা 'সুদমুক্ত ব্যাংক'- যে নামেই একে অভিহিত করা হোক না কেন, তা ছিল ইসলামে পুনরুজ্জীবনের ফসল। এর সূচনা অনুসন্ধানে ১৯৩০, ১৯৪০ ও ১৯৫০ এর দশকের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। এ সময় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে।

ট্রাউট এবং উইলসন দেখান যে, ১৯৫০-এর দশকের শেষভাগে পাকিস্তানের একটি গ্রামে প্রথম ইসলামি ব্যাংক স্থাপনের উদ্যেগ নেয়া হয়েছিল। তবে, এর প্রভাব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিছু ধর্মভীরু ব্যক্তি পরীক্ষামূলকভাবে একটা সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তারা সুদমুক্ত তহবিল সংগ্রহ করতেন এবং সেখান থেকে গরিব ভূমি মালিকদের কৃষিকাজের জন্য ঋণ দেয়া হতো। ঋণের জন্য কোন সুদ নেয়া হত না। তবে, ব্যাংকের পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য অল্পকিছু 'ফি থাকত ।[১২৫] যা হোক, উইলসন লিখেন, 'যদিও ঋণ নেয়ার লোকের কোন কমতি ছিল না, কিন্তু ফেরত পাওয়া যাবে না ভেবে তহবিলদাতারা প্রতিষ্ঠানটাকে তাদের অর্থ একবারের জন্য দিতেন। ফলে, শিগগিরই ব্যাংকটাতে তহবিল ঘাটতি দেখা দেয়। অধিকন্তু, ব্যাংক কিভাবে ঋণ বিতরণ করছে এসব বিষয়ে অতিমাত্রায় আগ্রহ দেখাতে লাগলেন তহবিলদাতারা। একদিকে, ব্যাংক কর্মকর্তাদের কাজের কোন স্বাধীনতা ছিল না, অন্যদিকে নতুন আমানত আসাও বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাংকে স্টাফ নিয়োগ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। নগরির বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর লোভনীয় এবং নিরাপদ চাকরি ছেড়ে কেউ প্রত্যন্ত এলাকার এ অনিশ্চয়তার মধ্যে আসতে চাইত না। ফলে, শিগগিরই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল এ মহতী উদ্যোগ। কিন্তু পাকিস্তানে যখন এ উদ্যোগের সমাপ্তি ঘটে ঠিক তখনই নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হলো মিশরে।'[১২৬]

১৯৬৩ সালের ২৫ জুলাই মিশরের সুপরিচিত ব্যাংকার আল-নাজ্জার, প্রথমবারের মত মিট-গামার প্রদেশে মিট-গামার ইসলামিক সেভিংস ব্যাংক (এমজিআইএসবি) প্রতিষ্ঠা করেন। আল-নাজ্জার পরবর্তীতে ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর ইসলামিক ব্যাংক-এর মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছিলেন। একটা উন্নয়নশীল মুসলিম দেশের গ্রামীণ পরিবেশে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জার্মান সেভিংস ব্যাংকের মডেল গ্রহণ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল শারি'আহ আইন লঙ্ঘন না করে মিশরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের কাছে অলস পড়ে থাকা অর্থ সংগ্রহ এবং ঐ সঞ্চয়ের জন্য তাদের হালাল মুনাফা প্রদান করা। আল-নাজ্জার ছিলেন অভিজ্ঞ পেশাজীবী, কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার বদৌলতে কিছু ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাও তার ছিল। তিনি আগ্রহী মুসলিমদের মধ্য থেকে সতর্কতার সঙ্গে কর্মচারী বাছাই করে ব্যাংকটি পরিচালনা শুরু করেন। 'ব্যাংকের কর্মকর্তারা অল্প সময়ের মধ্যে রক্ষণশীল দেশটির জনগণের আস্থা অর্জনে সামর্থ্য হয়। এসব কর্মচারী তাদের সম্ভাব্য গ্রাহকদের সঙ্গে এক কাতারে শামিল হয়ে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করতেন। এলাকার কৃষকরা বহিরাগতদের ব্যাপারে ছিল সন্দিহান এবং তাদের খুব কম সংখ্যকই বাণিজ্যিক ব্যাংকে লেনদেন করত। সেগুলোকে তারা পশ্চিমাপন্থী মিশরীয়দের স্বার্থ রক্ষাকারী

১২৫. ডব্লিউ. এস. ট্রাউট, *Arab and Islamic Banks*(প্যারিস : ওইসিডি, ১৯৮৩), পৃ. ৬২; পি.আর. উইলসন, Banking and Finance in the Arab Middle East(সারে : ম্যাকমিলান, ১৯৮৩), পৃ. ৭৪

১২৬. পি.আর. উইলসন, *Banking and Finance in the Arab Middle East*(সারে : ম্যাকমিলান, ১৯৮৩), পৃ. ৭৫

ভিনদেশী প্রতিষ্ঠান বলে মনে করত। কিন্তু এ নতুন ব্যাংকের কর্মচারীরা অন্যরকম। এরা শিক্ষিত হলেও কৃষকদের মত একই দৃষ্টিভঙ্গী ও নৈতিক মূল্যবোধ পোষণ করে।'[১২৭]

ব্যাংকটার প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপক আল-নাজ্জার-এর মতে, ব্যাংকটির কার্যক্রম ছিল তিন ধরনের– প্রথমত: পুঁজির চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে একটা দক্ষ সঞ্চালকের ভূমিকা পালন; দ্বিতীয়ত: অর্থনৈতিক দক্ষতা, সঞ্চয় শিক্ষা ও ব্যাংকিং অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা; এবং তৃতীয়ত: মজুতদারি ও পুঁজি গঠনের সমস্যা কমিয়ে আনা ও বিনিয়োগের জন্য অলস পুঁজির সমাবেশ ঘটাতে একটা গতিশীল চালক সৃষ্টি করা।[১২৮]

পি.আর. উইলসন উল্লেখ করেন যে, 'গৃহ নির্মাণ ও সংস্কার, হস্তশিল্পের জন্য সাধারণ মেশিনারি যেমন– কাপড় বোনার জন্য হস্তচালিত তাঁত বা সেলাই মেশিন কেনাসহ বহু ধরনের কাজে ব্যাংকটা ঋণ দিত। খামারের গবাদি পশু কেনা এবং সেচ ব্যবস্থার মৌলিক উন্নতির জন্য ঋণ দেয়া হত। বিশেষ করে, কৃষিভিত্তিক ঐ এলাকার জন্য পানির সুব্যবস্থা করা ছিল জরুরি।'[১২৯] এমজিআইএসবি দ্রুত অগ্রগতির পথে ধাবিত হয় এবং সাড়ে তিন বছরের মধ্যে আমানতকারীর সংখ্যা ২ লাখ ৫১ হাজার ছাড়িয়ে যায়। প্রত্যাশার চেয়ে অনেক উচ্চ হারে সঞ্চয় বাড়তে থাকে। সামগ্রিকভাবে মিশরীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট আমানতের সঙ্গে, একই সময়ের জন্য বর্তমান ও স্থির মূল্যে এমজিআইএসবি'র প্রবৃদ্ধি তুলনা করা হয়েছে। ছক-খ, গ, এবং ঘ-এ আমানতকারীর সংখ্যা, সঞ্চয়ের গড় আকার, শাখার সংখ্যা এবং সঞ্চয়কারীদের ধরন, কারা ইসলামি ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন করত, তা দেখানো হল :

ছক-ক : ১৯৬৪-১৯৬৭ মেয়াদে ইবিএস এবং মিট-গামার ইসলামিক সেভিংস ব্যাংকের মোট আমানতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ–[১৩০]

বর্তমান মূল্য

সাল	ইবিএসএর টিএলডি %	সূচক %	প্রবৃদ্ধি	এমজিআইএসবি'র টিএলডি %	সূচক %	প্রবৃদ্ধি
১৯৬৪	৩,৭৮,০০০,০০০	১০০	-	৪০,৯৪৪	১০০	-
১৯৬৫	৩,৯৬,০০০,০০০	১০৫	৫	১,৯১,২৩৫	৪৬৭	৩৬৭
১৯৬৬	৪,১৫,০০০,০০০	১১০	৫	৮,৭৯,৫৭০	২১৪৮	৩৬০
১৯৬৭	৪,৪৫,০০০,০০০	১১৮	৭	১৮,২৮,৩৭৫	৪৪৬৬	১০৮
	গড়	৬			২৭৮	
স্থির মূল্য						
১৯৬৪	৩,৬৪,৫১৩,০১০	১০০	-	৩৯,৪৮৩	১০০	-
১৯৬৫	৩,৩২,২১৪,৭৬০	৯১	-৯	১,৬০,৪৩২	৪০৬	৩০৬
১৯৬৬	৩,১৯,৭২২,৬৫০	৮৮	-৪	৬,৭৭,৬৩৫	১৭১৬	৩২২
১৯৬৭	৩,৪০,৪৭৪,৩৬০	৯৩	৭	১৩,৯৮,৯১০	৩৫৪৩	১০৬
	গড়	-২			২৪৫	

---

১২৭. পি.আর. উইলসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১২৮. এ. আল-নাজ্জার, *Al-Madkhal li al-Nadhariah al-iqtisadia fil-Manhaj al-Islami (Introduction to the Economy Theory within the Islamic Methodology*(কায়রো : দারুল ফিকর, ১৯৭৪), পৃ. ২৪৬-২৪৭

১২৯. পি.আর. উইলসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১৩০. এ. আল-নাজ্জার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

ছক-খ : মিট-গামার ইসলামিক সেভিংস ব্যাংকের আমানতকারীর সংখ্যা এবং তাদের গড় আমানত–[১৩১]

বছর	আমানতকারীর সংখ্যা	প্রবৃদ্ধি %	সঞ্চয়কারী প্রতি গড় আমানত	প্রবৃদ্ধি %
১৯৬৪	১৭,৫৬০	-	২.৩৩	-
১৯৬৫	৩০,৪০৪	৭৩	৬.২৯	১৭০
১৯৬৬	১৫১,৯৯৮	৪০০	৫.৭৯	-১
১৯৬৭	২৫১,১৫২	৬৫	৭.২৮	২৬

ছক-গ : ১৯৬৩-১৯৬৭ সালের মধ্যে মিট-গামার ইসলামিক সেভিংস ব্যাংকের শাখা সংখ্যা–[১৩২]

ক্রমিক নং	শাখার নাম	খোলার তারিখ
১	মিট গামার	০৫.০৭.১৯৬৩
২	শারবিনি	১৪.০৮.১৯৬৫
৩	আল মানসুরা	১১.০৯.১৯৬৫
৪	দাকিরুয়াস	০৯.১০.১৯৬৫
৫	কাসর আল আইনি	১৪.১০.১৯৬৫
৬	জেফতি	০৯.০২.১৯৬৬
৭	আল মাহাল্লাহ	২৪.০৭.১৯৬৬
৮	মিশর আল-জাদিদাহ	২৩.০৭.১৯৬৬
৯	বেলকা	০১.১০.১৯৬৬

ছক-ঘ : এমজিআইএসবি'তে বিভিন্ন সঞ্চয়কারী গ্রুপের মোট আমানতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের শতকার হার–[১৩৩]

আমানতকারী	সঞ্চয় আমানত	বিনিয়োগ আমানত
ছাত্র	৫৩.৫	৩৮.০
শ্রমিক	১৪.০	১২.০
পেনশনভোগী	২.৩	১২.৮
সরকারি কর্মচারী	০.২	২২.০
গৃহিনী	৫.১	৬.৪
কৃষক	১০.৯	১৫.৯
ব্যবসায়ী	২.০	২.৪
অন্যান্য	২.০	২.০

---

১৩১. এ. আল-নাজ্জার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১
১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
১৩৩. প্রাগুক্ত।

প্রাপ্ত স্বল্প তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো ছকগুলোর তুলনামুলক বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ পরীক্ষাটা বেশ সফলতার প্রমাণ বহন করে এবং সঞ্চয় সমাবেশ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী, কৃষক ও গ্রামবাসীর সমর্থন লাভে সফল হয় এ ব্যাংক। তারা ব্যাংকটা নিজেদের বলে মনে করতে শুরু করে বলে রেডি, আল–নাজ্জার, হারভে, ট্রাউট এবং ইউলসন আলোচনায় উল্লেখ করেছেন।[১৩৪] আল-নাজ্জার মন্তব্য করেন, 'ব্যাংকটি কার্যক্রম শুরু করার স্বল্প সময়ের মধ্যে এটা স্থানীয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সেবা দিতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে, মিট-গামার ও এর ৫৩টা গ্রামে ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠা ও এর উন্নয়ন এবং বেকার শ্রমিকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এ ব্যাংক।'[১৩৫]

এ ব্যাংক এতটাই সফল হয়েছিল যে, এতদিনে তা গোটা মিশর তার আওতায় নিয়ে আসতে পারত। কিন্তু, নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজনীতির কারণে ব্যাংকটা শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্যাংকটা যখন বন্ধ হয়ে যায়। তখন এ ব্যাংক ও এর শাখাগুলোর কার্যক্রম ছিল এমন এলাকায় গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততার সমস্যা ব্যাপকভাবে কমে এসেছিল। গুটিকতেক স্থানীয় সুদখোর মহাজনের কাছে ঋণের জন্য ধর্ণা দিতে হত না মানুষকে। তারা অনৈসলামি ব্যাংকগুলোর কাছে যেতে পারত না। কারণ তাদেরকে 'ব্যাংক বহির্ভুত শ্রেণি' হিসেবে বিবেচনা করা হত। আবার, এসব ব্যাংক যেহেতু ইসলামে হারাম সুদ নিয়ে কারবার করত, গ্রামের ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ সেখানে যেতে চাইত না।

আল-নাজ্জার উল্লেখ করেছেন যে, বিস্ময়কর না হলেও কথাটা স্ববিরোধী মনে হবে, ব্যাংকটার জন্য সমস্যা তৈরি করা না হলে এটা সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল। যখনই ব্যাংকটা স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজের সফলতা স্পষ্ট করে তুলতে শুরু করল, স্থানীয় সামাজিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শুরু হলো সংঘাত। তারা ভাবল, তাদের কর্তৃত্বাধীন এলাকায় এ প্রতিষ্ঠানটা নাক গলাচ্ছে। তারা মনে করল, ব্যাংকটি তাদের কাজগুলোই অহেতুক নকল করছে। ইতোমধ্যে ব্যাংকটি অধিকতর স্পষ্টভাবে ইসলামি বিশ্বাস ও চর্চার ভিত্তিতে একটা নতুন ব্যাংকিং ধারণা প্রবর্তন করে মুসলিম গ্রাহকদের মাঝে সাড়া ফেলতে সক্ষম হয় এবং সঞ্চয় ও সঞ্চয়কারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। অনেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে তাদের সঞ্চয় তুলে ইসলামি ব্যাংকে রাখতে শুরু করেন। তা প্রচলিত ব্যাংকগুলোকে অপরিহার্যভাবে এ নতুন জনপ্রিয় ও দ্রুত বিকাশমান প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে দেয়। ক্ষুদ্র দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকের কর্মকাণ্ড ও তৎপরতাকে বিদ্যমান বিভিন্ন সামাজিক কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কিছু কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে করা হয়। তাই একে স্থবির করে দেয়া হয়।[১৩৬]

---

১৩৪. আর. রেডি, *The EgyptianMunicipal Saving Banks Projects*(ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ভলিউম-৯, জুন ১৯৬৭), পৃ. ২-৫; এ. আল-নাজ্জার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২; এন. হার্ভে, *World Islamic Finance Based on Community Banks*(রিয়াদ : সাউদি বিজনেস, ১৯৮১), পৃ. ৬; ডব্লিউ. এস. ট্রাউট, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২; পি.আর. উইলসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

১৩৫. এ. আল-নাজ্জার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০-২৩২

এরপরও, ঝুঁকিপূর্ণ এ উদ্যোগ আধুনিক ইসলামি ব্যাংকিং এর বীজ বপন করে এবং পরবর্তী উদ্যোগ গ্রহণের পথ দেখিয়ে দেয়। কিছুকালের মধ্যেই মিট-গামার ইসলামি সেভিংস ব্যাংকের দেখানো পথে আরো উন্নত প্রক্রিয়ায় অনেক ইসলামি সামাজিক, উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসা শুরু করে। এগুলোর মধ্যে প্রথম ১৯৭১ সালে মিশরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাসের সোশ্যাল ব্যাংক। প্রথমে তা 'মুনাফা' লাভের লক্ষ্য না নিয়ে 'ব্যাংকিং আওতা বহির্ভুত' স্বল্পআয়ের লোকজনকে সেবা দানের জন্য 'সামাজিক ব্যাংক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৭৫ সালে সাউদি আরবের জেদ্দায় প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আন্তসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান–ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি)। সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন জোরদার করা এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য। একই বছর দুবাইয়ে (ইউএই) প্রতিষ্ঠিত হয় দুবাই ইসলামিক ব্যাংক। এগুলো ছিল প্রথম বড় আকারের ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এগুলোর সফলতার পথ ধরে বিভিন্ন দেশে বহু সংখ্যক ইসলামি ব্যাংক গড়ে উঠে।

মিট-গামার সেভিংস ব্যাংক-এর প্রায় একই সময়ে একই রকম আরেকটি সফল পরীক্ষা ছিল মালয়েশিয়ার 'তাবুং হাজি' বা 'পিলগ্রিম ফান্ড কর্পোরেশন'। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করে। এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ–

- মালয় মুসলিমরা যাতে হজ্জ সম্পাদন বা অন্যান্য লাভজনক উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।
- হজের সময় বিভিন্ন সুবিধা ও সেবা দানের মাধ্যমে হাজিদের কল্যাণ ও তাদের স্বার্থ রক্ষা ও নিশ্চিত করা।
- সঞ্চয়ের মাধ্যমে ইসলাম অনুমোদিত বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে মালয় মুসলিমদের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

এসব উদেশ্য সামনে রেখে সে সময় থেকে সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে 'তাবুং হাজি'। এ প্রতিষ্ঠান হজ্জের পূর্বে ও পরে হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সব রকম সেবা মানসম্পন্নভাবে প্রদান করে আসছে। ১৯৫৯ সালে রয়্যাল প্রফেসর উংকু আজিজ 'সম্ভাব্য হজ্জযাত্রীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' বিষয়ে একটি কার্যপত্রে এ ধারণা প্রথম তুলে ধরেন।[১৩৭] ১৯৬৩ সালে মাত্র ১,২৮১ জন সদস্যের কাছ থেকে ৪৬,৬০০ মালয়েশিয়ান রিঙ্গিট আমানত নিয়ে কার্যক্রম শুরু করা আধা-সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটার সদস্য সংখ্যা তথা হিসাবধারী এখন প্রায় ৪০ লাখের উপরে এবং এর সঞ্চয় ২০০ কোটি মার্কিন ডলারের উপরে। মালয়েশিয়ার মুসলিম সংখ্যা যেখানে ১ কোটি ২০ লাখ, সেখানে উপরোক্ত সংখ্যা থেকে বুঝা যায় প্রতিষ্ঠানটি কতটা জনপ্রিয়।[১৩৮]

সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর বিকল্প আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে 'তাবুং হাজি'। এটা মালয়েশিয়ান মুসলিমদের হালাল উপায়ে বিনিয়োগের সুযোগ করে দিচ্ছে। যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক মালয়েশিয়ান মুসলিম ১০ রিঙ্গিট এবং শিশু হলে ২ রিঙ্গিট কিস্তি দিয়ে এখানে হিসাব খুলতে

১৩৭. তাবুং হাজি (ওয়েবসাইট) : http://www.tabungahaji.gov.my, visited on 15.08.2017
১৩৮. কে. রহমান, Towards Islamic Banking: A Case Study of Pilgrims Managemant & Fund Board, Malaysia, দ্র. ওয়েবসাইট : http://www.eldis.org/fulltext/rahman.pdf, visited on 20.08.02017

পারেন। এর ১১১টিরও বেশি শাখা রয়েছে। এছাড়াও পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান এবং বেতন থেকে কিস্তি কেটে নেয়ার বিষয়টি এখানে রয়েছে। কেউ সঞ্চয় তুলে নিতে চাইলে যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মত তাও সহজ উপায়ে করা যায়। 'তাবুং হাজি'-এর হিসাবধারীদের জন্য বাড়তি সুবিধা হলো, হজ্জের সময় একটা বিশেষ উত্তোলন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সাউদি আরবে বসেই তারা নিজ নিজ হিসাব থেকে অর্থ তুলতে পারেন। সংগৃহীত অর্থ শারি'আহ নির্দেশিত পথে এবং প্রবল সম্ভাবনাময় সুনির্দিষ্ট প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগ করা হয়। বর্তমানে এর বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ৪০০ কোটি মার্কিন ডলারের মত। এতে রয়েছে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। ইক্যুইটি বিনিয়োগ, ইউনিট ট্রাস্ট বিনিয়োগ, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ, আবাসন খাতে বিনিয়োগ ছাড়াও ১২টি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে প্রতিষ্ঠানটির বিনিয়োগ রয়েছে। এসব সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কৃষি, বৃক্ষরোপন বা রিয়েল এস্টেট ব্যবসা থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসায় নিয়োজিত। ১৯৯৫ সাল থেকে 'তাবুং হাজি'কে কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। বর্তমানে মালয়েশিয়ার বাইরেও এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে।

জেনারেল কাউন্সিল অফ ইসলামিক ব্যাংক এন্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট (জিসিআইবিএফআই, ২০০১)-এর মতে ইরান, পাকিস্তান ও সুদানের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামিকরণ করা ছাড়াও সারা বিশ্বে ২৭০টির বেশি ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এগুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি মার্কিন ডলালের উপরে। ২০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের উপরে রয়েছে আমানত এবং বিনিয়োগ রয়েছে ১৬ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের উপরে। ১৯৭০ এর দশকের শেষ এবং ১৯৮০ এর দশকের গোড়ার দিকে মিশর, কুয়েত, জর্ডান, বাহরাইন, কাতার, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, সেনেগাল, তিউনিস, তুরস্ক, আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে অধিকাংশ ইসলামি ব্যাংকের যাত্রা শুরু।[১৩৯] বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা এবং অনৈসলামি পরিবেশে কাজ করেও যাত্রা শুরুর প্রথম বছর থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সঞ্চয় সংগ্রহ, জাতীয় বাজারের একটি বড় অংশ দখল এবং বড় আকারের লাভ করতে থাকে। বর্তমানে সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, ইংল্যান্ডসহ পশ্চিমা অনেক দেশে ইসলামি ব্যাংক ও ইসলামি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম চালাচ্ছে। শুধু তাই নয় এ দ্রুত বিকাশমান খাতে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সিটিব্যাংক, এইচএসবিসিসহ অন্যান্য বড় বড় অনৈসলামি ব্যাংক 'ইসলামিক ব্যাংকিং শাখা' চালু করেছে।

পৃথিবীর অনেক জায়গায় আরো অনেক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন, তাকাফুল কোম্পানি নামে বীমা কোম্পানি এবং অন্যান্য বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো, শোষণধর্মী পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার একটি বিকল্প ও সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ধারণা তুলে ধরা, রিবার কারণে সুদভিত্তিক ব্যাংকের সাথে লেনদেনে অনিচ্ছুক ধর্মভীরু মুসলিমদের কাছে পড়ে থাকা অলস সম্পদ একত্রিত করা। এ ব্যাপারে তারবুশ উল্লেখ করেছেন, 'এ উদ্দেশ্য অর্জনে তাদের স্পষ্টত কোন সমস্যা ছিল না। বলা হয় যে জনগণের জন্য খুলে দেয়ার প্রথম দিনেই কুয়েত ফিন্যান্স হাউস (কুয়েতের ইসলামি ব্যাংক) ১৪ কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ৫ কোটি কুয়েতি দিনার আমানত লাভ করে। যা বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক

১৩৯. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*(Dhaka : IERB, November 2008), pp. 47-48

থেকে এ ব্যাংকে স্থানান্তরিত করা হয়।'[১৪০] বর্তমান কয়েকটি ইসলামি ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, এর অনেকগুলোই এমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছে যা তাদেরকে আরব অঞ্চলের শীর্ষ ১০০ ব্যাংকের তালিকায় স্থান দিয়েছে। ইসলামি ব্যাংকগুলো ক্রমেই আরো উন্নতি করছে।

ছক-৬ : শীর্ষ ১০০ আরব ব্যাংকের মধ্যে স্থান পাওয়া কয়েকটি ইসলামি ব্যাংকের অবস্থান নিম্নরূপ

বছর	**ব্যাংকগুলো নাম ও অবস্থান**						
	কেএফএইচ	এফআইবিই	কিউআইবি	ডিআইবি	জেআইবি	এসবিবি	আরবিআইসি
১৯৮০	৯৪	-	-	-	-	-	-
১৯৮১	৬৮	-	-	-	-	-	-
১৯৮২	৫১	৭৭	-	-	-	-	-
১৯৮৩	৪২	৬৬	-	-	-	-	-
১৯৮৪	৩৪	৪৭	-	-	-	-	-
১৯৮৫	৩৯	৪৫	-	৯৭	-	-	-
১৯৮৬	৩৬	৪৩	-	৮৭	৮৭	-	-
১৯৮৭	২৮	৪৮	-	৯৩	৮৫	-	-
২০০০	২৪	৯০	৯১	৪৮	৯৬	৫৮	-
২০০১	২১	৯৫	৮৬	৪৮	৯৭	৫৪	-
২০০৪	২১	-	৯০	৩৮	-	৫৮	৬

ভি. নিয়েনহাউস উল্লেখ করেছেন, 'দেখা যায়, তুলনামূলক স্বল্প সময়ের মধ্যে এসব ইসলামি ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্মানজনক আকারে পৌঁছে গেছে।'[১৪১] এগুলোর কয়েকটি যেমন, কেএফএইচ, এফআইবি, জেআইবি এবং এসবিবি। সঞ্চয় সংগ্রহ ক্ষেত্রে বাজার শেয়ার-এর প্রবৃদ্ধি কিছুটা ধীর হয়ে আসলেও নিজ নিজ দেশের শীর্ষ সাত-এর তালিকায় রয়েছে এসব ব্যাংক। এগুলোর তহবিলে বরাদ্দের পরিমাণও লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

মুসলিম সাম্রাজ্যে ব্যাংকিং :

হোমুদ-এর মতে, 'রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ইসলাম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যুগটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ সময়টি ছিল মানুষের জানা ইতিহাসের সবচেয়ে দুনীতিপূর্ণ এবং অস্থিতিশীল একটা অধ্যায়। ইসলামের আগমন জীবনের উপর থেকে অন্ধকার দূর করে এবং ইসলামের ছায়াতলে আসা এলাকায় সৃষ্টি হয় নিরাপদ ও স্থিতিশীল পরিবেশ।'[১৪২] ইসলামের উত্থান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও বিচারিকসহ সকল ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন আনয়ন করে এবং এক নতুন সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। যার ভিত্তি ছিল আল্লাহ ও তার নির্দেশের (Shari'ah) প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন।

১৪০. এম. তারবুশ, *The Tide of Islamic Banking*, (টোকিও : ফিনান্সিয়াল টাইমস, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১), পৃ. ৬

১৪১. ভি. নিয়েনহাউস, C. Melat সম্পাদিত *Islamic Law and Finance : The Perfomance of Islamic Banks: Trends and Cases*(লন্ডন : এসওএএস, ১৯৮৮), পৃ. ৯০

১৪২. এস.এইচ. হোমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

উইলসন বিশ্বের ইতিহাসে ইসলামের প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, 'সপ্তম শতকে আরব মুসলিম জনগণের আকস্মিক উত্থান ছিল ইতিহাসের এক অনন্য ঘটনা। কিছু স্থায়ী বসতি, কিছু যাযাবর, বাণিজ্য ও নিতান্ত সাধারণ মানের কৃষি কাজ করে জীবন ধারণকারী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু গোত্রের সম্মিলন, তিন প্রজন্মের মধ্যে নিজেদেরকে একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করে। ভূমধ্যসাগরের গোটা দক্ষিণভাগ এবং আফগানিস্তান থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তারা আধিপত্য বিস্তার করে বিচিত্র বিশ্বাস ও ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে অভিন্ন ধর্ম, অভিন্ন ভাষা ও অভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে উঠা একটা সমাজে তারা ঐক্যবদ্ধ করতে সফল হয়।'[১৪৩] লেইবার আরো বলেন, 'খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের পর থেকে মুসলিমরা দীর্ঘ যাত্রার ব্যবসা এবং আন্তর্জাতিক প্রসার ঘটাতে এতটাই সফল হন যে, তা আগের জানা সব কিছুকে অতিক্রম করে যায়। এটা সম্ভবত এ কারণে হয়েছিল যে, ইসলাম এমন এক মহান ধর্ম, যেখানে ব্যবসায়ীদের সমাজের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।'[১৪৪] তখন কোন ব্যবসায়ী যদি সততা, ন্যায্যতা এবং জনকল্যাণে কাজ করে, তাহলে জান্নাতে তাকে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তাই, অনেক বড় বড় মনীষী জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে ব্যবসা করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেছেন।[১৪৫]

লেইবার দেখান যে, 'প্রতিবছর সারা বিশ্ব থেকে হজ্জ ও অন্যান্য উপলক্ষ্যে আরবে মানুষের সমবেত হওয়ার যে প্রথা, বিশেষ করে সে কারণে মুসলিমদের মাঝে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সাউদি আরবে আসা অনেক মুসলিম তাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পালনের পাশাপাশি নিজ দেশে উৎপাদিত পণ্য, যাতায়াত পথের বিভিন্নস্থানে কেনাবেচা করতেন। তারা দেশে ফেরার সময় ভালো অংকের মুনাফার আশায় বিদেশি পণ্য নিয়ে যেতেন।'[১৪৬] ব্যবসা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকিং কার্যক্রমেরও বিকাশ ঘটে। ফলে সাউদি আরবে ঋণ দেয়া, ধার নেয়া, হস্তান্তর, নিশ্চয়তা প্রদান, নিরাপত্তা দান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে চালু হয়। ডি. রুভার এক বক্তব্যে বলেছিলেন, 'ব্যাংক না থাকলে কোথাও ব্যাংকিং হতে পারে না।'[১৪৭] এর পরিপ্রেক্ষিতে উদোভিচ যুক্তি দেন, 'মধ্যযুগের ইউরোপের ক্ষেত্রে এ কথা ঠিক। কিন্তু, মধ্যযুগের মুসলিম বিশ্বের ক্ষেত্রে এ কথা একেবারেই সঠিক নয়। মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্য এবং বহু প্রামাণ্য দলিলের তথ্যে ব্যাংকারদের দেখতে পাওয়া যায়। তবে ব্যাপক ও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রমের দেখা পেলেও কোন ব্যাংকের দেখা পাওয়া যায় না। এর অর্থ, পুরোপুরি না হলেও অর্থ নিয়ে প্রধান কারবার ছিল এমন কোন স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা যায় না।[১৪৮]

---

১৪৩. পি.আর. উইলসন, *The Empire of the Prophet: Islam and the tide of Arab Conquest, in* ডি ট্যালবট সম্পাদিত *The Dark Ages*(লন্ডন : থমাস এন্ড হাডসন, ১৯৫০), পৃ. ৫৩

১৪৪. এ.ই. লেইবার, *Eastern Business Practices and Medieval European Commerce*, (লন্ডন : ইকনমিক হিস্ট্রি রিভিউ কমিটি, ভলিউম-২১, ১৯৬৮), পৃ. ২৩০

১৪৫. A.G. Waite, *Les marchands d'Epices sous les Sultans Mamloucks, Cahiers d'histoire d'Egypt*(Paris : Annuaires de l'École pratique des hautes études, 1955), PP. 81-89

১৪৬. এ.ই. লেইবার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

১৪৭. R.D. Ruver, "*New Interpretation of the History of Banking*" in Journal of World Historyt(Hawai : University of Hawai Press, Vol. II, 1954), p. 43

১৪৮. এ. উদোভিচ, *Bankers Without Banks : Commerce, Banking and Soceity in the islamic World of the middle-ages*, দ্যা ডন অব মডার্ন ব্যাংকিং সম্পাদিত, সেন্টার ফর মেডিয়াভেল এন্ড রেনেসাঁ স্টাডিজ, (লস এঞ্জেলস : ইউনিভার্সিটি অব কলাম্বিয়া, ১৯৭৯), পৃ. ২৫৫

তবে, মনীষীগণ তাদের ইতিহাস রচনায় দেখান যে, সে সময় ব্যাংকারদের সারাফিন বা সায়ারিফাহ বা জাহাবিধাহ এবং ব্যাংককে দাওয়াউইন আল-জাহাবিধাহ বলা হত।[১৪৯]

অষ্টম শতকের শেষ দিক থেকে আর্থিক হিসাব-নিকাশ করেন এমন ব্যক্তিকে বুঝাতে জাহবাধ; যার বহুবচনে জাহাবিধাহ শব্দটা ব্যবহৃত হতো। আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে সুপরিচিত সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত মার্চেন্ট ব্যাংকারদেরও ছিল এ উপাধি। এরা ছিলেন মুদ্রা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, মুদ্রার নিপুন পরীক্ষক, রাজস্ব গ্রহণকারী, সরকারি কোষাধ্যক্ষ, মুদ্রা বিনিময়কারী ও সংগ্রাহক। ৯১৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে, রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় দিওয়ান আল-জাহবিধাহ যার বহুবচন দাওয়াউইন আল-জাবিদাহ। প্রধান প্রধান বাণিজ্য শহরগুলোতে এর শাখা ছিল। কোন রকম সুদি লেনদেন ছাড়াই এখানে আধুনিক ব্যাংকিং-এর প্রায় সব কাজ সম্পাদিত হত। খলিফা আল-মুকতাদির (৯৮০-১০৩২ খ্রিস্টাব্দ)-এর সময় আল-জাবদাহ'র ভূমিকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এবং তিনি একজন আধুনিক ব্যাংকার হিসেবে আবির্ভূত হন যে, তাকে আমানত ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালনের বাইরেও সাক (চেক) ও বিশেষ করে সাফতাজাহ (বিল অব এক্সচেঞ্জ) এর মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে তহবিল পাঠানোর কাজ করতে হত। তাকে খলিফা, উজিরসহ দরবারের অন্যান্য কর্মকর্তাকে বিপুল পরিমাণে ঋণ মঞ্জুর করতে হত।[১৫০] মেতওয়াল্লি ও সাহাতা-এর মতে, প্রধান জাবদাহ বা দিওয়ান আল-জাবিদা'হর প্রশাসককে সকল আয়-ব্যয়ের মাসিক ও বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হত। একে বলা হত আল-খাতমাহ (আর্থিক বিবরণী বা ব্যালেন্স শিট)।[১৫১] ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়, অনেক জাহাবিদাহ ছিলেন খ্রিস্টান কিংবা ইহুদি। যদিও তাদের মর্যাদা ছিল যিম্মি তথা মুসলিম সমাজে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক হিসেবে। ঐতিহাসিক সূত্রগুলো থেকে জাহাবিদাহ'র যে তালিকা পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে ছিলেন– ইবরাহিম বিন ইউহান্না, জাকারিয়া

---

১৪৯. এ. আল-কালকাশান্দি, *Subh al-A`Asha fi-Sinnat al-Insha*(কায়রো : দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯১৩), পৃ. ২০৮; আল-জাহশিয়ারি, *Kitab al-wuzara` wa al-kuttub, দি বুক অব মিনিস্টারস এন্ড রাইটার্স*(কায়রো : দারুল ফিকরিল হাদিস, ১৯৩৮), পৃ. ২০৫; সি. পেটাল এবং জে. শাহাস্ট, *Encyclopedia of Islam*(লন্ডন : এল. লুজাক, ১৯৬৫), পৃ. ২৩৩; হামাদান আল-কুবাইশি, *Aswaq Baghdad Hatta Nihayat al-asr al-buwaihi*, *বুয়াইহি যুগের শেষ অবধি বাগদাদের বাজার*(বাগদাদ : দারুল হুররিয়াহ, ১৯৭৯), পৃ. ৯৮; এ. মিতওয়ালি এবং এস. শাহাতা, *Iqtisadiat-al-Uqud fi Itar al-Fikr al-Islami, ইসলামি চিন্তাধারায় অর্থের অর্থনীতি*(কায়রো : Dar AL-Tawfiq al-Namud Hajiyah Littiba'a wal-Jam-e Al-Ali, ১৯৮৩), পৃ. ১০৯; আমাল আল-সা'দি, *al-Sayrafah wal-jahbadhah fi al-Iraq*, *ইরাকে মুদ্রা বিনিময় ও ব্যাংকিং*(বাগদাদ : পি.এইচডি থিসিস, বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫), পৃ.১৫৫; আব্দুল আজিজ আল-দুরি, *Tarikh al-Iqtisadi lil-Iraq*, *ইরাকের অর্থনৈতিক ইতিহাস*(বাগদাদ : মাতবা আল-মাআরিফ, ১৯৮৬), পৃ.১২৭; ডব্লিউ. জে. ফিশেল, *Djahbadh এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম*(লেইডেন : ব্রিল, ভলিউম-২, ১৯৯২), পৃ.২৫৫; খালেদ আল-হামাদানি, *al-Nizam al-Masrafi fi al-dawlah al-Islamiyah, ইসলামি রাষ্ট্রে ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, (তেহরান : ইসলামিয়াত আল-মারিফা, উইন্টার, ২০০০), পৃ. ২৮৭; এম.ইউ. চাপরা, এবং এইচ. আহমেদ, *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*, (জেদ্দা : অকেশনাল পেপার নং-৬, আইআরটিআই, আইডিবি, ২০০২), পৃ. ৯৪

১৫০. এ. আল-কালকাশান্দি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯; আল-জাহশিয়ারি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬; সি. পেটাল এবং জে. শাহাস্ট, *Encyclopedia of Islam*(লন্ডন : এল. লুজাক, ১৯৬৫), পৃ. ৫২৩; এ. মিতওয়ালি এবং এস. শাহাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১৫১. এ. মিতওয়ালি এবং এস. শাহাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৭

বিন ইউহান্না, সুলাইমান বিন ওয়াহাব, ইবরাহিম বিন আহমাদ, ইসরাইল বিন সালিহ এবং সর্বোপরি বাগদাদের দুজন ইহুদি বণিক ও ব্যবসায়ী। ইউসুফ বিন ফিনকাস ও হারুন বিন ইমরান। শেষের দু'জনকে পারস্যের আহওয়াজ প্রদেশের জাবদাহ দফতরে নিয়োগ দেয়া হয়। পরে তারা খলিফা আল-মুকতাদির-এর জাবিদাত আল-হাদরাহ (ব্যাংকার পরিষদ) ও উজির নিযুক্ত হন।[১৫২] এম. উমর চাপরা ও টি.খান এবং এম. উমর চাপরা ও আহমাদ লিখেছেন, ইসলামের ইতিহাসের একেবারে শুরু থেকেই মুসলিমগণ, উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা ও ভোক্তার প্রয়োজন পূরণের জন্য সম্পদ সমাবেশের একটি আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এ ব্যবস্থা ছিল সুদবিহীন। এটা ছিল প্রধানত মুদারাবা (পরোক্ষ অংশীদারিত্ব) এবং মুশারাকা (প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্ব)-এর মত লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে। এসব ব্যাংকার, মুদ্রার যথার্থতা এবং কতটুকু খাঁটি তা মূল্যায়ন করতেন। তখন মূল্যবান ধাতু দিয়ে মুদ্রা তৈরি করা হত বিধায় এ কাজটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা লেনদেনের সময় বারবার গুণে দেখার ঝক্কি-ঝামেলা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে, নির্দিষ্ট সংখ্যক মুদ্রা নির্দিষ্ট মাপের থলেতে রাখতেন। তারা বস্তুগত পরিবহণ ছাড়াই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তহবিল স্থানান্তর করতেন। এতে কেবল নিরাপত্তাই নিশ্চিত হত না, পরিশোধ ব্যবস্থাও সুন্দরভাবে কাজ করত।[১৫৩] আল-জাহাবিদাহ রাষ্ট্রকে আগাম ঋণ দিত। সরকারের কর রাজস্বের মাধ্যমে এ ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল। আল-জাহাবিদাহ এ রাজস্ব সংগ্রহ করত। তারা কর রাজস্ব সংগ্রহের পর তাদের মূল অর্থ এবং এর উপর বাড়তি কিছু ফেরত পেত। কিছু কিছু ইতিহাসবিদ একে সুদ বলে মনে করেন।[১৫৪] কিন্তু, যদি কর সংগ্রহ ও এর ব্যবস্থাপনার পিছনে প্রদত্ত পরিশ্রমের কথা বিবেচনা করা হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, মূলের উপর এ বাড়তি অর্থ কোন প্রকারেই সুদ ছিল না। এটা ছিল কর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ফি বা 'পারিতোষিক' এর মত। কারণ, একদিকে ইসলাম সুদ নির্ভর করে পরিমাণ ও মেয়াদের উপর। কিন্তু, সেবা প্রদানের বিনিময়ে 'পরিতোষিক' নেয়ার অনুমতি রয়েছে। উদোভিচ জোর দিয়ে বলেন– 'যদিও বণিক ও অন্যদের জন্য তাদের অর্থের একটি অংশ মার্চেন্ট ব্যাংকারদের কাছে সঞ্চয় রাখা বাধ্যতামূলক ছিল এবং মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো তাদের অর্থ বিভিন্ন পরিমাণে অন্যান্য মার্চেন্ট ব্যাংকের আমানত রাখত,

---

১৫২. এ্যাডাম মেজ, *The Renaissance of Islam*(লন্ডন : লুজ্যাক এন্ড কোং, ১৯৩৭), পৃ. ১১২; এস.ডি. গোইটইন, *A Mediterranean Society : The Jewish Community of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza*(ক্যালিফোর্নিয়া : ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৬৭), পৃ. ৯৬; এ. উদোভিচ, *Partnership and Profit in Medieval Islam*(নিউজার্সি : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭০), পৃ. ২১৬; এ, উদোভিচ, *Bankers Without Banks: Commerce, Banking and Soceity in the islamic World of the middle-ages*, দ্যা ডন অব মডার্ন ব্যাংকিং সম্পাদিত, সেন্টার ফর মেডিয়াভেল এন্ড রেনেসাঁ স্টাডিজ, (লস এঞ্জেলস : ইউনিভার্সিটি অব কলাম্বিয়া, ১৯৭৯), পৃ. ২৫৫; এ. আল সাঈদ, *Al-Muslimuna yunshiuna Awwal Masraf Fil-Alam, মুসলমানরাই বিশ্বের প্রথম ব্যাংক স্থাপনকারী*(কায়রো : আল-মাদিনাহ সংবাদপত্র, সংখ্যা-৬২১৪, ১৯৮৪), পৃ. ১৭

১৫৩. এম. উমর চাপরা, এবং টি. খান, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*(জেদ্দা : অকেশনাল পেপার নং-৩, আইআরটিআই, আইডিবি, ২০০০), পৃ. ১-৩); এম. উমর চাপরা ও এইচ. আহমেদ, *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*(জেদ্দা : অকেশনাল পেপার নং-৬. আইআরটিআই, আইডিবি, ২০০২), পৃ. ২-৬

১৫৪. সি. পেটাল এবং জে. শাহাস্ট, *Encyclopedia of Islam*(লন্ডন : এল. লুজাক, ১৯৬৫), পৃ. ৩৮৩

আমানতকারীকে কোন সুদ বা অন্যান্য ধরণের লাভ দেয়ার নজির নেই।'[১৫৫] এর কারণ, আল্লাহ রিবা (সুদ) নিষিদ্ধ করেছেন। আল-কুরআনে এ ব্যাপারে অনেক আয়াত রয়েছে। পাশাপাশি, সেখানে রিবা এড়ানো যায় এমন অনেক বিকল্প মুশারাকা, মুদারাবা, মুজারা'আ ইত্যাদি উল্লেখ রয়েছে।[১৫৬]

মধ্যযুগের শুরুতে ইসলামি শাসন, একটি অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগের ভিত্তি স্থাপনে বিশাল ভূমিকা পালন করে। তখন বাণিজ্য ও ব্যাংকিং খাতের খেলোয়াড়রা ছিলো আরব, পারসিয়ান, বার্বার (উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী), ইহুদি, খ্রিস্টান ও আর্মেনিয়ানরা। মুসলিম বণিকরা আন্দালুস থেকে চীন সাগরের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। পিরেনির মতে, 'বিশ্বব্যাপী তাদের বাণিজ্য সম্পর্কের কারণে, মুসলিমরা ভারত থেকে আখ, সিসিলি ও আফ্রিকা থেকে তুলা এবং সিসিলি ও স্পেন থেকে চাল আমদানি করত। তারা চীনাদের কাছ থেকে রেশম ও কাগজ তৈরি করতে শিখে এবং এ জ্ঞান মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র পৌঁছে দেয়।'[১৫৭]

লিয়েবার আরো লিখেন, 'ইতালি ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের বণিকরা ব্যবসার সুক্ষ্ম কৌশলগুলো ব্যবহারের প্রথম শিক্ষা, ভূ-মধ্যসাগরের অপর পাশে তাদের প্রতিপক্ষদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এদের বেশিরভাগ ছিল মুসলিম। ইহুদি ও খ্রিস্টানও কিছু ছিল। ইউরোপের বিপুল সংখ্যক শব্দের উৎপত্তিস্থল নিকট প্রাচ্য, প্রধানত আরামাইক, আরবি ও পারসিয়ান হওয়ার মূল কারণ এটাই। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের পরিভাষাগুলোর মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের ইউরোপে তার প্রবেশ ঘটে। এসব পরিভাষার কিছু উদাহরণ হলো (মূল শব্দটির মতো করেই ইউরোপে উচ্চারিত হতে হবে তা নয়): দেওয়ান, আরসেনাল, ম্যাগাজিন, ট্রাফিক, ট্যারিফ, রিস্ক, ফোন্ডাকো, সেনসালি, গ্যালিয়া, আভাল ও মাওনা।'[১৫৮]

ইংরেজি শব্দ চেক এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যা এসেছে আরবি সাক শব্দ থেকে; করদ শব্দ থেকে এসেছে ক্রেডিট; রিস্ক থেকে রিস্ক; ফরাসি শব্দ এখেতার এসেছে ইশতারা (কেনা) থেকে; আল-মাখজেন থেকে এসেছে ম্যাগাজিন; হাওয়ালা থেকে আভাল এবং স্পেনিশ শব্দ আলমাসিন এসেছে আল-মাখজেন থেকে; সাউক (বাজার) থেকে জোকো এবং এমন আরো অনেক শব্দ।[১৫৯] এস. লাবিব যেমনটা দেখিয়েছেন, 'যেখানে ইসলাম প্রবেশ করেছে, সেখানেই ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড জোরদার হয়েছে, পণ্য বিনিময় বৃদ্ধি পায় এবং ঋণ পদ্ধতির বিকাশে তা

---

১৫৫. এ. উদোভিচ, *Partnership and Profit in Medieval Islam*(নিউজার্সি : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭০), পৃ. ২৩৬

১৫৬. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫-২৮১; ৩ : ১৩০-১৩৪; ৪ : ১৬০-১৬১; ৩০ : ৩৯

১৫৭. এইচ. পিরেনি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১৫৮. এ.ই. লেইবার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

১৫৯. এ. এইচ. দোই, *Shariah, The Islamic Law*(লন্ডন : তাহা পাবলিশার্স, ১৯৮৪) পৃ. ৩৯৯; জে. ভি. ভিভেস, *Economic History of Spain*(নিউজ জার্সি : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৯), পৃ. ১১৯-১২০; সি. টোরে, *The Commercial Techical Terms in the koran*(লেডেন : ডন পাবলিকেশন্স, ১৮৯২), পৃ. ৫৭; এ. স্টিগহার, *Origin and Spread of Oriental Words in European Languages*(নিউইয়র্ক : ন্যাশনাল বুক হাউজ, ১৯৬৩), পৃ. ৫৭

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।'[১৬০] বানতিয়ার আরো দেখান, 'জানা বিশ্বের সবখানে আরব বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ে। চীন, মালয়েশিয়া ও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।'[১৬১]

উদোভিচের মতে, 'সাফতোজা (বিল অব এক্সচেঞ্জ) সবসময়ের জন্য এবং হাওয়ালা (ঋণ গ্যারান্টি বা ঋণ হস্তান্তর) সাধারণভাবে একটি লিখিত বাধ্যবাধকতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মধ্যযুগে নিকট প্রাচ্যে এগুলো ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ঋণপত্র।'[১৬২] এটা হয়েছিল সম্ভবত আল্লাহতাআলা আল-কুরআনের দীর্ঘতম আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন, সবধরনের বাধ্যবাধকতা লিখে রাখার জন্য।[১৬৩]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর ইসলামি খিলাফতের ধীর ও দীর্ঘ পতনের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় ব্যাংকার হিসেবে জাবদাহ ব্যাপকভাবে গুরুত্ব হারায়। এর কার্যক্রম কেবল সারাফ বা সাইরাফি (মুদ্রা বিনিয়োগকারী) পর্যায়ে নেমে আসে। এর পিছনে যেসব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উপাদান কাজ করেছে সেগুলো হলো–

- রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ইসলাম ও ইসলামি শারি'আহ থেকে ক্রমেই সরে আসা।
- রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িতদের অসংযমী ও বিলাসবহুল ব্যয়।
- সংগঠনের অভাব এবং মাথাভারি প্রশাসন।
- রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া, প্রত্যন্ত প্রদেশগুলোর উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব হারানো এবং ছোট ছোট শাসক বংশ এবং আধা-স্বাধীন গভর্নরদের উত্থান যার ফলে খলিফারা তাদের মন্ত্রী ও সেনাপতিদের হাতের পুতুলে পরিণত হন।
- পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন, সুফি, শিয়া, ইসমাইলিয়া, দ্রুজ, ইত্যাদির উদ্ভব। এদের সবাই খাঁটি মুসলিম হওয়ার দাবি করে।
- ক্রুসেডার, মোঙ্গল এবং তাতারদের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধ। ফলে, ইরাক ও সিরিয়ার বেশিরভাগ এলাকা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।
- প্রায় তিন শতাব্দী ধরে চলা তুর্কি-পারস্য যুদ্ধ। যা ইরাকের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে বাধাগ্রস্ত করে।

উপরোক্ত এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক কারণে মুসলিম বিশ্বের প্রকৌশলগত ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্তিমিত হয়ে পড়ে এছাড়াও ইসলামি অর্থব্যবস্থার অনেক প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে তার জায়গায় পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়।[১৬৪]

ইমানের তাগিদে ও তাকওয়ার দাবিতে মুসলিমগণ তাদের আর্থিক লেনদেন সুদমুক্তভাবেই সম্পন্ন করতে চান। আর্থিক লেনদেনের সবচেয়ে বড় পরিসর হলো ব্যাংক। কিন্তু ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

---

১৬০. এস. লাবিব, *Capitalism in Medieval Islam*(লন্ডন : জার্নাল অব ইকনমিক হিস্ট্রি, ভলিউম-২৯, সংখ্যা ১, মার্চ ১৯৬৯), পৃ. ৮০

১৬১. এ, উদোভিচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

১৬২. প্রাগুক্ত।

১৬৩. আল-কুরআন, ২ : ২৮২-২৮৩

১৬৪. সি. ইসাবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; বি. লিউস, *Combridge History of Islam*(ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭০), পৃ. ১০২; এম.ইউ. চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৮৫; এম.ইউ. চাপরা ও টি. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

সুদকে কেন্দ্র করে। সুদমুক্ত আর্থিক লেনদেন করতে হলে দরকার ইসলামি ব্যাংকের। ইসলামি ব্যাংকিং পরিভাষাটি অতি সম্প্রতিকালে উদ্ভাবিত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে বিশ্বের মানুষ পরিচিত ছিলেন না। তবে ইসলামি অর্থব্যবস্থা তথা ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন ইত্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছিল ইসলামের আদিকাল থেকেই। পবিত্র কুরআনে সুদের নিষিদ্ধতা সম্বলিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহর রাসুল সা. সর্বপ্রথম সুদকে বাতিল ঘোষণা করেন এবং সমগ্র আরবে সুদবিহীন অর্থব্যবস্থার প্রচলন করেন। সাহাবা কিরাম ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতেই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন।[১৬৫]

ইসলামের প্রারম্ভিক কালে আধুনিক যুগের মত কোনো ব্যাংকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু মুসলিমগণ ইসলামি শারি'আহর পদ্ধতিতে নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আল্লাহর রাসুল সা. ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য 'বাইতুল মাল' প্রতিষ্ঠা করেন। বাইতুলমাল-এর লেনদেন ছিল সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগেও বাইতুলমাল বহাল ছিল এবং ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন বাইতুলমাল-এর মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হত। প্রাথমিক যুগের এ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই মুসলিম বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ইসলামি অর্থব্যবস্থা শুধুমাত্র আরব বিশ্বেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সমগ্র বিশ্বেই ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এমন এক যুগ ছিল যখন বিশ্বের শাসন ক্ষমতা ছিল মুসলিমদের হাতে; আর প্রচলিত ছিল সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা। অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সমগ্র বিশ্বে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু মুসলিম জাতি নানা কারণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি। অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্যের শক্তি মুসলিম বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং মুসলিম জাতি সুদভিত্তিক অর্থনীতির সংস্পর্শে আসে। ফলে সুদমুক্ত ইসলামি অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহুদি ও সাম্রাজ্যবাদ শক্তি সুদি ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে সুদকে মুসলিম জাতির উপর চাপিয়ে দেয় এবং ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতে আল্লাহর রাসুল সা. কর্তৃক প্রবর্তিত এবং খুলাফায়ে রাশিদিন কর্তৃক অনুসৃত সুদমুক্ত যে অর্থব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে প্রায় সমগ্র বিশ্বে পরিচালিত হয়ে আসছিল তা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দেয়। ইহুদিরাই ছিল সুদের প্রবর্তক এবং সুদি প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র মালিক। যতদূর জানা যায় প্রাচীন গ্রিক সমাজে যখন ব্যাংক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে তখন ব্যাংকে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। খ্রিস্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্ট ধর্মগ্রন্থেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহুদি জাতি এ নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ব্যাংকসমূহে সুদের প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে খ্রিস্টানরাও তাদের অনুসরণ করে এবং উত্তরোত্তর মুসলিমরাও সুদি কারবার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে মুসলিমদের মনমগজ ও চিন্তাধারার এমন পরিবর্তন ঘটে যে, ব্যাংকিং বলতে তারা শুধু সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যাংকব্যবস্থাকেই বুঝে থাকে। ইসলামি ব্যাংকিং বললে তারা যেন কিছুই বুঝে না। ব্যাংকিং বলতে তারা সুদি ব্যাংকের নাম, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে থাকে।

বর্তমান যুগে ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একে কোনভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লেনদেন, এক

---

১৬৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*(ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫), খ.৬, পৃ. ৩৭

স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর, আমদানি-রপ্তানী ইত্যাদি যাবতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্পন্ন হচ্ছে। ব্যাংক ছাড়া এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা অসম্ভব। এদিক থেকে ব্যাংক একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সুদ প্রথার কারণে সমগ্র ব্যাংকব্যবস্থাই অপবিত্র এবং মানবজাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংক থেকে যদি সুদের মত এ ভয়াবহ অন্যায় ও অভিশাপকে দূর করা যায় তাহলেই ব্যাংক সত্যিকার অর্থে একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম মনীষী গোড়া থেকেই গোটা ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামিকরণের জন্য তথা ব্যাংক থেকে সুদ প্রথাকে অপসারণ করে এটাকে একটা প্রকৃত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার এবং মুসলিম জাতিকে সুদের ভয়াবহ পরিণতি থেকে মুক্ত করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে আসছেন। তারা কখনো নীরব থাকেননি। মুসলিম মনীষীগণ সকল যুগেই ইসলামি নীতিমালাকে পুনঃপ্রবর্তনের ব্যাপারে সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন।[১৬৬]

সুদি ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামিকরণ করার বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন উলামায়ে কিরাম, ইসলামি আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, সাহিত্যিক, শিক্ষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, গবেষক এবং দার্শনিকগণ বিভিন্ন সভা-সমিতি, কনফারেন্স, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে তাদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকেন এবং লিখিতভাবেও ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার রূপরেখা পেশ করতে থাকেন। তাদের এ বক্তব্য এবং লেখনীর ভাষা কখনো বলিষ্ঠ আবার কখনো মন্থর ছিল। বিশেষ করে বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বিশ্বের মুসলিম মনীষীগণ সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার স্বপক্ষে ব্যাপক গবেষণা, লেখালেখি এবং জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকেন। তাদের এ বক্তব্য ক্রমান্বয়ে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে এবং ষাটের দশক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক, বীমা, ইন্সুরেন্স কোম্পানি, সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।[১৬৭]

সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৯৬৩ সালে মিশরের মিটগামারে। ড. আহমদ আল-নাজ্জার স্বউদ্যোগে মিশরীয় বদ্বীপ শহর মিট-গামারে 'মিট-গামার ব্যাংক' নামে একটা সেভিংস ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিল আধুনিক বিশ্বের প্রথম সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এ ব্যাংক বিপুল সাফল্য লাভ করে। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে মিশরের ৯টি প্রদেশে মোট ৯টি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬৮] কিন্তু মিশরের তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক সরকার ১৯৬৭ সালে রাজনৈতিক কারণে উক্ত সকল ইসলামি

১৬৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৩৬

১৬৭. R. Wilson, *Banking and Finance in Arab Middle East*(London : Macmillan Publisher Ltd., 1983), pp. 75-76

১৬৮. A. Ahmed, 'Contemporary Experiences of Islamic Banks' *Journal of Objective Studies*(Delhi : Institute of Objective Studies, 1992), pp. 66-67, 70, 82, 84, 86

ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। অতঃপর মিশর সরকার জনগণের দাবি ও আকাঙ্খার প্রেক্ষিতে এবং রাজনৈতিক সমর্থন অর্জনের জন্য 'নাসের সোস্যাল ব্যাংক' নামে অপর একটা ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হন। ১৯৬৯ সালে ওআইসি গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসির পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে একটা আন্তর্জাতিক ইসলামি অর্থ সংস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রথম বারের মত আলোচনা হয়।[১৬৯] ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের অপর সম্মেলনে 'ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)' চার্টার গৃহীত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালে সাউদি আরবে আইডিবি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সে বছরই সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৭০] অতঃপর ক্রমান্বয়ে কুয়েত, সেনেগাল, বাহরাইন, পাকিস্তান, ইরান, সুইজারল্যান্ড, ওমান, জর্দান, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইরান ও পাকিস্তানের সকল ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামিকরণ করা হয়। বর্তমান বিশ্বে ইসলামি ব্যাংক শুধুমাত্র মুসলিম দেশসমূহেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানি-এর মত অমুসলিম দেশেও ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৪২টি দেশে ১৫৫ টিরও বেশি সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান ইসলামি শারি'আহর নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে এবং শারি'আহর নীতিমালাকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সেদিন হয়ত বেশি দূরে নয় যেদিন সারা বিশ্বের মুসলিমগণ তাদের ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম ইসলামি শারি'আহর ভিত্তিতে পরিচালনা করবে এবং সুদের ভয়াবহ অভিশাপ, শোষণ ও জুলুম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় চারশত ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামি পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তন্মধ্য থেকে বর্তমান বিশ্বে এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি তালিকা নিচে প্রদত্ত হলো–

বাংলাদেশ : (১) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ (২) আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিঃ (৩) আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ (৪) সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ (৫) শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ (৬) ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ (৭) এক্সিম ব্যাংক লিঃ (৮) ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ।

ভারত : (৯) আল আমীন ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং (১০) আমানাহ ব্যাংক, বাঙ্গালোর (১১) ইত্তেফাক ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, বোম্বে (১২) ফালাহ ইনভেস্টমেন্ট লিঃ।

পাকিস্তান : (১৩) এ বি এন আমরু ব্যাংক এন, ভি (১৪) এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (১৫) আল ফয়সাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ (১৬) এলায়েড ব্যাংক অব পাকিস্তান লিঃ (১৭) আলটোফিক ব্যাংক অব পাকিস্তান লিঃ (১৮) আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ (১৯) আশকারি কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ (২০) ব্যাংক আল হাবিব লিঃ (২১) ব্যাংক অব আমেরিকা এন টি এন্ড এস এ (২২) ব্যাংক অব খায়বর (২৩) ব্যাংক অব পাঞ্জাব (২৪) ব্যাংকার্স ইকুইটি লিঃ (২৫) ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ (২৬) বুলান ব্যাংক লিঃ (২৭) সিটি ব্যাংক এন. এ. পাকিস্তান (২৮) ফয়সাল ব্যাংক লিঃ (২৯) ফার্স্ট হাবিব মুদারাবা (৩০) ফার্স্ট ইমেন ব্যাংক লিঃ (৩১) হাবিব ব্যাংক লিঃ (৩২)

---

১৬৯. ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান, *ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা [ওআইসি]*(ঢাকা : ইফাবা, ডিসেম্বর ২০১৬), পৃ. ১৪

১৭০. A. Ahmed, 'Contemporary Experiences of Islamic Banks' *Journal of Objective Studies*, Ibid, p. 70

ইনদোস ব্যাংক লিঃ (৩৩) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান (৩৪) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব পাকিস্তান (৩৫) মাশরিক ব্যাংক (৩৬) মেহরান ব্যাংক লিঃ (৩৭) মেট্রোপলিটান ব্যাংক লিঃ (৩৮) মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক (৩৯) ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান (৪০) ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (৪১) ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কর্পোরেশন (৪২) ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট লিঃ (৪৩) পাক কুয়েত ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিঃ (৪৪) পাক লিবিয়া হোল্ডিং কোং (প্রাঃ) লিঃ (৪৫) প্রুডেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ (৪৬) পাঞ্জাব প্রুভেন্সিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাংক (৪৭) রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্স কর্পোরেশন (৪৮) স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (৪৯) ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ (৫০) ইউনাইটেড ব্যাংক লিঃ (৫১) ইয়ুথ ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন সোসাইটি।[১৭১]

সৌদি আরব : (৫২) ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (৫৩) আল বারাকা ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোঃ (৫৪) আল রাজি ব্যাংকিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন (৫৫) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং গালফ (৫৬) সামবা (৫৭) রিয়াদ ক্যাপিটাল (৫৮) এন সি বি ক্যাপিটাল (৫৯) জি আই বি ক্যাপিটাল (৬০) সৌদি-ফরাসি ব্যাংক (৬১) আলিনমা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (৬২) আল বিলাদ ইসলামিক ব্যাংক (৬৩) সৌদি হল্যান্ড ক্যাপিটাল (৬৪) আল জাযিরা ব্যাংক (৬৫) ইসলামিক কর্পোরেশন ডেভোলপমেন্ট ব্যাংক লি (প্রাঃ)।[১৭২]

ইরান : (৬৬) সেন্ট্রাল ব্যাংক অব দ্যা ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান (৬৭) ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম (৬৮) এগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব ইরান (৬৯) আমিন ইনভেস্টমেন্ট হাউজ (৭০) আয়েনদেহ ব্যাংক (৭১) ব্যাংক ডে (৭২) ব্যাংক মাসকান (৭৩) মিল্লাত ব্যাংক (৭৪) ইরান মিল্লি ব্যাংক (৭৫) ইন্ডাস্ট্রি এন্ড মাইন ব্যাংক (৭৬) পাশারজাদ ব্যাংক (৭৭) সাদারাত ব্যাংক (৭৮) সিপাহ ব্যাংক (৭৯) ই এন ব্যাংক (৮০) এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (৮১) গ্যাভামিন ব্যাংক (৮২) ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব পার্সিয়া (৮৩) ইরান জামিন ব্যাংক (৮৪) কারাফাইন ব্যাংক (৮৫) কারদান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (৮৬) কিশাভারজি ব্যাংক (৮৭) মিল্লাত ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (৮৮) পার্সিয়ান ব্যাংক (৮৯) পার্সিয়া ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (৯০) ইরান পোস্ট ব্যাংক (৯১) কারজোল হাসানাহ মেহের ইরান ব্যাংক (৯২) রিফাহ ব্যাংক (৯৩) সামান ব্যাংক (৯৪) সারমায়েহ ব্যাংক (৯৫) সিনা ব্যাংক (৯৬) তিজারাহ ব্যাংক।[১৭৩]

জর্দান : (৯৭) জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেন্টমেন্ট (৯৮) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট হাইজ (৯৯) ন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক (১০০) জর্দান ফাইন্যান্স হাউজ, আম্মান (১০১) বায়তুল মাল সেভিংস এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং।

কাজাকিস্তান : (১০২) আল বারাকা কাজাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল কর্মাশিয়াল ব্যাংক (১০৩) ন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক (১০৪) কিবরিজ তুর্কি প্রজাতন্ত্র (১০৫) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব কিবরিয়া লিঃ কে.টি.আর।

কুয়েত : (১০৬) কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ (১০৭) দি ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টর।[১৭৪]

---

১৭১. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*(Dhaka : IERB, November, 2008), pp. 51-52

১৭২. Ibid, p. 48

১৭৩. M. S. Khan & A. Mirakhor, *Islamic Banking : Experiences in the Islamic Republic of Iran and Pakistan*(Washington D.C. : International Monetary Fund, 1989), JEL Classification Nos. 3116; 3120; 3124

১৭৪. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*, Ibid, p. 49

লিচেন্সটাইন : (১০৮) আরিনকো আরব ইনভেস্টমেন্ট কোং (১০৯) আইবিএস ফাইন্যান্স এসএ।

আফগানিস্তান : (১১০) ইসলামিক ব্যাংক আফগানিস্তান।

আলজেরিয়া : (১১১) ব্যাংক আল বারাকা ডি আলজেরিয়া।

আর্জেন্টিনা : (১১২) ইসলামিক প্যান-আমেরিকান ব্যাংক।

বাহামাস : (১১৩) দার আল-মাল আল-ইসলামি ট্রাস্ট (১১৪) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিঃ (১১৫) আফ্রিকান-আমেরিকান ইসলামিক ব্যাংক (১১৬) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহামাস লিঃ (১১৭) মাসরাফ ফয়সাল আল ইসলামি (ব্যাংক এন্ড ট্রাস্ট) বাহামাস লিঃ।

বাহরাইন : (১১৮) বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক বি. এস. (১১৯) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহরাইন (১২০) বাহরাইন ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং (১২১) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি অব দি গালফ (১২২) আরব ব্যাংকিং কর্পোরেশন (১২৩) গালফ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক (১২৪) ফয়সাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক অব বাহরাইন (১২৫) আল তাওফিক কোং ফর ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস (১২৬) আল বারাকা ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (১২৭) আরব ইসলামিক ব্যাংক (১২৮) তাকাফুল ইসলামিক ইন্সুরেন্স কোম্পানি (১২৯) ইসলামিক ইন্সুরেন্স এন্ড রি-ইন্সুরেন্স কোং (১৩০) মাশরিক ফয়সাল আল ইসলামিক।

সাইপ্রাস : (১৩১) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সাইপ্রাস (১৩২) কিবরিজ ইসলামিক ব্যাংক, কিফকোসা, নিকোশিয়া, তুর্কি সাইপ্রাস (১৩৩) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব কিবরিজ লিঃ তুর্কী, সাইপ্রাস।

ডেনমার্ক : (১৩৪) ইসলামিক ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল (১৩৫) ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক।

জিবুতি : (১৩৬) ব্যাংক আল বারাকা।

মিশর : (১৩৭) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব ইজিপ্ট (১৩৮) ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট (১৩৯) নাসের সোস্যাল ব্যাংক, মিশর (১৪০) ইজিপ্সিয়ান সৌদি ফাইন্যান্স ব্যাংক (১৪১) ব্যাংক মিশর-ইসলামিক ব্রাঞ্চেস (১৪২) আরব ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, কায়রো (১৪৩) জেনারেল ইনভেস্টমেন্ট কোং, কায়রো (১৪৪) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোং, কায়রো।

জার্মানি : (১৪৫) আল বারাকা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি, ফ্রাঙ্কফুর্ট।

গিনি : (১৪৬) মাসরাফ ফয়সাল আল-ইসলামি (১৪৭) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (১৪৮) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অভ গিনি।

ইন্দোনেশিয়া : (১৪৯) শরিয়াহ মানদিরি ব্যাংক (১৫০) মুআমালাত ব্যাংক (১৫১) ইন্দোনেশিয়া ব্যাংক (১৫২) দুবাই ইসলামিক ব্যাংক (১৫৩) পি.টি ব্যাংক ইন্দো কর্পোরেশন (১৫৪) হং লিওং ইসলামিক ব্যাংক (১৫৫) সি আই এম বি ব্যাংক (১৫৬) এইচ এস বি সি আমানাহ।

লুক্সেমবার্গ : (১৫৭) ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং (১৫৮) ইসলামিক তাকাফুল কোম্পানি (১৫৯) ফয়সাল হোল্ডিং এস এ (১৬০) ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ ইউনিভার্সাল হোল্ডিং।[১৭৫]

---

১৭৫. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*, Ibid, p. 49

মালয়েশিয়া : (১৬১) ব্যাংক ইসলাম মালয়েশিয়া বারহেড (১৬২) তাবুং ব্যাংক (১৬৩) শিরকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া (১৬৪) আল বারাকা ব্যাংক মালয়েশিয়া (১৬৫) দাল্লা আল-বারাকা মালয়েশিয়া (১৬৬) পিলগ্রিমস ফান্ড বোর্ড।[১৭৬]

মৌরিতানিয়া : (১৬৭) আল বারাকা ইসলামিক ব্যাংক।

মরক্কো : (১৬৮) ব্যাংক আল আজিদাহ।

নাইজার : (১৬৯) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব নাইজার (১৭০) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (১৭১) মাশরিক ফয়সাল ইসলামিক।

নাইজেরিয়া : (১৭২) জায়েজ ব্যাংক পিএলসি।

ফিলিস্তিন : (১৭৩) প্যালেস্টাইনি ইসলামি ব্যাংক।

ফিলিপাইন : (১৭৪) ফিলিপাইনস আমানাহ ব্যাংক (১৭৫) আমানাহ ব্যাংক, লামবোঙ্গা।

সেনেগাল : (১৭৬) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক (১৭৭) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (১৭৮) মাশরিক ফয়সাল আল ইসলামি।

দক্ষিণ আফ্রিকা : (১৭৯) ফার্স্ট মুসলিম ইন্টারেস্ট-ফ্রি বিজনেস ইন্সটিটিউশন (১৮০) ইসলামিক ব্যাংক, ডারবান।

সুদান : (১৮১) এগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব সুদান (১৮২) আল সাফা ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ক্রেডিট ব্যাংক (১৮৩) আল বারাকা ব্যাংক (১৮৪) আল শামিল ইসলামিক ব্যাংক (১৮৫) ব্রুনাইল ব্যাংক লিঃ (১৮৬) সিটি ব্যাংক এন.এ (১৮৭) কো-অপারেটিভ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (১৮৮) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সুদান (১৮৯) ফার্মস ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট (১৯০) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং (১৯১) ন্যাশনাল ব্যাংক অব সুদান (১৯২) ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (১৯৩) সৌদি সুদানিজ ব্যাংক (১৯৪) সুদান কমার্শিয়াল ব্যাংক (১৯৫) সুদানিজ ফ্রান্স ব্যাংক (১৯৬) তাদামুন ইসলামিক ব্যাংক (১৯৭) ওয়ার্কাস ন্যাশনাল (১৯৮) ইসলামিক ব্যাংক ফর ওয়েস্টার্ন সুদান (১৯৯) ইসলামিক ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিঃ (২০০) তাদামুন ইসলামিক কোম্পানি ফর ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট (২০১) ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (২০২) তাদামুন ইসলামিক কোম্পানি ফর এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট লিঃ।[১৭৭]

সুইজারল্যান্ড : (২০৩) দার আল-মার আল-ইসলামি (ডিএমআই) (২০৪) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিঃ (২০৫) শরিয়া ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস এসএ (২০৬) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট পুল (ইউনিয়ন ব্যাংক অব সুইজারল্যান্ড) (২০৭) তাকওয়া ব্যাংক (২০৮) সারজাহ ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস এসএ (২০৯) খিরো ক্রেডিট ব্যাংক সুইজারল্যান্ড লিঃ।

থাইল্যান্ড : (২১০) এরাবিয়ান-থাই ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি (২১১) এরাবিয়ান-থাই ইনভেস্টমেন্ট কোং ব্যাংকক।

তিউনিশিয়া : (২১২) আল সৌদি আল তিউনিসি ফাইন্যান্সিং হাউজ (২১৩) বাইত ইত্তোমুইন সৌদি তিউনিশ।

তুরস্ক : (২১৪) আল বারাকা তার্কিস ফাইন্যান্স হাউজ (২১৫) ফয়সাল ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন (২১৬) কুয়েত তার্কিস আওকাফ ফাইন্যান্স হাউজ (২১৭) ফয়সাল ফরেন ট্রেড এন্ড মার্কেটিং কোং (২১৮) ফয়সাল রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশন এন্ড ট্রেডিং কোং।

---

১৭৬. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*, Ibid, p. 48

১৭৭. Ibid, p. 49

সংযুক্ত আরব আমিরাত : (২১৯) দুবাই ইসলামিক ব্যাংক (২২০) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং অব দি গালফ (সারজাহ) (২২১) ইসলামিক আরব ইন্সুরেন্স কোম্পানি।

যুক্তরাজ্য : (২২২) আল রাজি কোম্পানি ফর ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট (২২৩) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি অব ইউ কে (২২৪) ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ পি এল সি (ইংল্যান্ড) (২২৫) আল বারাকা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ (২২৬) ফার্স্ট ইন্টারেস্ট ফ্রি ফাইন্যান্স কনসোর্টিয়াম (২২৭) মাসরাফ ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক (২২৮) আল বারাকা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (২২৯) উম্মাহ ফাইন্যান্স হাউজ (২৩০) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ইউনিট (২৩১) ইউনাইটেড ব্যাংক অব কুয়েত পিএলসি, লন্ডন (২৩২) দাল্লাহ আল-বারাকা (ইউকে) লিঃ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : (২৩৩) ডিএমআই ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস (২৩৪) আর বারাকা ব্যাংকরপ, টেক্সাস (২৩৫) আর বারাকা ব্যাংকরপ, ক্যালিফোর্নিয়া (২৩৬) মুসলিম সেভিংস এন্ড ইনভেস্টমেন্ট (এমএসআই)।[১৭৮]

উপরিউক্ত আলোচনার পর এ কথা বলা যায় যে, সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সকলেরই রয়েছে। তাই তো মুসলিম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অমুসলিম দেশেও ইসলামি শারি‘আহ মুতাবিক পরিচালিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে তা সম্মানের সাথে গৃহীতও হচ্ছে।

---

১৭৮. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*, Ibid, pp. 47-53

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা মুসলিমগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে যা তাদের অন্যতম ইমানি অধিকার। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় প্রকার কল্যাণের অঙ্গীকার বহনকারী ইসলামি ব্যাংক সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় যা থেকে বিচ্যুত হওয়া এর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাহলে ইসলামি ব্যাংক হিসেবে এর আত্মপ্রকাশের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে। ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ হলো–[১৭৯]

১. ইসলামি শারি'আহর নীতিমালা মুতাবিক এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।
২. আর্থিক কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে সুদ বর্জন করা।
৩. ব্যাংকিং কার্যক্রম জনকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত করা।
৪. বিনিয়োগ কার্যক্রম সমাজের সাধারণ চাহিদার ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপণ করা।
৫. বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামি নীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ করা।
৬. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।
৭. স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।
৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান ও আত্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৯. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
১০. ইসলামি অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
১১. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে অংশিদারিত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা।

সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা : সমাজ ও অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে ঘৃণিত ও ক্ষতিকর উপাদান হলো সুদ। সুদ বহুমুখী সামাজিক ক্ষতির জন্য দায়ি এবং মানবতার অর্থনৈতিক কল্যাণ বিধ্বংসী নিন্দনীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিশ্বব্যাপী সুদের আগ্রাসী ভূমিকা মুসলিমগণের কেবল অর্থনৈতিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা নয়; তাদের ইমান ও তাকওয়ার জন্যও এটা মারাত্মক হুমকি। সুদের ব্যাপারে হাদিসে বলা হয়েছে–

'হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, সুদের মধ্যে সত্তর প্রকার পাপ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন পাপ মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য।'[১৮০]

সুদের বিষয়ে হাদিসে আরো বর্ণনা এসেছে–

> 'হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সা. সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সুদি লেনদেনের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, পাপের দিক থেকে তারা সকলেই সমান অপরাধী।'[১৮১]

---

১৭৯. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

১৮০. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون بابا أدناها كالذي يقع على أمه. দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াজিদ, *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, খ. ৭, পৃ. ৪৮, হাদীস নং ২২৬৫

এতদ্‌প্রেক্ষিতে ইসলামি ব্যাংকের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্যই হলো সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। আর্থিক লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে সুদকে বর্জন করার মাধ্যমে ইসলামি শারি‘আহ্ অনুমোদিত ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলা ইসলামি ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠা করা : আল্লাহ্ তা‘আলার এ দুনিয়াতে তিনি ব্যতীত অন্য কারো হুকুম চলতে পারে না। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

> ‘তিনি (ইয়াকুব) বললেন, হে আমার বৎসগণ! তোমরা সকলে একই প্রবেশদ্বার দিয়ে গমণ করো না; পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহ্‌র কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহ্‌রই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের।’[১৮২]

আল-কুরআনে এ বিষয়ে আরো বলা হয়েছে–

> ‘আপনি বলে দিন, আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছ। তোমরা যে বস্তু শীঘ্র দাবি করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।’[১৮৩]

আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন– ‘অতঃপর সকলকে সত্যিকার প্রভূ আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রাখ, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।’[১৮৪]

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন–

> ‘নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সে আল্লাহ্, যিনি আসমান ও যমিনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমুন্নত হন, তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, এমনভাবে যে রাত্রি ও দিবস একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বড়িত গতিতে; সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সবই তাঁর হুকুমের অনুগত, জেনে রাখো, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই আর হুকুমের একমাত্র মালিক তিনিই, সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ হলেন বরকতময়।’[১৮৫]

---

১৮১. আবু দাউদ, *সুনানু আবু দাউদ*, (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৯), খ.৩, পৃ. ২৪৪, হাদিস নং ৩৩৩৩; আবু ঈসা মুহাম্মাদ, *জামে আত-তিরমিযী*, খ.৩, পৃ. ৫১২, হাদিস নং ১২০৬; মুহাম্মাদ ইবন ইয়াজিদ, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ*, খ.২, পৃ. ৭৬৪, হাদিস নং ২২৭৭; আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহিহ্ লি মুসলিম*(দিল্লী : মাকতাবা রশিদিয়া, ১৩৫৭ হি.), খ.২, কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুযার‘আত, বাবুর রিবা, পৃ. ২৭

১৮২. আল-কুরআন, ১২ : ৬৭

১৮৩. আল-কুরআন, ৬ : ৫৭

১৮৪. আল-কুরআন, ৬ : ৬২

১৮৫. إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَ فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِقف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُه حَثِيْثًالا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍم بِأَمْرِهط أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. দ্র. আল-কুরআন, ৭ : ৫৪

বস্তুত আল্লাহতা'আলা মহাবিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও একচ্ছত্র অধিকর্তা। জীবনের সকল ক্ষেত্রের সার্বিক রীতিনীতি তিনি মানুষকে জানিয়েছেন। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কীভাবে মানুষ চলবে, কোন সমস্যা উপস্থিত হলে কীভাবে তার সমাধান করবে এ সবের বিস্তারিত নিয়মকানুন আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সংকট, ভারসাম্যহীনতা এগুলোর জন্য মূলত আল্লাহর বিধানের অনুপস্থিতিই দায়ি। ইসলামি ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান প্রতিষ্ঠা করা।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারা প্রবর্তন করা : ব্যাংকব্যবস্থা যেন মানুষের কল্যাণের পক্ষে সহায়ক হয় ইসলামি ব্যাংক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। ইসলামি ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। অর্থনৈতিক অবস্থার ঘুরপাকে মানুষকে যেন অসহায়ভাবে ঘুরতে না হয় তেমন এক স্বচ্ছনীতির প্রয়োজনীয়তা ইসলামি ব্যাংক সব সময় অনুভব করে। আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম করা ব্যাংকিং-এর জন্য নীতিগতভাবে জরুরি। মানুষ যেন ইসলামি ব্যাংককে তাদের আশা ভরসার কেন্দ্রস্থল হিসেবে পায় ইসলামি ব্যাংক সে লক্ষ্যে কাজ করে। মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণের দিক বিবেচনা করেই এ ব্যাংক তার সমুদয় কার্যক্রম প্রস্তুত করে।[১৮৬]

আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা : আয় ও সম্পদের অসম বণ্টন মানুষের সংকটকে আরো ঘনীভূত করে। আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত এবং মানুষ নিজের জন্য কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে– 'যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে, সব আল্লাহ্রই। সব বস্তু আল্লাহ্র মুষ্টিবলয়ে।'[১৮৭]

বস্তুত মানুষ কেবল আল্লাহ্প্রদত্ত সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করে। কিন্তু মানুষের চেষ্টা ও প্রয়াস, তার মেধা ও শক্তির সীমাবদ্ধতার গন্ডিতে বাধা। লক্ষণীয় বিষয় হলো, মানুষের আকাঙ্খা বা লোভ তার চেষ্টার চেয়ে বেশি। ঠিক এখান থেকেই অপ্রাচুর্য ও হতাশা সমস্যার উদ্ভব। এরপর মানুষের চেষ্টার ফলে অর্জিত আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যাপারে যদি নিশ্চিত করা না যায় তাহলে সেটি আরো বেশি উৎকণ্ঠা ও অতৃপ্তির জন্ম দেয়। সে কারণে ইসলামি ব্যাংক আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে গুরুত্বের সাথে কাজ করে।

ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা : আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন।[১৮৮] ইসলাম সুদভিত্তিক কারবার বর্জন করে মুনাফাভিত্তিক ব্যবসা করার কথা বলে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি ও সুবিচারের অভাব উদ্বেগজনকভাবে বিরাজ

---

১৮৬. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
১৮৭. আল-কুরআন, ৪ : ১২৬
১৮৮. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

করছে। নীতির অভাবে ব্যবসা হচ্ছে কলূষিত, মানুষ হচ্ছে প্রতারিত। দুনিয়াতে মানুষ একটু সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করতে চায়। তারা আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচার ও উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতি তথা ব্যাংকব্যবস্থায় সেটা উপেক্ষিত, বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিই এদের একমাত্র লক্ষ্য। ফলে ইনসাফের সংকটে মানুষ হচ্ছে নির্যাতিত। যে কোন উপায় অবলম্বন করে মানুষ সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে বলে অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। তারা ন্যায়-নীতির তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র অর্জনকেই প্রাধান্য দেয়। এটা ইসলামের রীতি হতে পারে না।[১৮৯]

ইসলামি ব্যাংক অন্যান্য সুবিধাভোগীদের এ সুযোগ অবাধ করতে দিতে প্রস্তুত নয়। ইসলামি ব্যাংক অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফভিত্তিক ন্যায়বিচার উপহার দেয়। ইসলাম এর অনুসারীদের ভোগের প্রাচুর্য এবং অর্থনৈতিক বাড়াবাড়ি পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম ভোগ অভ্যাসে সহজ-সরল ধারা অবলম্বনের জন্য দৃঢ়ভাবে নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম এর অনুসারীদের স্ব-স্ব শ্রম ও মেধার মাধ্যমে ন্যায়-নীতি ও সততার সাথে আয় উপার্জন করতে বলেছে। ইসলামি ব্যাংক ইসলামি শরি'আহ্ মুতাবিক পরিচালিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসূহের একটা। এ উদ্দেশ্য ইসলামের নৈতিক দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।[১৯০]

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা : জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়া আবশ্যক। দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে না পারলে জনসংখ্যার প্রাচুর্যতা জাতি ও বিশ্বের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এতে কর্মসংস্থানেরও সংকট দেখা দেয়। ইসলাম অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ একটি জীবনদর্শন। আল্লাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীকে তাঁর বান্দাদের বসবাসের জন্য বিশেষ উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম মানুষকে আল্লাহ্প্রদত্ত সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধা অর্জনের আহ্বান জানায়। ইসলামি ব্যাংক এ ক্ষেত্রে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে মানবসম্পদের উন্নয়নের অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত করেছে।

স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা : ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম হলো স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানো। সাধারণত দেখা যায় যে, সমাজের স্বল্প আয়ের লোকেরা জীবনযাপনের মানের দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। বাজারের পণ্যমূল্যের সাথে তাদের আয়ের পরিমাণ সামঞ্জস্যশীল না হওয়ায় জীবনযাত্রার মানের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। ইসলামি ব্যাংক সমাজের পিছিয়ে পড়া ঐ সব লোকদের জন্য জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকারী পদক্ষেপ গ্রহণ এর উদ্দেশ্যাবলীর অন্যতম মনে করে।[১৯১]

---

১৮৯. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

১৯০. এম, উমর চাপরা, অনূঃ ড. মাহমুদ আহমদ ও এম, জহুরুল ইসলাম, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ১ম প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ২৪

১৯১. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

আন্তরিকতার সাথে উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করা : ইসলামি ব্যাংকসমূহ গ্রাহক সেবার মানের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক ও দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ইসলামি ব্যাংক মনে করে, একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকগণই হলো তাদের প্রাণ। যাদের অল্প অল্প সঞ্চয়ে একটা ব্যাংক বড় অংকের পুঁজি গঠন করে তারা ব্যাংকের কাছে অতি সম্মানিত। প্রচলিত ব্যাংকের দৃষ্টিতে যাই হোক ইসলামি ব্যাংকের কাছে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। দু'য়ের মাঝে বিভেদ কিংবা বৈষম্যমূলক সম্পর্ক ইসলামি ব্যাংকের নীতি পরিপন্থী। গ্রাহকগণের সেবা দানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও উন্নয়ন বজায় রাখা ইসলামি ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উন্নয়নমূলক কাজে উদ্যোগীদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা করা : ইসলামি শরি'আহ্ মুতাবিক পরিচালিত ব্যাংকসমূহ উন্নয়ন চায়, উন্নয়নের জাগরণ দেখতে চায়, অলস পড়ে থাকা সম্পদের যথাযথ বিনিয়োগ চায়। এ ব্যাংক সমাজের বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের মাঝে বিদ্যমান সম্পদের ব্যবধান হ্রাস করে আনতে চায়। ইসলামি ব্যাংকসমূহ নীতিগতভাবে মনে করে, যে কোন ধরনের শিল্প স্থাপন কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের নিশ্চিত সুযোগ করে দিবে এবং জাতীয় অর্থনীতি তাতে উপকৃত হবে। এ কারণে এ ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ কার্যক্রম কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যারাই উদ্যোগী হবে তাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা করা।

দুঃস্থ ও অসহায়দের জন্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা : ইসলামি ব্যাংক সমাজের অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের কথা চিন্তা করে। দুঃস্থ মানবতার সেবা করা ইসলামি ব্যাংক একটি দায়িত্ব মনে করে।[১৯২] বিভিন্ন দুর্যোগে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা চরম আর্থিক অনটনে ক্লিষ্ট দিন অতিবাহিত করে তাদের জন্য কল্যাণমূলক কিছু করার নৈতিক দায় অনুভব করে ইসলামি ব্যাংক। অসহায় প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়ানো ইসলামের এ মহান শিক্ষা কাজে লাগাতে ইসলামি ব্যাংকের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো দুঃস্থ ও অসহায়দের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

শিক্ষা প্রসারে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত ও সম্মানিত। শিক্ষা জাতিকে সমৃদ্ধি ও মর্যাদা এনে দেয়। শিক্ষা মানবজীবনের জন্য আলো স্বরূপ। জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে সকলকে সুশিক্ষার আলো গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার অভাব অর্থই হলো অন্ধকারে জাতির নিমজ্জিত থাকা। আল-কুরআনের প্রথম বাণীই ছিল 'পড়'। মহান আল্লাহ্ বলেন, "পড়! তোমার প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[১৯৩] ইসলাম জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের জন্য ইসলাম তাগিদ দিয়েছে। ইসলামি ব্যাংক ইসলামের এ মৌলিক নির্দেশনা অনুসরণ করে। এ ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকের আরেকটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে শিক্ষা প্রসারে নানারকম উৎসাহমূলক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা।

---

১৯২. এম, উমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৯৩. اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. দ্র. আল-কুরআন, ৯৬ : ১

কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে সহযোগিতা করা : ইসলামে কৃষিকাজ অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ।[১৯৪] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

'হে মু'মিনগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।'[১৯৫]

রসুলুল্লাহ সা. সাহাবিগণকে কৃষি কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। এ সম্পর্কে একটি হাদিস এ রকম আছে,

'হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখনই কোন মুসলিম একটি গাছ অথবা শস্য রোপণ করে এবং এ থেকে মানুষ, পশু-পাখি আহার্য গ্রহণ করে তখন ইহা রোপণকারীর পক্ষে একটি সদকাহ হিসেবে পরিগণিত হয়।'[১৯৬]

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

'হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, যে জমি পূর্বে কেউ আবাদ করেনি, তা যে আবাদ করবে, তাতে তারই অধিকার বর্তাবে।'[১৯৭]

ইসলামি ব্যাংক ইসলামি শারি'আহ্র দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কৃষিকাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। ইসলামি ব্যাংক কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষি খাতকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। এ কারণে ইসলামি ব্যাংকের কৃষি সহযোগিতামূলক বিশেষ প্রকল্প রয়েছে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করা : ইসলামি অর্থনীতি বিশ্ববাসীর জন্য একটি আশীর্বাদ। বিশ্ব অর্থনীতিতে যখন অশান্ত ও ব্যর্থতার পদধ্বনি শোনা যায়, তখন ইসলামি অর্থনীতি নতুন করে আশার আলো দেখায়। ইসলামি অর্থব্যবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট। ইসলামি ব্যাংক বিশ্ব অর্থনীতির বিরাজিত প্রেক্ষাপটে উন্নততর ও কল্যাণমূলক ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

বিস্তারিত আলোচনার পর সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইসলামি ব্যাংক শরি'আহ্ মুতাবিক পরিচালিত কল্যাণমুখী একটা ব্যাংকব্যবস্থা। লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে এ ব্যাংক সুদ পরিহার করে চলতে বদ্ধপরিকর। সামগ্রিকভাবে জনকল্যাণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শারি'আহ্র নীতিমালার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নে ব্যাপক অবদান রাখছে ইসলামি ব্যাংকসমূহ।

---

১৯৪. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১৯৫. আল-কুরআন, ২ : ২৬৭

১৯৬. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *আস সহীহ লি মুসলিম*,(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪), খ.৮, পৃ. ১৮০, হাদিস নং ২৯০৪

১৯৭. জামিউল উসূল ফী আহাদিসির রসূল, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৩০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ইসলামি ব্যাংকিং এ চুক্তি ও ক্রয়-বিক্রয়

ইসলামি ব্যাংকিংয়ে চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চুক্তি শব্দের আরবি প্রতিশব্দ 'আকদ' ও ইংরেজি প্রতিশব্দ 'কন্ট্রাক্ট'। এর আভিধানিক অর্থ হলো– বন্ধন, বাঁধন, সংযোগ, সম্পর্ক, একত্রিকরণ, সংশ্লিষ্টতা, ধার্যকরণ, আরোপ, শক্ত করা, সুদৃঢ় করা, কঠিন করা, জোর দেয়া, টানা দেয়া, জামানত, নিশ্চয়তা, গ্যারান্টি, নিরাপত্তা, বীমা, দায়-দায়িত্ব, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি, শপথ, আমল, কাল, গিঁঠ।[১৯৮] অতএব দুই বা ততোধিক মনকে বা ব্যক্তিকে সাধারণ অভিপ্রায়ে মতৈক্যে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তা বাস্তবায়ন করাই চুক্তির উদ্দেশ্য। কাজেই দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মতৈক্যের উপর ভিত্তি করেই চুক্তি গঠিত হয়। এই মতৈক্য অবশ্য দেশীয় ও শারি'আহর আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টির অভিপ্রায়ে হতে হবে নতুবা সেই মতৈক্যকে ইসলামি ব্যাংকিংয়ে চুক্তি বলা হয় না।

আর ইসলামি পরিভাষায় চুক্তি বলা হয়, প্রস্তাব প্রদান ও প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে একাধিক পক্ষের স্বাধীন ইচ্ছা ও পরিপূর্ণ ক্ষমতার সংযোগ ও বন্ধন।[১৯৯] অন্যভাবে বলা যায়, বাধ্যবাধকতা পূর্ণ কবুলের সাথে ইজাবের সংযোগ ও বন্ধন, যেমন– ব্যবসায়ের চুক্তি ও বিবাহের চুক্তি ইত্যাদি।[২০০]

চুক্তি গঠিত হয় চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ও কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে। কাজেই চুক্তি পক্ষসমূহের নিজস্ব ব্যাপার বলা যায়। কিন্তু তাদের আচরণ অনিয়ন্ত্রিত থাকলে সমাজে বিশৃঙ্খলা হতে বাধ্য। তাই চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং পারস্পরিক অঙ্গীকার পালনে পক্ষগণকে বাধ্য করার জন্য দেশে দেশে চুক্তি আইনের উদ্ভবও হয়েছে। ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মতৈক্যের ভিত্তিতে চলতে থাকে। পক্ষগণ নিজেরাই পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার নির্ধারণ করে নেয়। যেমন– 'ক' তার একটি গাড়ি বিক্রয়ের জন্য 'খ' এর সাথে চুক্তি করল। এক্ষেত্রে 'ক' এর দায়িত্ব হলো গাড়িটি অর্পণ করা এবং 'খ' এর দায়িত্ব হলো গাড়িটির মূল্য প্রদান করা। আবার 'ক' এর অধিকার হলো গাড়িটির মূল্য পাওয়া এবং 'খ' এর অধিকার হলো গাড়িটি পাওয়া। পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে একজনের দায়িত্ব অপরজনের অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়।[২০১]

চুক্তি আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ যেন নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে অপরের অধিকার নিশ্চিত করে এবং কেউ তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে আইনে তার প্রতিকার করা। সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীয় তথা জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করে চুক্তি আইন কিছু নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং পক্ষগণের স্বাধীনতার সীমা স্থির করে দিয়েছে। স্যার ফ্রেডারিক পোলকের মতে, চুক্তি আইন হলো একই প্রকৃতির মানুষের পারস্পরিক ব্যবহার ও চালচলন হতে তাদের সততা সম্বন্ধে যে প্রত্যাশা তাকে আইনে বলবৎযোগ্য করার সরকারি প্রচেষ্টা। সাভাইনির মত আইনবেত্তাগণের মতে, সুস্থ দেহ ও মনে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অপরের সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, সে ব্যক্তি উক্ত চুক্তি মেনে চলতে বাধ্য, অন্যথায় সে চুক্তিভঙ্গের জন্য দায়ি হবে।

---

১৯৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৩

১৯৯. আল্লামা জুরযানি, *আত-তারিফাত*, পৃ. ৫৪

২০০. আয-যারকাশি, *আল-মানসুর*, খ.২, পৃ. ৩৯৭

২০১. এ. বি. সিদ্দিক, *চুক্তি আইন*(ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, নভেম্বর ২০১১), পৃ. ১

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ চুক্তির সাথে পরিচিত এবং অনেক লেনদেনই চুক্তির ভিত্তিতে করে আসছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চুক্তি আইনের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পণ্য ক্রয়, সম্পত্তি হস্তান্তর, আর্থিক লেনদেন, যানবাহনে ভ্রমণ, চাকুরিতে নিয়োগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই চুক্তির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। চুক্তির সবচেয়ে ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে; বিশেষ করে ব্যাংকিং সেক্টরে। কোন ব্যক্তি ব্যবসায় পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলে তাকে প্রতিটি পদক্ষেপে চুক্তি করতে হয়। প্রথমে তাকে ব্যবসার অঙ্গন অর্থাৎ দোকান কিনতে হবে বা ভাড়া নিতে হবে এবং এ কাজে চুক্তির প্রয়োজন। সে ব্যক্তি একক মালিকানাধীনে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে অথবা অন্যের সাথে অংশীদারি ব্যবসায় করতে পারে কিংবা লিমিটেড কোম্পানি গঠন করতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অংশীদারগণের মধ্যে চুক্তি হয়ে থাকে এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের সাথে কোম্পানির চুক্তি হয়ে থাকে। কর্মচারী বা প্রতিনিধি নিয়োগ করলে সেখানেও চুক্তির প্রয়োজন। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তাকে পণ্য কিনতে হবে। কেনার পর এই পণ্য পরিবহণের জন্য তাকে চুক্তি করতে হয়। এমনকি পথিমধ্যে দুর্ঘটনা, চুরি বা অন্যভাবে পণ্যের ক্ষতি থেকে রক্ষার্থে বীমা করতে হয় যা চুক্তির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। নগদ অর্থ লেনদেনের চেয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে আদান-প্রদান অধিক বুবিধাজনক। তাই ব্যাংকের সাথে চুক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করে তার মাধ্যমেই আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করা হয়। এভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই চুক্তির ব্যবহার দেখা যায়। ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের সাথে চুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রকে ক্রমশ সম্প্রসারিত ও জটিলতর করে তুলেছে। সেই সাথে চুক্তি আইনেরও সূক্ষ্ম বিধানাদির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা পরিহার করে মানব কল্যাণে চুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য চুক্তি আইন প্রয়োগ করা হয়। চুক্তি আইন, চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের ভবিষ্যৎ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এক পক্ষকে অপর পক্ষের অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করতে সাস জোগায়। কেউ তার অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হলে চুক্তি আইন তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করে। তাই চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়; আন্তর্জাতিক পর্যায়েও চুক্তির গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চুক্তি আইনকে নিঃসন্দেহে একটি মৌলিক আইন বলা যায়। অন্যান্য দেওয়ানি আইনসমূহ মূলত চুক্তি আইনকে ভিত্তি করেই প্রবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে নিম্নোক্ত আইনগুলোর সাথে চুক্তি আইনের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়–

(ক) ১৮৬৫ সালের পরিবহণ আইন (The Common Carrier Act, III of 1865)

(খ) ১৮৭৭ সালের সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন (The Specific Relief Act, 1877)

(গ) ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন (The Negotiable Instruments Act, 1881)

(ঘ) ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন (The Transfer of Property Act, 1882)

(ঙ) ১৮৯০ সালের রেলওয়ে আইন (The Indian Railways Act, 1890)

(চ) ১৯৩০ সালের পণ্য বিক্রয় আইন (The Sale of Goods Act, 1930)

(ছ) ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন (The Partnership Act, 1932)[২০২]

২০২. এ. বি. সিদ্দিক, *চুক্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩

ইসলামি ব্যাংকিংয়ে চুক্তি

ইসলামি ব্যাংকসমূহ জমা গ্রহণ থেকে শুরু করে বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। এ চুক্তির সকল দিক রাষ্ট্রীয় ও শারি'আহ আইন অনুযায়ী বৈধ হতে হবে নতুবা ঐ চুক্তির ফলস্বরূপ প্রাপ্ত আয় হালাল হবে না। এ ছাড়া সম্মত শর্তাদি চুক্তিতে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না হলেও ভবিষ্যতে ভুল বুঝাবুঝি ও ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে। তাই চুক্তির ব্যাপারে আল্লাহতা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়; লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না। যেমন আল্লাহ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর উহার কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের উপর তোমরা রাযি তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে, যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করাইয়া দিবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হইবে তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে। ইহা ছোট হউক অথবা বড় হউক, মেয়াদসহ লিখিতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হইও না। আল্লাহর নিকট ইহা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান কর তাহা তোমরা না লিখিলে কোন দোষ নাই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে ইহা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত। যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখিবে। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করিলে, যাহাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না, যে কেহ উহা গোপন করে অবশ্যই তাহার অন্তর পাপী। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা সবিশেষ অবহিত।'[২০৩]

উপরোক্ত আয়াত দুটি বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা হলো–

১. যে কোন ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ও আর্থিক লেনদেনের শর্তাবলী লিখিত হওয়া উচিত। কারণ, সকল মানুষের স্মৃতি প্রখর থাকে না। এ ছাড়া অসৎ উদ্দেশ্যে মানুষ অনেক সময় মিথ্যা বলে। তাই ভবিষ্যতে যাতে কোন বিরোধ সৃষ্টি না হয় সে জন্য চুক্তি সঠিকভাবে লিখিত হতে হবে।
২. দ্বিতীয়ত যারা চুক্তি লিখতে পারে তাদেরকে অবশ্যই তা লিখে দিতে হবে। কোন রকম অস্বীকার করা যাবে না।
৩. দেনাদার অথবা তার অভিভাবক বা উপযুক্ত প্রতিনিধি চুক্তির বিষয়বস্তু বলে দিয়ে লেখাবে। কারণ, এটা হচ্ছে তার অঙ্গীকার। সে ন্যায়ত সব কিছু লেখাবে। দেনার পরিমাণ, পরিশোধের মেয়াদ ইত্যাদিতে কোনরূপ অসৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না।

---

২০৩. আল কুরআন, ২ : ২৮২-২৮৩

৪. চুক্তিপত্রে সাক্ষীর সামনে হতে হবে। সাক্ষী হবে পুরুষের মধ্য থেকে কমপক্ষে দুইজন। আর যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায় তবে কমপক্ষে একজন পুরুষ এবং দুইজন নারী সাক্ষী থাকতে হবে। স্বীকৃতিস্বরূপ সাক্ষীগণের স্বাক্ষর নিতে হবে।
৫. কোন কারণে লিখিত চুক্তি করা এবং সাক্ষী রাখা সম্ভব না হলে বিশ্বস্ততার জন্য কোন জিনিস বন্ধক রাখতে হবে।
৬. সাক্ষ্য গোপন করা যাবে না এবং সাক্ষীদের ও লেখককে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না।[২০৪]

চুক্তি যেহেতু আল্লাহর হুকুম এবং ইসলামি ব্যাংকিং শারি'আহর কাছে দায়বদ্ধ। সুতরাং ইসলামি ব্যাংকসমূহ তাদের গ্রাহকদের সাথে যে সকল লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি করে থাকে তার শর্তাবলী অবশ্যই চুক্তিপত্রে লিখে রাখতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন ফরম ব্যবহার করে থাকে। যদি বাস্তব ক্ষেত্রে লেনদেনের সময় এ সকল ফরম যথাযথভাবে পূরণ করা না হয়, যদি উভয় পক্ষ বা ব্যাংকের প্রতিনিধি ও সাক্ষীগণ যথাযথভাবে স্বাক্ষর না করে, তাহলে এমতাবস্থায় ইসলামি শারি'আহর নীতি অনুযায়ী সঠিক না হওয়ায় ইসলামি ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রম পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে। এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইসলামি ব্যাংকারদের যা করণীয় তা হলো–

১. চুক্তিপত্র পূরণে অনীহা না করে সাথে সাথে তা লিখে নিতে হবে।
২. চুক্তিপত্রের সকল বিষয় গ্রাহককে বুঝিয়ে তার অনুমতি নিয়ে সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে।
৩. চুক্তিপত্র গ্রাহকের অথবা তা প্রতিনিধির বোধগোম্য ভাষায় হতে হবে এবং গ্রাহক বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক উপযুক্ত সাক্ষীর সম্মুখে পঠিত হওয়ার পর কোন আপত্তি না থাকলে গ্রাহকের স্বাক্ষর নিতে হবে। ব্যাংকের প্রতিনিধি, লেখক ও সাক্ষীগণও যথাস্থানে স্বাক্ষর করবে।
৪. নির্দিষ্ট স্থানে চুক্তি সম্পাদনের তারিখ, স্থান, চুক্তির মেয়াদ, বিষয়বস্তু ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৫. চুক্তিটি নির্ধারিত স্থানে হিফাজত করতে হবে।
৬. কোন অবস্থাতেই চুক্তিবিহীন কোন লেনদেন করা যাবে না।
৭. অপূরণকৃত চুক্তিপত্রের ফরমের উপরে অথবা অলিখিত জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, কার্টিজ পেপার, কাগজ ইত্যাদির উপর গ্রাহকের স্বাক্ষর রাখা যাবে না। এটা শারি'আতের পরিপন্থী এবং জঘন্য অপরাধ।
৮. ব্যাংকসমূহ একটি লেনদেনের জন্য অনেক সময় একাধিক চুক্তিপত্রের ফরমে গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে থাকে, যার কোনটা পূরণকৃত আবার কোনটা অপূরণকৃত। এ ধরনের কাজও করা যাবে না।

---

২০৪. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব-প্রয়োগ-পদ্ধতি*(ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, এপ্রিল ২০০৪), পৃ. ১১২-১১৭

ইসলামি ব্যাংকিংয়ে ক্রয়-বিক্রয়

আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন।[২০৫] ক্রয়-বিক্রয়ের আরবি প্রতশব্দ বায়' অর্থাৎ বায়' হলো ক্রয়-বিক্রয় (Sale and Purchase)। বায়' (بيع) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়। একই শব্দের দু'টি বিপরীতমুখী অর্থ বলে মনে হয়। আসলে ক্রয়-বিক্রয় একটি কাজ– একজনের যা বিক্রয়, আরেক জনের তা-ই ক্রয়। ক্রয় ছাড়া বিক্রয় হয় না, আর বিক্রয় ছাড়া ক্রয় হয় না। এছাড়া প্রত্যেক ক্রেতাই একজন বিক্রেতা, আর প্রত্যেক বিক্রেতাও একজন ক্রেতা। যিনি আমের বিক্রেতা, তিনি টাকার ক্রেতা, আর যিনি আমের ক্রেতা তিনি টাকার বিক্রেতা। ক্রয়-বিক্রয় দু'টি শব্দ হলেও কাজ একটাই। তাই বায়'-এর এক অর্থ ব্যবসাও বলা হয়ে থাকে।

আল কুরআনে আল্লাহতা'আলা বলেছেন, 'আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।'[২০৬] এ থেকে বুঝা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয় আসলে দু'টি পণ্যের বিনিময়কে বুঝায়, যেখানে একটি পণ্য নিয়ে আরেকটি পণ্য প্রদান করা হয়। ফকিহগণ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁরা বায়'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং এর বিস্তারিত শর্তাবলী উল্লেখ করেছেন। এখানে বায়'-এর কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো–

ক. বায়' শব্দটি আরবি পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা।

খ. বায়' হচ্ছে এক জিনিসের সাথে অন্য জিনিসের বিনিময়। দাম বা মূল্যের সাথে কোন পণ্য বিনিময় করাকেই বায়' বলা হয়। এক্ষেত্রে একদিকে পণ্য অপরদিকে থাকে তার দাম/মূল্য হিসেবে অর্থ।

গ. কোন কোন ফকিহ্ বলেছেন, কোনো জিনিস বা দামের বিনিময়ে অন্য কোন পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করাই হচ্ছে বায়'-এর অর্থ।

ঘ. বিকল্প গ্রহণের বিনিময়ে কোনো পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করা হচ্ছে বায়'।

ঙ. ক্ষতিপূরণ প্রদান করে কোনো জিনিসের মালিকানা অর্জন করা অথবা কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্যের মালিকানা গ্রহণ করা হচ্ছে বায়'।

চ. বায়' দ্বারা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এক জিনিসের পরিবর্তে অন্য জিনিসের বিনিময়কে বুঝায় অথবা সমমূল্যের বিনিময়ে কোনো জিনিসের মালিকানা হস্তান্তর বুঝায়।

উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, বায়' হচ্ছে দু'টি জিনিসের মালিকানা বিনিময়। বলা যায়, বায়' হচ্ছে সমমূল্যের বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ করে জিনিস নেয়া। ইংরেজিতে একে বলা হয়, 'Exchange of counter value' ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দু'টি সমমূল্যের অর্থ এমনভাবে বিনিময় হয় যে, এর ফলে উভয়ের ক্ষতিপূরণ হয় এবং ক্রেতা-বিক্রেতা কারো অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। ক্রয়-বিক্রয়ের আগে তাদের অবস্থান যা ছিল, ক্রয়-বিক্রয়ের পরেও তা-ই থাকে।

বায়' মুরাবাহা (মুনাফায় বিক্রয়)

আরবি 'বাই' (بيع) অর্থ কেনা-বেচা ও 'রিবহুন' (ربح) লাভ, মুনাফা। মুরাবাহা (مرابحة) পরিভাষাটি আরবি 'রিবহুন' (ربح) শব্দমূল হতে উদ্ভূত باب مفاعلة-এর মাসদার। সহজ কথায় 'বায়' মুরাবাহা' (بيع المرابحة) হচ্ছে লাভে বা মুনাফায় বিক্রয় (Sale on Profit)।

---

২০৫. আল কুরআন, ২ : ২৭৫

২০৬. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. দ্র. আল কুরআন, ৯ : ১১১

ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 'মুরাবাহা' এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি, যার অধীনে ব্যাংক তার গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত মাল কিনে ক্রয়মূল্যের সাথে সম্মত লাভ যোগ করে তা সে গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে। গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করে মাল নিতে বাধ্য থাকেন।[২০৭]

ব্যবহারিক অর্থে বায়' মুরাবাহা হলো– 'প্রথম মূল্যের (ক্রয়মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা হস্তান্তর করাকে মুরাবাহা বলা হয়।'[২০৮]

ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) 'বায়' মুরাবাহা'র সংজ্ঞায় বলেছে,

> 'Murabaha is a contract between a buyer and a seller at a higher price than the original price at which the seller bought the goods as a financing technique, it involves the purchase by the seller (financier) of certain goods needed by the buyer and their re-sale to the buyer on cost-plus basis. Both the profit (mark-up) and the time of repayment (usually in installments) are specified in the initial contract.'[২০৯]

বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা AAOIFI বায়' মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলেছে,

> 'ক্রয়মূল্যের উপর উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রয় করাকে বায়' মুরাবাহা বলা হয়। এ লাভ বিক্রয়মূল্যের শতকরা হারে হতে পারে কিংবা 'থোক'-ও হতে পারে। ক্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়া এ লেনদেন সম্পন্ন হলে তাকে 'সাধারণ মুরাবাহা' (المرابحة العادية) বলা হয়। আর পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে কোন পণ্য ক্রয় করাকে 'ব্যাংকিং মুরাবাহা' (المرابحة المصرفية) বলা হয়।'[২১০]

---

২০৭. 'Bai-Murabaha may be defined as a contract between a Buyer and a Seller under which the Seller sells certain specific goods permissible under Islamic Shariah and the Law of the land to the Buyer at a cost plus agreed profit payable in cash or on any fixed future date in lump sum or by instalments. The profit marked-up may be fixed in lump sum or in percentage of the cost price of the goods.' `ª. Manual for Investment under Bai Murabaha Mode, IBBL, p. 1

২০৮. نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. দ্র. বুরহানুদ্দিন আবুল হাসান আলি ইবন আবি বকর আল ফারগানি আল-মারগিনানি, *আল-হিদায়া*, শেষ খণ্ড, পৃ. ৫৪

২০৯. 'বাই-মুরাবাহা হলো ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি যেখানে বিক্রেতা (অর্থায়নকারী) ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রয় করে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা অর্থায়ন কৌশল হিসেবে ক্রেতার প্রয়োজন অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে এবং 'মুনাফা সংযোজন' করে প্রকৃত ক্রয় মূল্যের চেয়ে উচ্চতর মূল্যে তা ক্রেতার কাছে বিক্রয় করে। চুক্তিতে লাভ (মার্ক-আপ) এবং মূল্য পরিশোধের সময় (সাধারণত কিস্তিতে) নির্ধারিত থাকে।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৩

২১০. 'Murabaha is selling a commodity as per the purchasing price with a defined and agreed profit mark-up. This mark-up may be a percentage of the selling price or a lump sum. This transaction may be concluded either without a prior promise to buy, in which case it is called an 'ordinary Murabaha', or with a prior promise to buy submitted by a person interested in acquiring goods through the institution, in which case it is called a 'banking Murabaha' i.e. Murabaha to the purchase orderer. This transaction is one of the trust-based contracts that depends on transparency as to the actual purchasing price or cost price in addition to common expenses.' দ্র. AAOIFI, শারী'আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্টার্ড নং-৮, মে ২০০২, পৃ. ১৩২

সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ 'বায়' মুরাবাহা'র সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

> بيع المْرابحة 'বায়' মুরাবাহা'(Bai-Murabaha) বলিতে এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তিকে বুঝাইবে, যাহার অধীনে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত মালামাল ক্রয় করিয়া ক্রয়মূল্যের সহিত উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত লাভ যুক্ত করিয়া তাহার নিকট বিক্রয় করিবে। বিনিয়োগ গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করিয়া মালামাল গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে। এই চুক্তিতে পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে।[২১১]

অতএব, নগদে অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে ক্রয়মুল্যের সাথে নির্ধারিত মুনাফা ধার্য করে নির্দিষ্ট পরিমাণ শারী'আহ্ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করাকেই বায়' মুরাবাহা বলে।[২১২] ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত লাভ যোগ করে কোন পণ্য বিক্রি করাই বায়' মুরাবাহা (بيع المْرابحة)। 'ক্রয়মূল্য ও তার উপর নির্ধারিত লাভ'-এ বিষয় দু'টিই বায়' মুরাবাহার মূল কথা। অর্থাৎ, কোন পণ্য যে দামে ক্রয় করা হয়েছে, সে পণ্যটি কারো কাছে বিক্রয়কালে যদি উক্ত ক্রয়মূল্যের সাথে নির্ধারিত লাভ যোগ করা হয়, তবে তাকে বায়' মুরাবাহা বলা হয়।

ব্যাংকিং বিনিয়োগে বায়' মুরাবাহার বৈশিষ্ট্য

১. ব্যাংকিং কারবারে বায়' মুরাবাহার তিনটি পক্ষ থাকে। ক. ব্যাংক (অর্থায়নকারী) খ. বিক্রেতা (যার কাছ থেকে প্রথমবার মাল ক্রয় করা হয়) গ. ক্রেতা বা বিনিয়োগ গ্রাহক (যার কাছে ব্যাংক মাল বিক্রয় করে)।

২. গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের পূর্বে বাজারে সে মালের কাটতি, মূল্য, সম্ভাব্য মুনাফা ইত্যাদি ব্যাপারে সতর্কতার সাথে যাচাই করে দেখা ব্যাংকের দায়িত্ব।

৩. বিনিয়োগ প্রস্তাব বিবেচনার সময় ব্যাংক গ্রাহকের ব্যবসায়িক যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা, বাজারে তাঁর সুনাম ইত্যাদির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়।

৪. পণ্যের দাম ও লাভের অংক ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহক উভয়েরই জানা থাকা মুরাবাহা পদ্ধতির একটি শর্ত।

৫. পণ্যের প্রকৃত কেনা দামের সাথে পরিবহণ ও আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করে নীট ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক এ নীট ক্রয়মূল্যের উপর সম্মত লাভ যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে।

৬. ব্যাংক মাল রাখার জন্য গুদাম ভাড়া, গুদাম কর্মচারীদের বেতন, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি খরচ গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করে।

৭. ব্যাংক একই ধরনের অতিরিক্ত মাল গ্রাহকের কাছ থেকে জামানাত নিতে পারে।

---

২১১. উদ্ধৃত : মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৪

২১২. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৮. বিনিয়োগকৃত পণ্যের মালিকানা গ্রাহকের কাছে ন্যস্ত হয়।
৯. ব্যাংক প্রয়োজনে গ্রাহকের কাছ থেকে সহায়ক জামানাত নিতে পারে।
১০. গ্রাহক সম্পূর্ণ দাম শোধ করে সব মাল একসাথে নিতে পারেন বা কিস্তিতে আনুপাতিক দাম দিয়ে আংশিক মাল নিতে পারেন।
১১. চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্যের সরবরাহ নিতে ও দাম শোধ করতে বাধ্য থাকেন।
১২. বিক্রয়-চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর শর্তের কোন পরিবর্তন করা যায় না।

বায়‘ মুআজ্জাল (বাকিতে বিক্রয়)

আরবি বায়‘ (بيع) অর্থ কেনা-বেচা ও আজল (أجل) অর্থ বিলম্ব, বাকি, নির্ধারিত সময়। মুয়াজ্জাল (مؤجل) শব্দটি আরবি আজল (أجل) শব্দমূল হতে উদ্ভুত ইসমে মাফউলের (اسم مفعول) এর শব্দরূপ। অতএব, বায়‘ মুয়াজ্জাল (البيع المؤجل) অর্থ বিলম্বিত, বিলম্বে পরিশোধযোগ্য, বাকি অথবা নগদের বিপরীতে ক্রয়-বিক্রয়। ইসলামি শারি‘আতের ব্যবহারিক অর্থে- ‘বায়‘ মুয়াজ্জাল হলো এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বাকিতে পরিশোধ করা হয়।’[২১৩]

> ‘বায়‘ মুয়াজ্জাল’ বলতে ব্যাংক কর্তৃক মুনাফার উদ্দেশ্যে গ্রাহকের নিকট বাকিতে মাল বেচাকে বুঝায়। ব্যাংক পণ্য কিনে তার উপর মালিকানা নিশ্চিত করার পর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সে পণ্য সরবরাহ করে। চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, পণ্য সরবরাহের স্থান ও সময়, দাম পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।[২১৪]

সেন্ট্রাল শারী‘আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত ‘(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন’-এ ‘বায়‘ মুয়াজ্জালের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

> البيع المؤجل ‘বায়‘ মুয়াজ্জাল’ (Bai-Muajjal) বলিতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পাদিত এমন এক বিক্রয় চুক্তিকে বুঝাইবে, যেখানে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোন পণ্য উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহকের নিকট বাকিতে বিক্রয় করা হইবে। এই চুক্তিতে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্য প্রকাশ করিতে বাধ্য নহে।[২১৫]

অতএব ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মত মূল্য পরিশোধের শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ শারি‘আহ্ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী বাকিতে বিক্রয় করাকে বায়‘ মুয়াজ্জাল বলে।[২১৬]

---

২১৩. البيع المؤجل هو الذي فيه يكون المبيع معجلا والثمن مؤجلا. দ্র. আলী হায়দার আমীন আফিন্দি, *দুরারুল হুক্কাম ফি ইলমিল আহকাম*(বৈরুত : ১ম মুদ্রণ, ১৯৬৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪; দ্র. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শাসসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী‘আহর নীতিমালা*, প্রাগুক্ত পৃ. ৬২

২১৪. Bai-Muajjal may be defined as a contract between a Buyer and a Seller under which the Seller sells certain specific goods (permissible under Shariah and Law of the Country), to the Buyer at an agreed fixed price payable at a certain fixed future date in lump sum or within a fixed period by fixed instalments. The seller may also sell the goods purchased by him as per order and specification of the Buyer. `a. Manual for Investment under Bai Muajjal Mode, IBBL, p. 1

২১৫. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৫

২১৬. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

ব্যাংকিং বিনিয়োগে বায়' মুআজ্জালের বৈশিষ্ট্য

১. ব্যাংকিং কারবারে বায়' মুয়াজ্জালের তিনটি পক্ষ থাকে। ক. ব্যাংক (অর্থায়নকারী) খ. বিক্রেতা (মালের মূল সরবরাহকারী) গ. ক্রেতা বা বিনিয়োগ গ্রাহক।[২১৭]
২. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধে কৃষি ও শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ, ভোগ্যপণ্য ও মাল কিনে তা গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রয় করে।
৩. গ্রাহক চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালের মূল্য পরিশোধ করেন।
৪. ব্যাংক পণ্য কিনে তাতে মালিকানা নিশ্চিত করে চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সে পণ্য সরবরাহ করে।
৫. চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, সরবরাহের স্থান ও সময়, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।
৬. বায়' মুয়াজ্জাল বিনিয়োগে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে পণ্যের ক্রয়মূল্য প্রকাশ করতে বাধ্য নয়।
৭. ব্যাংক ও গ্রাহক উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হয়। পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হওয়ার পর তা পরিবর্তন করা যায় না।
৮. ব্যাংক এ বিনিয়োগ নিরাপদ করতে গ্রাহকের কাছ থেকে সহায়ক জামানাত নিয়ে থাকে।
৯. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রাহক পণ্যের দাম শোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করতে পারে না। তবে গ্রাহকের কাছ থেকে শর্তানুযায়ী ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে। আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ ব্যাংক নিজের আয়রূপে গণ্য করে না। শারি'আহ্ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত কোন জনহিতকর কাজে সে অর্থ ব্যয় করা হয়।
১০. বিক্রয়-চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর শর্তের কোন পরিবর্তন করা যায় না।

বায়' সালাম (অগ্রিম ক্রয়)

আরবি বায়' (بيع) অর্থ কেনা-বেচা। সালাম (سلم) অর্থ আগাম, সমর্পণ করা, ধার নেয়া। বায়' সালাম (بيع السلم) হলো 'আগাম কেনা-বেচা'। আরবি অভিধানে বায়' সালাম (بيع السلم)-এর অর্থ হচ্ছে অগ্রিম ক্রয়। বায়' সালামের আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে বায়' সালাফ (بيع السلف)। বায়' সালাম (بيع السلم) হচ্ছে হিজাযে প্রচলিত পরিভাষা। অর্থাৎ ইরাকিরা যাকে বলে বায়' সালাফ (بيع السلف), হিজাযিরা তাকেই বায়' সালাম (بيع السلم) বলে।[২১৮]

অভিধানে সালাম (سلم) অর্থ সমর্পণ করা, ধার করা, আগাম নেয়া এবং সালাফ (سلف) অর্থ পেশ করা, অগ্রিম প্রদান করা। চুক্তির মজলিসেই পণ্যের মূল্য বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা হয় বলে একে বায়' সালাম (بيع السلم) বলা হয়। অনুরূপভাবে পণ্যের মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম প্রদান করা হয় বলে একে বায়' সালাফ (بيع السلف) বলা হয়।

---

২১৭. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শাসসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্‌র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত পৃ. ৬৫

২১৮. আসসাইয়িদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ* (فقه السنة) (বৈরুত : ৩য় খণ্ড, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৭১), পৃ. ১২২; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্‌র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; AAOIFI, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

ইসলামি শারি'আতের ব্যবহারিক ও পারিভাষিক অর্থে বায়' সালাম হলো, 'অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকে বায়' সালাম বলে।'[২১৯]

বায়' সালামের ক্ষেত্রে মালামালের মূল্য হিসাবে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থকে বলা হয় সালামের মূলধন رأس مال السلم (রা'সু মালিস সালাম)। নির্দিষ্ট সময়ান্তে সরবরাহযোগ্য পণ্যকে বলা হয় আল মুসলামু ফিহি (المسلم فيه)। ক্রেতাকে বলা হয় মুসলিম (المسلِم) এবং বিক্রেতাকে বলা হয় (المسلَم إليه) (আল মুসলামু ইলাইহি)।[২২০]

ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরিভাষায়, 'বায়' সালাম এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি যার আওতায় আগামী কোন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহের শর্তে ব্যাংক মালের দাম আগাম পরিশোধ করে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য সরবরাহ নিয়ে তা যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে কাছে বিক্রয় করতে পারে।'[২২১]

সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ 'বায়'-সালামের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

> **البيع السلم** 'বায়' সালাম' (Bai-Salam) বলিতে এমন এক ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিকে বুঝাইবে, যেখানে ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য/মালামাল সরবরাহ করিবার শর্তে ব্যাংক গ্রাহকের সহিত তাহার সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য আগাম পরিশোধ করিবে। এই চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, ধরন, সরবরাহের স্থান ও সময় উল্লেখ করিতে হইবে।[২২২]

অতএব ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক সম্মত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শারি'আহ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী অগ্রিম ক্রয় করাকে বায়' সালাম বলে।[২২৩]

ব্যাংকিং বিনিয়োগে বায়' সালামের বৈশিষ্ট্য

১. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সাধারণত কৃষি ও শিল্পপণ্য আগাম ক্রয় করে।
২. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক হচ্ছে ক্রেতা ও গ্রাহক হচ্ছে বিক্রেতা।
৩. ব্যাংক এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের পর গ্রাহককে মালের আগাম মূল্য বাবদ অর্থ (সালাম মূলধন) যোগান দেয়।

---

২১৯. البيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل দ্র. AAOIFI, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

২২০. বায়' সালাম (بيع السلم), মারকাযুল ইকতিসাদ আল ইসলামী আততাবি' লিলমাছরিফুল ইসলামী আদদুয়ালী লিল ইসতিসমারি ওয়াত্ তানমিয়াহ, ইদারাতুল বুহুছ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ১৫; দ্র. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

২২১. Manual for Investment under Bai al-Salam Mode, IBBL, p. 1

২২২. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৭-১৪৮

২২৩. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৪. চুক্তির সময় ব্যাংক গ্রাহকের সম্মতির ভিত্তিতে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
৫. চুক্তির সময় পণ্যের মান, শ্রেণি, পরিমাণ, সরবরাহের স্থান, সময় ও ধরন স্থির করা হয়।
৬. চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহ করেন।
৭. পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে বিক্রেতা আগাম নেয়া দাম ফেরত দিবেন।
৮. ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য সরবরাহ নিয়ে তা যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করতে পারে।
৯. ব্যাংক সময় মতো যথাযথ পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে সহায়ক জামানাত নিতে পারে।

ইসতিসনা' বা আদেশের ভিত্তিতে ক্রয়

ইসতিসনা' (استصناع) শব্দটি আরবি সানউন (صنع) শব্দমূল হতে উদ্ভূত বাবে ইসতিফ'আল (استفعال) এর মাসদার। ইসতিসনা' শব্দের অর্থ কোন উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করে বিক্রি করা।[২২৪]
ইসতিসনা' হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী ক্রেতার নির্দেশে বিক্রেতা কোন বস্তু তৈরি করে দেয়ার অঙ্গীকার করে।[২২৫]

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) 'ইসতিসনা'র সংজ্ঞায় বলেছে-

> 'Istisna is a contract for manufacturing (or construction) whereby the manufacturer (seller) agree to provide the buyer with goods identified by description after they have been manufactured/ constructed in conformity with that description within a certain time and for an agreed price.'[২২৬]

সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ 'ইসতিসনা'র সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

> إستصناع "ইসতিসনা" (Istisnaa) বলিতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত এমন চুক্তিকে বুঝাইবে, যাহতে ক্রেতা কর্তৃক নির্দেশিত বস্তু বিক্রেতা কর্তৃক তৈয়ারি করিয়া সরবরাহ করিবার অঙ্গীকার থাকে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন কারিগর বা কারখানার মালিকের নিকট তাহার উদ্দিষ্ট দ্রব্য নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কারিগর বা মালিক উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ইসতিসনা' চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে কাঙ্খিত পণ্যের মূল্য, ধরন, শ্রেণি, পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, মূল্য পরিশোধের প্রক্রিয়া, পণ্য সরবরাহের সস্থান, সময় ও বহন খরচ ইত্যাদির বিস্তারিত

---

২২৪. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
২২৫. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৮
২২৬. 'ইসতিসনা' হলো উৎপাদনের (বা নির্মাণের) এমন এক চুক্তি যেখানে উৎপাদনকারী (বিক্রেতা) নির্দিষ্ট বিবরণ অনুযায়ী কোন পণ্য তৈরি করে তা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত দামে ক্রেতাকে সরবরাহ করতে হয়।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৯

বিবরণ থাকিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে পণ্যের আংশিক বা পূর্ণ মূল্য আগাম প্রদান করা যাইতে পারে।[২২৭]

বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা AAOIFI 'ইসতিসনা'র সংজ্ঞায় বলেছে–

> 'Istisna'a is a contract of sale of specified items to be manufactured or constructed, with an obligation on the part of the manufacturer or builder (contractor) to deliver them to the customer upon completion.'[২২৮]

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার চাহিদামতো কোন দ্রব্য নির্ধারিত দামের বিনিময়ে তৈরি করে দিতে কোন কারিগর বা কারখানা-মালিকের নিকট প্রস্তাব করলে এবং কারিগর বা মালিক ঐ প্রস্তাবে রাজি হলে 'ইসতিসনা' চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে আদেশদাতাকে বলা হয় 'মুসতাসনি'। আদেশগ্রহীতা হলেন 'সানি'। আদেশের মাধ্যমে তৈরি পণ্যকে 'মাসনু' বলা হয়।

অর্ডারের বিপরীতে নির্মাণ বা তৈরি করা হয় এমন জিনিস নির্মাণ বা তৈরি করে দিতে আদেষ্টা আদেশ দিলে এবং আদিষ্ট তাতে সম্মত হলে তা 'ইসতিসনা' চুক্তি হবে। আজল বা মেয়াদ নির্ধারণ করা 'ইসতিসনা' চুক্তিতে জরুরি নয়। তবে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে বিরোধ এড়াতে মেয়াদ নির্ধারণ করা উত্তম।

অতএব, অগ্রিম অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মত মূল্যে পরিশোধের শর্তে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ শারী'আহ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী তৈরি করে বিক্রয় করাকে অথবা মূল্য পরিশোধের উপরোক্ত শর্তানুযায়ী কোনো উৎপাদনকারি/বিক্রেতার কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ফরমায়েশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করাকে ইসতিসনা' বলে।[২২৯]

ব্যাংকিং বিনিয়োগে ইসতিসনা'র বৈশিষ্ট্য

১. 'ইসতিসনা' চুক্তিতে পণ্যের স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকতে হবে। পণ্যের ধরন, শ্রেণি, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য চুক্তিতে উল্লেখ করা জরুরি। এর ফলে পরবর্তীতে কোন ভুল বুঝাবুঝি বা বিবাদ এড়ানো সম্ভব হয়।

২. চুক্তিতে সম্মত দাম উল্লেখ করতে হবে। দাম কখন কিভাবে পরিশোধ করা হবে তাও চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে।

৩. পণ্য কখন, কোথায়, কার খরচে সরবরাহ করা হবে তার উল্লেখ চুক্তিতে থাকতে হবে।

৪. পক্ষগণ রাজি হলে বিক্রেতাকে পণ্যের আংশিক বা পুরো দাম আগাম দেয়া যেতে পারে অথবা বাকিও রাখা যেতে পারে।

৫. 'ইসতিসনা' চুক্তিতে মাল সরবরাহের সময়সীমা নির্ধারণ জরুরি নয়। মেয়াদ নির্ধারণ না করেও ইসতিসনা চুক্তি করা যায়। তবে বিরোধ এড়ানোর জন্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারিত করা উত্তম।

---

২২৭. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা,* প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৯

২২৮. 'ইসতিসনা' হলো কোনো নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন বা নির্মাণ করে বিক্রয়ের চুক্তি, যাতে উৎপাদনকারী বা নির্মাতা (কনট্রাকটর) কর্তৃক উক্ত পণ্য তৈরি করে বা নির্মাণের পর গ্রাহককে সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা থাকে।' দ্র. AAOIFI, শারী'আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্টার্ড নং-১১, ২০০৪-২০০৫, পৃ. ১৯৫

২২৯. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব ● প্রয়োগ ● পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৬. চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পণ্যের পূর্ণ বা আংশিক দাম শোধ হওয়ার পর কোন পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারবেন না।

৭. কোন পক্ষ ইচ্ছাকৃত চুক্তি ভঙ্গ করলে দায়ি পক্ষের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ জরিমানা আরোপ করা যাবে, এরূপ শর্ত ইসতিসনা' চুক্তিতে রাখা যাবে।

৮. সমকালীন ফকিহগণের মতে ইসতিসনার ক্ষেত্রে আরোপিত ক্ষতিপূরণ ব্যাংকের বৈধ আয়রূপে বিবেচিত হবে।

ইসলামি ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন খাত থেকে চুক্তির মাধ্যমে সঞ্চয় সংগ্রহ করে তা আবার চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন খাতের প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকসমূহ তাদের শাখার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। যে সব উদ্যোক্তা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করতে আগ্রহী তারা ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। যে সব শিক্ষিত, দক্ষ, আধা-দক্ষ বেকার যুবক প্রয়োজনীয় অর্থ ও জামানতের অভাবে তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে পারছেন না তাদের নতুন কর্ম সৃষ্টিতে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংক এ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, শিক্ষিত বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ বেকার জনশক্তিকে স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন পণ্য তৈরির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহজ নিয়ম ও সহজ শর্ত সাপেক্ষে ব্যাংক এ বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ প্রদানের উদ্দেশ্যে হল–[২৩০]

১. অর্থের যোগান দিয়ে নতুন শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করে আয়বর্ধনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২. শিক্ষিত, কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ উদ্যোক্তাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা।

৩. ওয়েজ আর্নারদেরকে কষ্টার্জিত অর্থ সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা।

৪. শিক্ষিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উৎসাহী বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ পূর্বক পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামি ব্যাংকসমূহ শারি'আহ মুতাবিক পরিচালিত বিধায় এর চুক্তি, ক্রয়-বিক্রয়, বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতিসমূহও কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে আবর্তিত ও পরিচালিত। কল্যাণমুখী নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভুত অবদান রেখে চলেছে।

---

২৩০. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশ পরিচিতি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশ পরিচিতি

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম দেশ। ১৯৭১ সালে ৯ মাস ব্যাপী এক বিশাল রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে উদার চেতনাকে বক্ষে ধারণ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশ একটা মুসলিম অধ্যুষিত দেশ এবং এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম। বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। এদেশের মানুষ ইসলামি সাংস্কৃতি ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী অতি প্রাচীন কাল থেকে। বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করে।[১] ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন অবস্থিত হওয়ায় ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে রয়েছে বিস্তীর্ণ জলাধার বঙ্গোপসাগর। যৌক্তিক কারণেই চট্টগ্রামে ও মংলায় দু'টো সমুদ্রবন্দর স্থাপিত হয়েছে। ফলে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যিক মালামাল নৌপথে পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের একটি যোগসূত্র রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান পরিচিতির বর্ণনা উপস্থাপিত হল–

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

বাংলাদেশ ২০°৩৪ হতে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশে[২] এবং ৮৮°০১ হতে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমায়[৩] অবস্থিত। ১৪৭৫৭০ বর্গকি.মি. বা ৫৬৯৭৭ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আবাস।[৪] বাংলাদেশের প্রমাণ সময় (জিএমটি) +৬ ঘন্টা।[৫] ভারতের সাথে মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কি.মি.। মিয়ানমারের সাথে মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ২৮৩

---

১. এডভোকেট মোঃ কাওসার হোসাইন, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*(ঢাকা : মুহিত পাবলিকেশন্স,২০১৫), পৃ. ৩

২. 'বিষুবরেখা হতে যে কোন দূরত্বে যে কোন কোণ অঙ্কন করা যায়। এরূপে কোন স্থান বিষুবরেখার সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে ঐ স্থানের অক্ষাংশ বলে।' দ্র. খান মুহাম্মদ সালেক, *ইসলামী ভূগোল*(ঢাকা : মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯৯), পৃ. ৪২

৩. 'লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে গ্রীনিচের উপর দিয়ে সুমেরু হতে কুমেরু বিন্দু পর্যন্ত একটি কাল্পনিক অর্ধবৃত্ত রয়েছে। এটাকে প্রধান দ্রাঘিমা রেখা বলা হয়। প্রধান দ্রাঘিমা রেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের দ্রাঘিমাংশ বলে।' দ্র. খান মুহাম্মদ সালেক, প্রাগুক্ত, *ইসলামী ভূগোল*, পৃ. ৪৪-৪৫

৪. *Bangladesh Economic Review 2016*, Economic Adviser's Wing, Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh(Dhaka : Bangladesh Government Press, November 2016), p. xxxi

৫. *Bangladesh Economic Review 2016*, Ibid, p. xxxi

কি.মি.। সমুদ্র উপকূলের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৭১১ কি.মি.। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা যার অপর নাম কর্কটক্রান্তি বা ট্রপিক অব ক্যান্সার। বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত সংযোগ রয়েছে ভারত ও মিয়ানমারের। বাংলাদেশ থেকে ফারাক্কা বাঁধের দূরত্ব ১৬.৫ কি.মি. বা ১১ মাইল। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ৩৭০ কি.মি. বা ২০০ নটিক্যাল মাইল।[৬] বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল বা ২২.২২ কি.মি.।[৭] বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে ৫টি রাজ্যের। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে ৩টি জেলার। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার-এর। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সীমানা রয়েছে রাঙামাটি জেলার। ভারতের সাথে সীমান্ত নেই বাংলাদেশের বরিশাল বিভাগের।

ভারতের অধিকাংশ ছিটমহল বাংলাদেশের লালমানিরহাট জেলায়। বাংলাদেশের ছিটমহলগুলোর সবকটিই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলায়। ভারত বাংলাদেশের জন্য তিনবিঘা করিডোর খুলে দেয় ২৬ জুন ১৯৯২ সালে। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের স্থান বা দ্বীপ হলো ছেঁড়া দ্বীপ, সর্বপূর্বের স্থান আখাইনঠং, সর্ব পশ্চিমের স্থান মনাকশা, সর্ব উত্তরের উপজেলার নাম তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, সর্ব দক্ষিণের উপজেলার নাম টেকনাফ, কক্সবাজার। সর্ব দক্ষিণের জেলা হল কক্সবাজার ও সর্ব উত্তরের জেলা হল পঞ্চগড়। আয়তনে বড় বিভাগ হল চট্টগ্রাম ও ছোট বিভাগ সিলেট। আয়তনে বড় জেলা রাঙামাটি ও ছোট জেলা নারায়ণগঞ্জ (যা পূর্বে ছিল মেহেরপুর)। জনসংখ্যায় বড় বিভাগ ঢাকা ও ছোট বিভাগ বরিশাল। জনসংখ্যায় বড় জেলা ঢাকা ও ছোট জেলা বান্দরবান। আয়তনে বৃহত্তম উপজেলা সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও ক্ষুদ্রতম উপজেলা নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর। জনসংখ্যায় বৃহত্তম উপজেলা গাজীপুর সদর (গাজীপুর জেলা) ও ক্ষুদ্রতম উপজেলা থানচি (বান্দরবান জেলা)। আয়তনে বৃহত্তম থানা শ্যামনগর (সাতক্ষীরা জেলা) ও ক্ষুদ্রতম থানা হল ওয়ারি (ঢাকা জেলা)। আয়তনে বৃহত্তম পৌরসভা হল বগুড়া পৌরসভা ও ক্ষুদ্রতম পৌরসভা ভেদরগঞ্জ (শরিয়তপুর জেলা)। জনসংখ্যায় বৃহত্তম পৌরসভা বগুড়া সদর। আয়তনে বৃহত্তম ইউনিয়ন সাজেক (রাঙামাটি জেলা) ও ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন হাজীপুর (ভোলা)। জনসংখ্যায় বৃহত্তম ইউনিয়ন থামসানী (সাভার উপজেলা) ও ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন হাজীপুর (ভোলা)।

বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা; যাকে মসজিদের শহর বলা হয়। বাংলাদেশকে ৮টা বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিভাগগুলো হলো– ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ। এখানে রয়েছে ৬৪টা জিলা ও ৪৮৮টা উপজিলা। এছাড়া প্রধান নদীসমূহ হচ্ছে– পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, কর্ণফুলি, তিস্তা, শীতলক্ষ্যা, রূপসা, মধুমতি, গড়াই, মহানন্দা।[৮]

---

৬. ফ্রান্স ভিত্তিক Bureau international des poids et mesures প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত হিসেব অনুযায়ী ১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২০০ কি.মি. বা ১.১৫০৭৮ মাইল।

৭. সিরাজুল ইসলামের সম্পাদনায়, *বাংলাপিডিয়া*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৪), খ.৬, পৃ. ৩৭৭

৮. ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*(ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, সেপ্টেম্বর ২০০৬), পৃ. ২০-২৪

দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার জন্য নিম্নে বাংলাদেশের মানচিত্র উপস্থাপিত হলো–

বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর ২টি। ১. চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, ২. মংলা সমুদ্রবন্দর।[৯]

১. **চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর :** বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। এটা ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৮৮ সালে। বন্দরটি কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত। এটা বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার। এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯২% পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বার্ষিক আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি গড়ে ১২ থেকে ১৪% চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের সুবাদে অর্জিত হচ্ছে। গত দু'টি অর্থ বছর ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ যথাক্রমে

---

৯. *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০

২১৩৬ ও ২২৯৪ টি জাহাজ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দিয়ে প্রবেশ করেছে। নিচের সারণিতে ২০০৫-২০০৬ থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হল।[১০]

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/লোকসান
২০০৫-০৬	১৩৪.০৫	৮৫.৫৭	৪৮.৩২
২০০৬-০৭	১৪৭.৫৪	৯৯.১০	৪৮.৪৪
২০০৭-০৮	১৬০.৮৬	১১০.২৩	৪৭.৭৪
২০০৮-০৯	১৭০.৫৪	১২৯.৩৮	৪১.১৭
২০০৯-১০	১৯০.৩৩	১৫৯.৬৯	৪৯.০৫
২০১০-১১	২০৬.৬৭	১৫৫.২০	৫৮.১৭
২০১১-১২	২২৬.০০	২০১.৭৪	৪৬.২০
২০১২-১৩	২৭২.১৪	১৯০.৬৩	৮১.৫১
২০১৩-১৪	২৮৭.২৪	২০৪.৪২	৮২.৮২
২০১৪-১৫	৩২৬.২৮	২২৮.৬৩	৯৭.৬৫

২. **মংলা সমুদ্রবন্দর :** এ বন্দরটি ১৯৫০ সালে বর্তমান বাগেরহাট জেলায় পশুর নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত বন্দর হিসেবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মংলার বিশেষ পরিচিতি রয়েছে।[১১] এ বন্দরে ৩৫,৭৫২ বর্গমিটার এলাকায় বিস্তৃত ৩টি কন্টেইনার ইয়ার্ডে এক উচ্চতায় ২,১৮০টি ইউজ কন্টেইনার সংরক্ষণ এবং এবং ৪টি ট্রানজিট শেড ও ২টি ওয়ারহাউজে ৩৩,২৫৮ মেট্রিক টন কার্গো গুদামজাত করণের সুবিধা রয়েছে। বিদ্যমান সুবিধায় মংলা বন্দর দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং নেপাল ও ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বাণিজ্য সেবা প্রদান করতে সক্ষম। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এ বন্দর দিয়ে মোট ৪৫.০ লক্ষ মেট্রিক টন পণ্য, ৪২,১৩৭টি ইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়েছে এবং ১৭০.৭০ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। নিচের সারণিতে ২০০৫-২০০৬ থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর পর্যন্ত মংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হল।[১২]

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/লোকসান
২০০৫-০৬	৪৭.২৫	৫৬.৬৪	(-) ৯.৪০
২০০৬-০৭	৪৯.৩৪	৫৫.৫৩	(-) ৬.১৯
২০০৭-০৮	৪৭.৭০	৪৭.৬৫	০.৪৫
২০০৮-০৯	৫৮.৪০	৫৫.৪২	২.৯৮
২০০৯-১০	৬৬.৪৯	৬৪.২২	২.২৭
২০১০-১১	৮১.০৩	৭১.১১	৯.৯২
২০১১-১২	১০৫.৮১	৭১.৬৬	৩৪.১৫
২০১২-১৩	১৩৮.০৭	৯৪.১২	৪৩.৯৫
২০১৩-১৪	১৪৫.২৯	৯৭.১৯	৪৮.০৯
২০১৪-১৫	১৭০.৭০	১১০.৫৭	৬০.১৩

১০. *Bangladesh Economic Review 2016*, Ibid, p. 158

১১. Ibid, p. 159

১২. Ibid.

বাংলাদেশের স্থলবন্দরসমূহ

১.	বেনাপোল	: শার্শা, যশোর। এটা বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর।
২.	হিলি	: দিনাজপুর। এটা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর।
৩.	বাংলাবান্ধা	: এটা তেতুলিয়ায় অবস্থিত।
৪.	হাতিবান্ধা	: এটা লালমনিরহাট জেলায় অবস্থিত।
৫.	বিরল	: এটা দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত।
৬.	সোনা মসজিদ	: এটা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।
৭.	তামাবিল	: এটা সিলেট জেলায় অবস্থিত।
৮.	কসবা	: এটা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত।
৯.	হালুয়াঘাট	: এটা ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত।
১০.	বিবিরবাজার	: এটা কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত।
১১.	দর্শনা	: এটা চুয়াডাঙ্গা জেলায় অবস্থিত।
১২.	ভোমরা	: এটা সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত।
১৩.	বিলোনিয়া	: এটা ফেনী জেলায় অবস্থিত।
১৪.	টেকনাফ	: এটা কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত এবং মিয়ানমারের সাথে একমাত্র স্থলবন্দর।

বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহ :

১. শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।
২. ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।
৩. আমানত শাহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
৪. যশোর বিমানবন্দর।
৫. বরিশাল বিমানবন্দর।
৬. কক্সবাজার বিমানবন্দর।
৭. ঈশ্বরদি বিমানবন্দর।[১৩]

এছাড়াও দেশের উৎপাদিত পণ্য এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সহজে পরিবহণের জন্য বাংলাদেশে রয়েছে দীর্ঘ রেলপথ, নদীপথ ও সড়কপথ। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ইসলামি অর্থায়নের যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এর ভৌগোলিক অবস্থান ও বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ধর্মভীরু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এ এলাকায় সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকের প্রচুর সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজন কেবল বলিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার। তাহলেই সম্ভাবনাময় এদেশটা একদিন ইসলামি শারি'আহ-এর উদার নীতিমালা সম্বলিত পথ ও পদ্ধতির আলোকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি ব্যাংকের নৈতিক ও আর্থিক সেবার মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশের কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

---

১৩. *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা

বাংলাদেশের মানুষ বরাবরই ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি ভক্তি সহকারে আস্থাশীল। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আস্থার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এ দেশের মানুষের স্বাভাবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ। আলিম সমাজের বহুমুখী প্রচেষ্টায় এবং বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের সভা-সেমিনার থেকে এ দেশের মানুষ সুদের ক্ষতি ও পাপ সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। সুতরাং এ দেশের মানুষ সুদের প্রতি সর্বদা ঘৃণা প্রদর্শন করে; তারা সুদ বর্জন করতে বদ্ধপরিকর। সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক ধারণা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বিষোদাগারে রূপ নেয় এবং ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার জন্য সুপ্ত আকাঙ্খা তাদের মধ্যে ক্রমেই জাগ্রত হতে থাকে। মসজিদের ইমামগণের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। তারা দারস ও খুৎবায় সুদের ব্যাপারে বক্তব্য দিয়েছেন। ফলে সুদকে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে ঘৃণা করতে শিখেছে।

দীর্ঘকাল সুদের যাতাকলে নিস্পেষিত হওয়ার ফলে বহু জ্ঞানী-গুণী মানুষও ইসলামি শারি‘আহ্ মুতাবিক মসজিদ, মাদরাসা, মিলাদ মাহফিল চলতে পারে; কিন্তু অর্থব্যবস্থা তথা ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে– এ ধারণাকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ে তাদের বক্তব্য বরাবরই নেতিবাচক, তাচ্ছিল্যপূর্ণ ও উপহাসমূলক। ইসলামি ব্যাংকের সূচনালগ্নে তারা এর অস্তিত্বের প্রশ্নে সন্দেহ পোষণ করেছিল। তাদের সংশয় ছিল, আধুনিক কালের বিচারে নতুন ধরনের এ ব্যাংক টিকে থাকতে পারবে কিনা! তারা সুদসর্বস্ব ব্যাংকব্যবস্থা থেকে গৃহীত প্রচ্ছন্ন স্বার্থ খর্ব হতে দিতে চায়নি। ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার ভারসাম্যপূর্ণ কল্যাণমুখীতা তাদের পছন্দ নয়। ফলে তাদের উপহাসমূলক মন্তব্যগুলো ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিকদের গতি বিঘ্নিত করছিল। যদিও সে সব অপচেষ্টা ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকে স্থায়ীভাবে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই উপনিবেশ শাসনমুক্ত মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, সংহতি ও স্বার্থ সংরক্ষণ বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে চিন্তা করতে থাকেন। এ প্রেক্ষিতে তৎকালীন সাউদি বাদশাহ ফয়সাল ইবন আবদুল আযিযসহ মুসলিম বিশ্বের কল্যাণকামী রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তাবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত হয় ‘ওআইসি’। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এর নাম ছিল ‘Organization of Islamic Conference বা ইসলামি সম্মেলন সংস্থা’, পরবর্তীকালে ২০০৮ সালে পরিবর্তিত হয়ে ‘Organization of Islamic Countries’ এবং সর্বশেষ ২০১১ সালের ২৮ জুন তারিখে নাম পরিবর্তন করে ‘Organization of Islamic Cooperation’ বা ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা রাখা হয়। চার্টারের সর্বশেষ এ সংশোধন এটাকে অর্থবহ বিশ্বসংস্থার পর্যায়ে উন্নীত করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মুসলিম বিশ্বের সুদৃঢ় ঐক্যের পাশাপাশি অর্থনীতিসহ কীভাবে সার্বিক কল্যাণ সাধন করা যায় তা নিয়ে নবগঠিত সংস্থা বিশেষভাবে চিন্তা করতে থাকে।[১৪] ১৯৭৫ সালের ২০ অক্টোবর জেদ্দায় প্রতিষ্ঠিত হয়

১৪. ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান,*ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা [ওআইসি]*(ঢাকা : ইফাবা, ডিসেম্বর ২০১৬), পৃ. ১৪

ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank-IDB)। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ও জনগণ উপলব্ধি করেন যে, সুদের আগ্রাসন থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করতে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এ সময় সাউদি আরব, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিশর ও তুরস্কসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়ে।[১৫]

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হবে এ সংবাদে দেশের ধর্মপ্রাণ সহজ-সরল জনগণের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সুদের চাপে দিশেহারা মানুষ সুপথ পাওয়ার আশাবাদী প্রেক্ষাপটে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়। প্রস্তুত হয় ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ প্রেক্ষাপট। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার প্রধান এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৮ সালের ২৪-২৮ এপ্রিলে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত নবম ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্যাংকব্যবস্থাকে সুদের কবল থেকে রক্ষা করতে পর্যায়ক্রমে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ সিদ্ধান্তের আলোকে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা দেশে ফিরেন।[১৬]

এদিকে বেশ কিছু ইসলাম দরদি সাহসী সৈনিক এবং কোটি কোটি সাধারণ মানুষ এ দেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। তারা অনুধাবন করেছিলেন যে, আর্থ-সামাজিক সুবিচার এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে একটি প্রগতিশীল অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। আশির দশকে সুদনির্ভর প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার অসমতল পরিবেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর চিন্তাধারা নিতান্তই বেমানান মনে হত; তবুও উদ্যোক্তাগণ হাল ছাড়েননি। তারা অনুধাবন করেছিলেন যে, এ দেশে তো ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবেই, তদুপরি এর সাফল্য ও অগ্রগতির সুসংবাদ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও পৌঁছবে। এমন এক প্রেক্ষাপটে ১৯৭৭ সালে ‘ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো’ (IERB) নামে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা সংস্থা গঠিত হয়। এ সংস্থার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাগ্যবঞ্চিত ও বিড়ম্বিত জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা। ইসলামে যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণমুখী অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান তা যথাযথ প্রমাণে ‘ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো’ জন্মলগ্ন থেকেই কাজ করতে শুরু করে।

আজ বাংলাদেশের মানুষ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার যে সুফল ভোগ করছে তার মূল কৃতিত্বের দাবিদার এ গবেষণা সংস্থাটি। এ জন্য ‘ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো’ কে ইসলামি ব্যাংকিং আন্দোলনের মাদার অরগানাইজেশন (Mother Organization) বলা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৯ সালের ৩-৫ জুলাই আইইআরবি’র উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (TSC)-তে এবং বাংলাদেশ এ্যাটমিক এ্যানার্জি সেন্টার অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত ইসলামি অর্থনীতির উপরে তিনদিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার উপর পরবর্তী বছর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (তৎকালীন

---

১৫. ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং ঃ কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪

১৬. এ.এ.এম হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : প্রকাশিকা, হেলেনা পারভীন, জানুয়ারি ২০০৪), পৃ. ৫৫-৫৬

পিজি হাসপাতাল) মিলনায়তনে (অন্য এক তথ্যানুযায়ী ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অডিটরিয়ামে) এ সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর জনাব নূরুল ইসলাম উক্ত সেমিনার উদ্বোধন করেন এবং ভাষণে তিনি বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে আরো ভাষণ দেন আইডিবি'র ড. সেলিম জাফর কারাতাস, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচারক আহমদ রাজি আল ইয়াসিন, বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন সাউদি রাষ্ট্রদূত শাইখ ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল-খতিব, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত মাহমূদ সাদাত মাদারশাহি প্রমূখসহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।[১৭]

উল্লেখযোগ্য যে, সেনেগালের রাজধানী ডাকার সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের পর মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপক সাড়া জেগে উঠে। ওআইসি এবং তৎপরবর্তী আইডিবি প্রতিষ্ঠার আলোকময় প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয় এবং গোটা মুসলিম উম্মাহ সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা পাওয়ার আশাবাদে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। বাংলাদেশ সরকার ডাকার সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপরতা শুরু করে।[১৮] এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের তৎকালীন সুযোগ্য রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ মহসিন ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে পররাষ্ট্র সচিবের কাছে একটি সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের সাথে দুবাই ইসলামি ব্যাংকের একটি সেমিনারের প্রতিবেদনও তিনি সংযুক্ত করে পাঠান, যাতে ইসলামি ব্যাংকের একটি কার্যকরী মডেল ছিল। মোহাম্মদ মহসিন-এর উক্ত অনুরোধের পিছনে আইডিবি, কয়েকটি আন্তর্জাতিক ইসলামি ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তির প্রচেষ্টাও জড়িত ছিল। এর পরপরই ডিসেম্বর মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং উইং বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিমত জানতে চায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। প্রমাণ পাওয়া যায়, বাংলাদেশ সরকার প্রস্তাবটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে নেয় এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট সদিচ্ছার পরিচয় দেয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদানীন্তন গবেষণা পরিচালক জনাব এ এস এম ফখরুল আহসানকে বিভিন্ন দেশের ইসলামি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকের বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।[১৯] জনাব ফখরুল আহসান এতদুদ্দেশ্যে মিশর, দুবাইসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি মিশরে ড. আহমাদ আল-নাজ্জার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সেভিংস ব্যাংক' বা 'মিটগামার ব্যাংক' পরিদর্শন করেন। এ ব্যাংক আধুনিক বিশ্বের ইসলামি শারি'আহভিত্তিক সর্বপ্রথম ইসলামি ব্যাংক হিসেবে বিশ্বব্যাপী

---

১৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; *Thought on Islamic Economics*(Dhaka: IERB, Special issue on Banking, Feb. 1982), p. 29

১৮. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৮), পৃ. ১৬০

১৯. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জুলাই ১৯৮৯), ৮ম সংখ্যা, পৃ. ৬৪

পরিচিত। জনাব ফখরুল আহসান এ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার নেপথ্য শক্তি, কৌশল ও নীতি নির্ধারণী বিষয়ক দিক-নির্দেশনাসমূহ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি অনুধাবন করেন যে, ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা বিশ্ববাসীর অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে সক্ষম এবং সাধারণ মানুষ একে একটি আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করছে। তিনি তার ভ্রমণে বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংকের পরিকাঠামো, ব্যবস্থাপনা কৌশল, সমস্যাসমূহ, বিনিয়োগ নীতিমালা, দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাংকের ভূমিকাসহ বহুবিধ বিষয়ে সরেজমিন ব্যাপক পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ পরবর্তীতে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

জনাব ফখরুল আহসান মিশরের নাসের সোস্যাল ব্যাংক, ফয়সল ইসলামি ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামি ব্যাংকস্-এর কায়রো কার্যালয়, দুবাই ইসলামি ব্যাংক, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ, আল-রাজি ব্যাংকিং কর্পোরেশনসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক ও ইসলামি অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ শেষে দেশে ফিরেই ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার সম্ভাব্যতার উপর লিখিত প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনে তাঁর ভ্রমণকৃত অঞ্চলের বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংকের পরিবেশ, প্রতিষ্ঠাকালীন প্রাথমিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিরাজিত পরিবেশ ও জনগণের আশা-আকঙ্খার একটি তুলনামূলক চিত্র ফুটিয়ে তোলেন।[২০] এর পরপরই ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (তৎকালীন পিজি হাসপাতাল) মিলনায়তনে ইসলামি ব্যাংকিং-এর উপর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে সাউদি আরবের মক্কা মুকাররমা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি ইসলামি ব্যাংকিং-এর মত একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও সে ব্যাংক যাতে সুষ্ঠুভাবে স্বতন্ত্র মর্যাদায় ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারে সে জন্য আলাদা আইন তৈরি করতে মুসলিম দেশসমূহের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি সুপারিশ করেন, তার ভাষায়, 'The Islamic Countries should develop a separate banking system of their own in order to facilitate their trade and commerce.'[২১]

১৯৮১ সালের মার্চ মাসে সুদানের রাজধানী খার্তুমে অনুষ্ঠিত ওআইসি দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা জানিয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। ঐ বছর এপ্রিল মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে লেখা এ পত্রে পাকিস্তানের মত বাংলাদেশের

২০. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

২১. মুসলিম দেশসমূহের উচিত তাদের নিজস্ব ধ্যাণ-ধারণার আলোকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকব্যাবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার করা। দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং : সাফল্য, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ*, পৃ. ২৫; মোঃ মোখলেছুর রহমান, *বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড ২০০৫ স্মরণিকা, ২১ জানুয়ারি ২০০৮), পৃ. ১৯

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের সকল শাখায় পরীক্ষমূলকভাবে পৃথক ইসলামি ব্যাংকিং কাউন্টার চালু করে পৃথক লেজার সংরক্ষণের পরামর্শ দেয়া হয় এবং এর অব্যবহিত পরেই ব্যাপক ও কার্যকর প্রস্তুতি শুরু হয়। উদ্যোক্তাগণ ইসলামি ব্যাংকিং পরচিালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির ব্যাপারে মনোযোগ দেন। কারণ, আদর্শভিত্তিক ব্যাংকের জন্য আদর্শ কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। তারা অনুধাবন করেছিলেন যে, নীতির প্রশ্নে অটল এবং ব্যাংকিং বিষয়ে অভিজ্ঞ এ দু'টি গুণের সমন্বয় থাকা জনশক্তি দিয়েই ইসলামি ব্যাংককে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নেয়া সম্ভব।[২২]

১৯৮১ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার সাফল্য ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোট ৫টা বড় ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। প্রচলিত সুদি ব্যাংকের ভিড়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের একটি ব্যাংক কীভাবে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে, কিভাবে অন্যের চেয়ে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে, কীভাবে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সুফল গণমানুষের কাছে পৌঁছে দিবে– এ সব বিষয়ে অত্যন্ত যত্নের সাথে কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেয়া হয়। একই সাথে ইসলামি ব্যাংকের চলার পথের সম্ভাব্য সমস্যা এবং তা প্রতিরোধে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়। চিন্তাবিদগণ এ ক্ষেত্রে ইমাম গাযালির দর্শন অনুসরণ করেন। ইমাম গাযালি মহানবী (সা.)-এর অতি পরিচিত হাদিস 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক' উল্লেখ করে এ বাধ্যতামূলক জ্ঞানের মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়ের জ্ঞানকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি ইবাদতমূলক মর্যাদা আছে বিধায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এত উৎসাহ দেয়া হয়। অতএব উহা অর্জনও অত্যাবশ্যকীয়। 'জেনে রেখো, এ ঘরের (অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের) জ্ঞান অর্জন প্রতিটি উপার্জনশীল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক।[২৩]

১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে ইসলামি ব্যাংকিং-এর উপর এক মাস স্থায়ী এক সার্বক্ষণিক আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিআইবিএম ও প্রস্তাবিত 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক অব ঢাকা লিমিটেড' (বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড)-এর ৩৭ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ এম আযীযুল হক এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া ১৯৮১ সালের ১৮-১৯ মার্চ বিআইবিএম-এর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামি ব্যাংকিং-এর উপর দু'দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিপুল সংখ্যক অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার এতে অংশ নেন। আবার একই সালের এপ্রিল মাসে বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা ট্রাস্টের উদ্যোগে চট্টগ্রামে ইসলামি ব্যাংকিং-এর উপর আরেকটি সফল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এর আয়োজক ছিলেন বায়তুশ শরফ-এর পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার রহ.।[২৪] ১৯৮২ সালের ১৮ জানুয়ারি থেকে বিআইবিএম-এর উদ্যোগে ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।[২৫]

---

২২. ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং : কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

২৩. ড. আবুল হাসান এম সাদেক, 'অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নৈতিক ও আইনগত নির্দেশনা : ইমাম গাযালীর বিশ্লেষণ' *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : আইবিবিএল, ৯ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০০৪), পৃ. ৪৩

২৪. এম কামালউদ্দীন চৌধুরী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রামে ২৩ জুলাই ২০০৪ তারিখে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার; ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*(ঢাকা : সেমিনার পেপার, ২২ অক্টোবর ২০১১), পৃ. ৮-৯

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১৯৮১ হতে ১৯৮২ সালের মধ্যে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে মোট ৩১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দেশের খ্যাতিমান ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, উলামায়ে কিরামগণ ও ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন উক্ত কোর্সসমূহের প্রশিক্ষক। সর্বশেষ কোর্সটি পরিচালিত হয় ১৯৮২ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। দীর্ঘ ১০ মাস ব্যাপী এ কোর্সে মোট ২১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। 'ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো', 'ইসলামী ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন', বিআইবিএম এবং 'ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ইসলামিক ব্যাংকিং' প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

১৯৮২ সালে আইডিবি'র উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার যৌথ উদ্যোগের সম্ভাব্যতা নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ঢাকা সফর করেন। সফরের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রস্তাবিত সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকে আইডিবির উদ্যোক্তা হিসেবে মূলধন বিনিয়োগের অনুকূল সুপারিশ করা। প্রতিনিধি দল ঢাকায় এসে এ কথা জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, 'ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো (IERB)' এবং 'বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন (BIBA) বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য পরিশ্রম করছে। তারা বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ ও ব্যাপক জনমত তৈরি করছে। প্রতিনিধি দল সাধারণ মানুষের মতামত গ্রহণ করে এবং তা গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন তথা সাফল্যের সাথে তাদের মিশন শেষ করে জেদ্দায় ফিরে যায়। এরই সাথে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সিলেটের মরহুম আলহাজ্জ আব্দুর রাজ্জাক লস্করকে[২৬] চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন সাউদি রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল খতিব (মরহুম), ইবনে সিনার ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক আবু নাছের মোঃ আব্দুজ্জাহের, রাবেতার পরিচালক মীর কাশেম আলী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মফিজুর রহমান, যশোরের বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্জ মোহাম্মদ হোসাইন, সিপিআই জনাব মুহাম্মদ ইউনুস (মরহুম), প্রখ্যাত সাউদি শিল্পপতি শেখ আহমদ সালেহ যামযুম, বায়তুশ শরফের পীর শাইখ আব্দুল জব্বার (মরহুম), ইঞ্জিনিয়ার মুস্তফা আনোয়ার, বিশিষ্ট শিল্পপতি এম.এ. রশীদ চৌধুরী, এ.কে. ফজলুল হক, মুহাম্মদ মালেক মিনার, ব্যারিস্টার তমিজুল হক, আলহাজ্জ মুহাম্মদ বশীর উদ্দীন, মরহুম মোহাম্মদ সফিউদ্দীন দেওয়ান, অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মোহাম্মাদ নূরুজ্জামান, আলহাজ্জ আবুল কাশেম, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ দাউদ খান, শাহ আব্দুল হান্নান, মরহুম নাসিরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ৫০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন[২৭] নিয়ে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৮]

---

২৬. ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং : কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

২৭. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর যাত্রা শুরুর প্রাথমিক অনুমোদিত মূলধন ছিল ৫০ কোটি, তার মধ্যে পরিশোধিত মূলধন ছিল ৮ কোটি টাকা। দ্র. *বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৮৫*, আইবিবিএল, পৃ. ১৩

২৮. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১০, আইবিবিএল, পৃ. ২২

এ ছাড়াও দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তদের মধ্যে আরো ছিলেন, মুহাম্মদ হোসেন, এম আযীযুল হক, জনাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ, জাকিউদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো, জর্দান ইসলামি ব্যাংক, ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি), আল রাজি কোম্পানি, বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ (কেএসসি), মিনিস্ট্রি অব আওকাফ ইসলামিক এফেয়ার্স কুয়েত (বর্তমানে এর নাম কুয়েত আওকাফ পাবলিক ফাউন্ডেশন), দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন কাতার, ইবনে সিনা ট্রাস্ট, দি পাবলিক ইনস্টিটিউশন ফর সোস্যাল সিকিউরিটি কুয়েত এবং মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস কুয়েত (বর্তমানে এর নাম দি পাবলিক অথরিটি ফর মাইনরস এ্যাফেয়ার্স, কুয়েত)।[২৯]

অতঃপর দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে প্রতিকূল পরিবেশ, বিরূপ প্রশাসনিক ও বৈরি আইন কাঠামোর মধ্যে সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক বাস্তবে রূপ লাভ করে। প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের পথ পাড়ি দিয়ে ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ কোম্পানি আইনের আওতায় একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড’, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক।[৩০] বহুমাত্রিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ইসলামি শারি‘আহভিত্তিক এ ব্যাংকটি কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার অঙ্গীকার নিয়ে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯ জন বাংলাদেশী ব্যক্তিত্ব, ৪টি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান এবং আইডিবিসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ১১টি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থা এবং সাউদি আরবের দু’জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তারূপে এগিয়ে আসেন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম শারি‘আহভিত্তিক সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন (বর্তমানে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন) অনুযায়ী একটি সীমিত দায়ের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিরূপে ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ নিবন্ধিত হয়। ব্যাংকটি একই বছরের ৩০ মার্চ প্রথম শাখা হিসেবে ঢাকার ৭৫, মতিঝিলস্থ লোকাল অফিস উদ্বোধনের মাধ্যমে যুগপৎ যাত্রা শুরু করে।[৩১] ১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। তত্ত্বগত ধারণার পরিধি পেরিয়ে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

কেবল ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের চর্চা বা উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিংকে উপেক্ষা করলে সামষ্টিকভাবে তা হয়ত সঠিক হবে না। এখন বাংলাদেশে পুরোদস্তুর আটটি ইসলামি ব্যাংক,

---

২৯. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৩০. ১৯৮৩ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত ‘ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ব্যাংক অব ঢাকা’ নামে বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকের প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষ হয় এবং এই নামেই তখন পর্যন্ত ব্যাংকের সাইনবোর্ড ও প্রচার পুস্তিকা ব্যবহার করা হয়। আলহাজ্জ মফিজুর রহমান ২৯ মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর এ ব্যাংক ‘ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড’ নামে কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের একটি চমৎকার মনোগ্রাম তৈরি করে দেন দেশের খ্যাতিমান শিল্পী ও ক্যালিগ্রাফার জনাব সবিহউল আলম। দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৩১. ব্যাংকের প্রথম শাখা ৩০ মার্চ ১৯৮৩ তারিখে খোলা হলেও একই বছরের ১২ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। এটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী এস. এম. শফিউল আজম। ৩০ মার্চ ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী দিনে ৪৮টি হিসাব খোলা হয় এবং তাতে জমার পরিমাণ ছিল ৩৫ লাখ টাকা। ব্যাংকের প্রথম হিসাবটি খোলা হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নামে। ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এএফএম ইয়াহিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষে ২৫ লাখ টাকা জমা দিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী শারী‘আহ্ মোতাবিক প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকে আল-ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে প্রথম হিসাবটি খোলার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

তিনটি বিদেশী ব্যাংকসহ ১০টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা ও রাষ্ট্রায়ত্ত দু'টি ব্যাংকসহ ছয়টি ব্যাংকে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের উইং বা অনুবিভাগ রয়েছে। এছাড়াও আংশিক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আইএফআইসি ব্যাংককে পুরোপুরি ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তরের চিন্তা-ভাবনা চলছে। এইচএসবিসি ব্যাংকের 'আমানাহ' ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের 'সাদিক' ধর্মানুরাগী আমানতকারীদের মধ্যে ধীরে ধীরে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এসব ব্যাংকের সর্বসাম্প্রতিক তথ্য না থাকলেও এটা বলা যায় যে, পুরোদস্তুর আটটি ইসলামি ব্যাংক পুরো ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ১৮ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে। অধিক বিস্ময়ের বিষয় হলো, ব্যাংকিং খাতের শতকরা ২১ ভাগ বিনিয়োগই আটটি ইসলামি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছে। দেশের মোট রেমিট্যান্সের শতকরা ৩০ ভাগের অধিক এসব ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে আসে। অবশ্য এর মধ্যে কেবল সুপরিচিত একটি ব্যাংক– ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে আসে শতকরা ২৮ ভাগ প্রবাসী আয়। এ কয়টি ব্যাংক দেশের শতকরা ২১ ভাগ আমদানি ও ২৪ ভাগ রপ্তানি বাণিজ্যের লেনদেনের মাধ্যম প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিজিএমই-এর জ্যেষ্ঠ সদস্যদের যে কাউকে জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই তাদের পছন্দের ব্যাংক হিসেবে ইসলামি ব্যাংকের নামই বলবেন। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে এইচএসবিসি ব্যাংককে বাংলাদেশের কিছু ইসলামি ব্যাংকের হিসাব খোলা-সংক্রান্ত অনিয়মের জন্য শাস্তি প্রদানের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অনেক ব্যাংক অথবা বিদেশি ব্যাংকই আলোচ্য ইসলামি ব্যাংকগুলো থেকে ক্রেডিট লাইন বা করেসপনডেন্ট ব্যাংকিং সুবিধা প্রত্যাহার করার পরও বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্যের একটি বিরাট অংশ পরিচালিত হয় ইসলামি ব্যাংকের মাধ্যমে। তাই এ সমস্যা না থাকলে ইসলামি ব্যাংকের আকার হয়ত মহীরুহ পর্যায়ে উপনীত হত।

কেউ যদি চিন্তা করে থাকেন আজকাল সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের পরিবর্তে শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের প্রতি সাধারণ মানুষ কিংবা অধিকসংখ্যক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ঝুঁকছে, তা সম্ভবত সঠিক নয়। বরং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানবসম্পদ, সেবার মান ও সর্বোপরি গ্রাহকের বিপদাপদে ব্যাংকগুলোর সহযোগিতার ইচ্ছা ও সার্বিক সামর্থ্যই এসব শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকে সাধারণ মানুষের ঝুঁকে পড়ার কারণ। এছাড়া তাদের প্রদেয় প্রডাক্ট অধিক সুরক্ষিত ও গ্রাহকবান্ধব। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এসব ব্যাংক তাদের বিনিয়োগ সুবিধার শতকরা ২০ ভাগ শিল্পখাতে, ২৬ ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং ২৩ ভাগ পরিবহণ খাতে সম্প্রসারণ করেছে।[৩২]

সাব-প্রাইম ক্রাইসিসের সময় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অধিক সিনথেটিক সলিউশন সৃষ্টির বিপরীতে কল্যাণধর্মী ব্যাংকিং সেবা প্রবর্তনে ইসলামি ব্যাংকিং উন্নত বিশ্বেও লক্ষণীয় গুরুত্ব অর্জন করেছে। মধ্য-নব্বইয়ে ইসলামি ব্যাংকের মোট সম্পদ কেবল ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হলেও ২০১৩ সালে তা ব্যাপকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৮ ট্রিলিয়ান মার্কিন ডলারে। এইচএসবিসি, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ও সিটি ব্যাংকের মত বৈশ্বিক ব্যাংকগুলো বিদ্যমান ইসলামি ব্যাংকিং অফার/প্রডাক্টগুলো পুনর্বিন্যাস অথবা বন্ডসহ শারি'আহভিত্তিক অর্থবাজারের অন্যান্য প্রডাক্ট প্রবর্তনে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে। তারা

৩২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, সেপ্টেম্বর ২০১৪), পৃ. ১০০-১০১

শারি'আহভিত্তিক হেজিং প্রডাক্টগুলো চালু করতেও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। নিকট অতীতে অর্থনীতিবিদ রঘুরাম রাজন ভারতে ইসলামি ব্যাংকের সম্ভাবনা পর্যালোচনা করে সরকারকে কিছু সুপারিশও দিয়েছেন। ভারতীয় সরকার তার সুপারিশের কিছু বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেখানে ঐ খাত সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। পাকিস্তানসহ অনেক দেশই বাজারে সুকুক বা ইসলামি বন্ড ছাড়ার মাধ্যমে বৃহৎ প্রকল্প অর্থায়ন করছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু প্রয়োজনীয় অথচ নতুন নীতিমালা জারির সুবাদে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং বেশ গতি লাভ করেছে। ২০০৯ সালের ইসলামি ব্যাংকিং নীতিমালা, ইসলামি ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, শরিয়া কমপ্লায়েন্ট রিফাইন্যান্সিং স্কিম, ইসলামি ব্যাংকের জন্য আলাদা পরিদর্শন দল গঠন, ইসলামি ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণে অধিক সহযোগিতা প্রদান, অধিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ইসলামি ব্যাংকিংয়ের কল্যাণের দিকে অব্যাহত নজর খাতটির দ্রুত বিকাশ ত্বরান্বিত করেছে।[৩৩] এ পরিপ্রেক্ষিতে গত পাঁচ বছরে ইসলামি ব্যাংকগুলোর আমানত বেড়েছে শতকরা ২৬ ভাগ আর বিনিয়োগ বেড়েছে ২৫ ভাগ। সাধারণ মানুষ ব্যাপক অংশগ্রহণ ও সম্পদের বর্ধিষ্ণু অংশ নিয়ে এটা আরও দ্রুত সম্প্রসারণ হতে পারে।

ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ব্যাপকতর বিকাশে প্রথমত করণীয় হলো মালয়েশিয়ার মত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শারি'আহ বোর্ড ঢেলে সাজাতে হবে এবং এর টার্মস অব রেফারেন্স নির্ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি ইসলামি ব্যাংকিংয়ের প্রদেয় প্রডাক্ট সম্পর্কে উত্তম দৃশ্যমানতা অব্যাহত রাখা, অব্যাহত প্রডাক্ট উন্নয়ন প্রচেষ্টা, বিপন্ন বিনিয়োগ সম্পদের উপর ব্যাপক তদারকি এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ইসলামি ব্যাংকিংকে আরও মর্যাদাপূর্ণভাবে লাভে সাহায্য করবে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা গ্রাহক পর্যায়ে হস্তক্ষেপ সক্ষমতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং অ্যাপ্রোচ এবং ধর্মীয় ও কল্যাণমূলক প্রণোদনার কারণে ইসলামি ব্যাংকগুলো তরুণ-যুবকসহ বিপুলসংখ্যক গ্রাহক আকর্ষণ করতে পেরেছে। অভিযোগ রয়েছে ঐ ব্যাংকের অনেক কর্মী একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল থেকে এসেছেন। তবে তাদের নেতৃত্ব পর্যায়ে মূলধারার ব্যাংকারদের অনেকেরই যোগদান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের নজরদারি বৃদ্ধির ফলে দৃশ্যপট দ্রুতই পাল্টে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অধিক স্বচ্ছতা আনয়নে নতুনভাবে নজর দিয়েছে। তবে এ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে ইসলামি ব্যাংকগুলোর রাজস্ব বা আয় অর্জনের মডেল তথা ঋণ-আমানতের রিটার্ন বা সেবার মাশুল কিংবা হার আরো পর্যালোচনা ও নজরদারি প্রয়োজন। আবশ্যক ইসলামি ব্যাংকিং নিয়ে আরো নিরীক্ষা ও পর্যালোচনামূলক বৈঠক। এ ব্যাপারে মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এমনকি যুক্তরাজ্য থেকেও অনেক সহায়তা নেয়া যেতে পারে। যুক্তরাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ইসলামি ব্যাংকিং তথা ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে ইদানিং অধিকতর আগ্রহ দেখাচ্ছে।

৩৩. Guidelines for Conducting Islamic Banking, Bangladesh Bank, November 2009, BRPD Circular No. 15/2009, Section III, p. 10

কল্যাণ ও গ্রাহককেন্দ্রিক মডেলের কারণে অনেক ঋণগ্রহীতা ও আমানতকারী ইসলামি ব্যাংকিং পছন্দ করলেও একজন গ্রাহকের আমানতের বিপরীতে মুনাফা কত দেয় অথবা ঋণগ্রহীতা বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের বিপরীতে কত চার্জ আদায় করে, তা নিয়ে এখনো অনেকের মধ্যে সংশয় আছে। তাই ইসলামি ব্যাংকিংয়ে প্রদত্ত কমিশন ও ফি আদায় মডেল পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। আবার এ ধরনের ব্যাংক সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন কিংবা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট গ্রুপকে সুফল প্রদানের সম্ভাব্য সন্দেহ থেকেও মুক্ত নয়। সামগ্রিক বিচারে ইসলামি ব্যাংকিং অপারেশন, প্রডাক্ট অফারিং, সুশাসন ও রাজস্ব আয় কাঠামোর আরো মান নিশ্চিতকরণে অধিক দৃষ্টি দেয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং উন্নয়ন অংশীদারদের এখনই সময়। অন্যদিকে আবার অবিবেচকের মত বা অন্যায়ভাবে তাদের চাপাচাপি করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি।

'আহাল্লাল্লাহুল বাইয়া ওয়া হাররামার রিবা'– আল্লাহ, ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।[৩৪]

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটিই ইসলামি ব্যাংকিং এর মূল স্তম্ভ। বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকিং এর গ্রাহকদের মুবারকবাদ জানাতে হয় তাদের এ পবিত্র অনুভূতির জন্য। যাদের অংশ গ্রহণে বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকিং একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা একটি অপার সম্ভাবনাময় ব্যাংক ব্যবস্থা। আধুনিক বিশ্বে মাত্র চার দশক পূর্বে এর পুনঃআবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু এ অল্প সময়ের মধ্যেই এ ব্যবস্থা বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পশ্চিমা বিশ্বের ইউরোপ, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্টান্ডার্ড চার্টার্ড, এইচএসবিসি এবং বিএনপি পরিবাস ও জেপি মরগান এর মত বহুজাতিক ব্যাংকগুলো ইতিমধ্যেই তাদের সনাতনী ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে।

ইসলামি ব্যাংকিংয়ের এ অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ কিন্তু পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থায় ৫৭টি ব্যাংকের মধ্যে বর্তমানে ২২টি ব্যাংকে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু আছে। আরো ১০টি ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এর মধ্যে ৪টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকিংয়ের লাইসেন্স পাওয়ার জন্য আবেদন করেছে।

বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকগুলোতে প্রচলিত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ ইসলামি শারি'আতে হালাল তাতে সন্দেহ নেই, তবে আদর্শ ইসলামি পদ্ধতি গ্রহণ করলে দেশ ও জাতি সকলে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের সুফল পাবে।

ইসলামি ব্যাংকগুলোতে শারি'আহ বোর্ড গঠন বাধ্যতামূলক করা আমানতকারীদেরকে মুনাফা বণ্টনে প্রচলিত ওয়েটেজ পদ্ধতির পরিবর্তে আইএসআর বা ইনকাম শেয়ারিং রেশিও পদ্ধতি সংযোজন এ গাইড লাইনের পরিপূর্ণতা আনয়ন এবং আন্তর্জাতিক স্টান্ডার্ড রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতিমালা বিভাগের ইসলামি ব্যাংকিং সেল ৩ আগস্ট ২০০৪ইং তারিখে বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামি ব্যাংকগুলোর জন্য একটি অভিন্ন গাইড লাইনস প্রণয়নের লক্ষ্যে

৩৪. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

একটি ইসলামি ব্যাংকিং ফোকাস গ্রুপ গঠন করে। ফোকাস গ্রুপ কর্তৃক প্রণীত ইসলামি ব্যাংকিং গাইড লাইনস গভর্নর কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতিমালা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতিমালা বিভাগ বিগত ৯ নভেম্বর ২০০৯ইং তারিখে ফোকাস গ্রুপ কর্তৃক প্রণীত গাইড লাইনসের আলোকে 'গাইড লাইনস ফর ইসলামি ব্যাংকিং' শীর্ষক বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫/২০০৯ জারি করে, যা শারি'আহ ভিত্তিক ইসলামি ব্যাংকগুলোর জন্য প্রযোজ্য। উল্লেখ্য বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এ প্রথম বারের মত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে ইসলামি ব্যাংকগুলোর জন্য অনুসৃতব্য গাইড লাইনস প্রণয়ন করা হল। এর পূর্বে ইসলামি ব্যাংকিং আইন ছাড়া ইসলামি ব্যাংকগুলো চলছিল শারি'আহ কেন্দ্রিক ঝুঁকির মধ্যে। সে ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পেলেও ঝুঁকি থেকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় পরিত্রাণের জন্য একটি পৃথক ইসলামি ব্যাংক কোম্পানি আইনের পূর্ণাঙ্গ ভার্সন প্রয়োজন।

অর্থনীতির ফলিত বিষয় হিসেবে ইসলামি অর্থনীতি, ইসলামি ব্যাংকিং ও ইসলামি অর্থায়ন বিষয়গুলো উদ্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উক্ত বিষয়গুলো চালু করার মাধ্যমে বাংলাদেশে তথা মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামি ব্যাংকিং পেশায় বহু কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনশক্তি রপ্তানির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। ইসলামি ব্যাংকিং শিল্প বিশ্ব বাজারেও দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাংলাদেশেও তা অগ্রসরমান। তবে বিশ্বব্যাপী ইসলামি অর্থায়নের অগ্রগতি যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে তুলনায় দক্ষ জনশক্তির অপ্রতুলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা সংস্থা 'আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং' এর মতে, বিশ্বে ইসলামি অর্থায়নের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ২০ ভাগ এবং এ শিল্পের বর্তমান সম্পদের সর্বমোট পরিমাণ এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। সম্প্রতি সুইস ব্যাংক গ্রুপ 'ক্রেডিট সুইড' এবং জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত যৌথ স্ট্যাডি রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়, শারি'আহ কমপ্লায়েন্ট ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টের চাহিদা বিশ্বব্যাপী এত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, ২০১৬ সাল নাগাদ এ সেক্টরের সম্পদের পরিমাণ তিন ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আগামী ছয় বছরে তা তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে।[৩৫]

ইসলামি শারি'আহ আইবিপি ও এফবিপি এবং শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় : ইসলামি ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্য সেবায় ইনল্যান্ড বিল পারচেজ ও ফরেন বিল পারচেজ-এর ক্ষেত্রে পুরোপুরি শারি'আহ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে সার্বিক সমাধানের উপায় বের করার জন্য সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ডের ফিকহ কমিটি একটি টেকনিক্যাল উপ-কমিটি গঠন করেছে। এ কমিটি শারি'আহর আলোকে আইবিপি ও এফবিপি বিষয়ে একটি গবেষণামূলক প্রতিবেদন ও সুপারিশ চূড়ান্ত করে যা কমিটি অনুমোদনও দিয়েছে। আশা করা যায় এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে ইসলামি ব্যাংকগুলো আইবিপি ও এফবিপির ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে শারি'আহ পরিপালন করতে সক্ষম হবে।

৩৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, সেপ্টেম্বর ২০১৪), পৃ. ১০১

অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইসলামি ব্যাংকগুলোকে পুঁজিবাজারে ব্যবসায়ের সুযোগ করে দিলেও সনাতন পদ্ধতির পুঁজিবাজারে ইসলামি শারি'আহর আলোকে লেনদেন করার জন্য কোন নীতিমালা জারি করেনি। এ অবস্থায় সদস্য ব্যাংকগুলোর চাহিদা বিবেচনা করে সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড ইতোমধ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সংক্রান্ত একটি টেকনিক্যাল উপ-কমিটি গঠন করেছে। কমিটি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ডের ফিকহ কমিটির অনুমোদনের পর তা কার্যকর করা হবে। তাতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক নীতিমালা, মার্জিন সংক্রান্ত শারি'আহসম্মত পদ্ধতিসহ প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা রয়েছে। ব্যাংকিং ও শারি'আহ জ্ঞান সম্পন্ন সদস্যবৃন্দ, মুরাকিবগণ নীতিমালার যে খসড়া প্রণয়ন করেছেন সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ডের ফিকহ কমিটির অনুমোদন পাওয়া সাপেক্ষে তা বাস্তবায়িত হলে দেশের পুঁজিবাজারের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সেবা প্রদানে ইসলামি ব্যাংকগুলোর শারি'আহ পরিপালনকে সহজ করবে বলে আশা করা যায়।

শেয়ার ব্যবসায় মার্জিন প্রদানের শারি'আহসম্মত পদ্ধতি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে ইসলামি ব্যাংকগুলো শেয়ার ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে।

এক. মুদারাবা; দুই. মুশারাকা; তিন. মুরাবাহা আন্ডার শিরকাতুল মিলক।

এক. মুদারাবা : মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংকগুলো গ্রাহককে শেয়ার ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে। এ পদ্ধতিতে ইসলামি ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ গ্রাহকদের নিকট পণ্য বিক্রয়ের পরিবর্তে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করতে পারে। লাভ চুক্তি মোতাবিক উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে।[৩৬]

দুই. মুশারাকা : মুশারাকা মূলত, একটি অংশীদারি ব্যবসা। এ পদ্ধতিতে ইসলামি ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগ গ্রাহকদের নিকট পণ্য বিক্রয়ের পরিবর্তে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করতে পারে। অংশীদারিত্ব বুঝাতে আরবি ভাষায় 'শিরক' ও 'শিরকত' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। আধুনিককালে 'মুশারাকা' বা অংশীদারি ব্যবসা বলতে যা বুঝায় ফিকহের গ্রন্থসমূহে তা 'শিরকাতুল আকদ' হিসেবে বহুল আলোচিত। 'শিরকাতুল আকদ' অর্থ চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব, যেখানে চুক্তিই অংশীদারিত্বের ভিত্তি। ব্যবসা পরিচালনার জন্য একাধিক অংশীদার এ চুক্তির অধীনে একত্রিত হয়। 'শিরকাত' বা মুশারাকার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে 'শিরকাতুল ইনান' এর প্রয়োগ সহজ হওয়ার কারণে ইসলামি ব্যাংকসমূহ এ পদ্ধতি সহজে অনুশীলন করতে পারে। শিরকাতুল ইনানে প্রত্যেক অংশীদারের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া যেমন শর্ত নয় তেমনি পুঁজি সরবরাহ, ব্যবস্থপনায় অংশগ্রহণ ও লাভ-ক্ষতি গ্রহণে প্রত্যেকের সম-অংশীদারিত্ব আবশ্যক নয়। শিরকাতুল ইনান পদ্ধতিতে অংশীদারগণ অংশগ্রহণ, মুনাফা বণ্টন ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। আর ক্ষতি হলে পুঁজির অনুপাতে অংশীদারগণকে তা বহন করতে হয়।[৩৭]

---

৩৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*(ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫), খ.৬, পৃ. ১৬৩-১৭০

৩৭. *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৮

তিন. মুরাবাহা আন্ডার শিরকাতুল মিলক : শেয়ার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহ মুরাবাহা আন্ডার শিরকাতুল মিলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। প্রস্তাবিত এ পদ্ধতি মূলতঃ দুটি বিনিয়োগ পদ্ধতির একটি সমন্বিত রূপ। (১) বায়' মুরাবাহা এবং (২) শিরকাতুল মিলক। এর অর্থ হলো এক শরিকের অংশ অপর শরিক কর্তৃক বাকিতে ও লাভে ক্রয়ের অঙ্গীকার করবে। প্রস্তাবিত প্রডাক্টটির নাম হবে 'মুরাবাহা আন্ডার শিরকাতুল মিলক বা এমএসএম। 'শিরকাতুল মিলক' এর নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে গ্রাহক ও ব্যাংক মিলে কোন শেয়ার বা পণ্য ক্রয় করবে। অতঃপর ব্যাংকের অংশ গ্রাহকের নিকট মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করবে।

শেয়ার ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত 'মুরাবাহা আন্ডার শিরকাতুল মিলক' পদ্ধতিটি অনুশীলন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে শেয়ারের উপর ব্যাংকের মালিকানা অর্জন ও কবদ সংক্রান্ত জটিলতার নিরসন হতে পারে। কেননা প্রচলিত আইনে শেয়ারের উপর ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যায় না বলে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতিতে শেয়ারে বিনিয়োগ করা বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে প্রথমে মুশারাকা মোডে ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথভাবে শেয়ার ক্রয় করবে। এতে মুশারাকার নীতিমালা অনুযায়ী গ্রাহকের মালিকানা অর্জনই মালিকানার জন্য যথেষ্ট হবে। অতঃপর ব্যাংক তার অংশ গ্রাহকের নিকট বায়' মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রয় করে দিবে।

মুরাবাহা আন্ডার শিরকাতুল মিলক পদ্ধতির বৈধতার দলিল : বাংলাদেশে চালু হচ্ছে আন্তঃইসলামি ব্যাংক মানি মার্কেট যা ইসলামি ব্যাংকগুলোর একে অপরের মধ্যে অতিরিক্ত তারল্য লেনদেনের পথ প্রশস্ত করবে। তবে এ ইন্সট্রুমেন্টগুলো সনাতনী প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সাথে তারল্য লেনদেনে ব্যবহার করা যাবে না। 'ইন্টার ব্যাংক ওয়াকালাহ' হল একটি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা চুক্তি যেখানে বিনিয়োগকারীরা ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন ধরনের সম্পদে বিনিয়োগ করতে সম্মত হবে। ইসলামি ব্যাংক এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীর এজেন্ট বা উকিল হিসেবে বিবেচিত হবে। বিনিয়োগকারী যখন লাভসহ বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পাবে তখন ব্যাংক তার সার্ভিস প্রদানের জন্য একটি ফি প্রাপ্য হবে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের গাড়ি বাড়ির স্বপ্ন দেখায় এবং লোভভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনায় প্রেরণা জোগায়। এ শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীদের জনসেবা করার প্রেরণার স্থান পায় না। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা আজ আমেরিকা কেন্দ্রিক। আমেরিকার জ্বর আসলে বিশ্বের রপ্তানিকারক দেশগুলোকে এন্টিবায়োটিক খেতে হয়। তবে আশার কথা হল বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি সুনির্দিষ্ট অংশ আজ ইসলামি অর্থনীতির উপর অধিষ্ঠিত যার কারণে বিশ্ব মন্দাতে বাংলাদেশের তেমন ক্ষতি সাধিত হয়নি। তবে পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, শুধু হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার দিয়ে ইসলামি ব্যাংকিং সেবা নয়। ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী হিউম্যান ওয়্যার-এর ভিত্তিতেই ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আপামর জনসাধারণের কাম্য।

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক-এর বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের জনসাধারণ প্রকৃতগতভাবে ধর্মভীরু। তাদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করেই এদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কোনটি পরিপূর্ণ, আবার কোনটি আংশিক।

পরিপূর্ণ ইসলামি ব্যাংক : বাংলাদেশে বর্তমানে ৮টি পরিপূর্ণ ইসলামি ব্যাংক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিচে ব্যাংকগুলোর নাম প্রতিষ্ঠার সালসহ উল্লেখ করা হলো–

ক্রম.	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠা/ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তরের সাল
১.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৯৮৩
২.	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২০০৮ (১৯৮৭ সালে আল-বারাকা ব্যাংক নামে এবং ২০০২ সালে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক নামে নিবন্ধিত)
৩.	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
৪.	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫ (পূর্ব নাম সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড)
৫.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২০০১
৬.	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯ (ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তর ২০০৯ সালে)
৭.	এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড	ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তর ২০০৪ সালে
৮.	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৩০ মার্চ ১৯৮৩ তারিখে কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সময় দেশি উদ্যোক্তাগণ মূলধনের ২১.৭ শতাংশ এবং বিদেশি উদ্যেক্তাগণ ৭৮.৩ শতাংশ যোগান দেন। ব্যাংকটির মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৩০৪টি শাখার মধ্যে Authorized Dealer (AD) শাখার সংখ্যা ৫৮টিতে দাঁড়িয়েছে।

২০১৫ সালে ব্যাংকের আমানত স্থিতি এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির শেয়ার ছিল ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির যথাক্রমে ৭.৬ শতাংশ ও ৮.৬ শতাংশ। ২০১৫ সালে আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিমের গড় সুদহার ব্যবধান ছিল ৪.৩ শতাংশ। ২০১৫ সালে ব্যাংকের অতিরিক্ত তারল্যের স্থিতি ২০১৪ সালের তুলনায় ০.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৭৭১৮৭.০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শিল্প ঋণ : ২০১৫ সালে ব্যাংকের বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিম ৫৮৯৪১৭.০ মিলিয়ন টাকার মধ্যে শিল্প ঋণের অংশ ছিল ৪৭.২ শতাংশ। শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২০১৪ সালের তুলনায় ৭.৯ শতাংশ বেড়ে ২০১৫ সালে ২৭৮১৮৮.০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।[৩৮]

এসএমই ঋণ : ২০১৫ সালে মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে এসএমই-এর অবদান ছিল ৪২.০ শতাংশ। ২০১৪ সালের তুলনায় এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ ৬.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ২৬৪৬৩০.০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণ : ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২০১৪ সালের তুলনায় ২৪.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ২৯৯২৪.০ মিলিয়ন টাকায় দাড়িয়েছে।

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড (সাবেক আল-বারাকা ব্যাংক ও পরবর্তীতে দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড) ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে কোম্পানি আইন ১৯১৩ এর অধীনে একটি পাবলিক লিমিটেড

৩৮. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম* ২০১৫-২০১৬(ঢাকা : ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ২০১৭), পৃ. ৭৩

কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ব্যাংকটির মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৩৩টি শাখার মধ্যে Authorized Dealer (AD) শাখার সংখ্যা প্রধান কার্যালয়সহ ১৪ টিতে দাঁড়িয়েছে।

২০১৫ সালে ব্যাংকের আমানত স্থিতি এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির শেয়ার ছিল ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির যথাক্রমে ০.১ শতাংশ ও ০.১ শতাংশ। ২০১৫ সালে আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিমের গড় সুদহার ব্যবধান ছিল ৬.৪ শতাংশ। ২০১৫ সালে ব্যাংকটির অতিরিক্ত তারল্যের স্থিতি ২০১৪ সালের তুলনায় ৪০.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫৬.৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শিল্প ঋণ : ২০১৫ সালে ব্যাংকের বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিম ২১৭৮.০ মিলিয়ন টাকার মধ্যে শিল্প ঋণের অংশ ছিল ৫.৪ শতাংশ। শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২০১৪ সালের তুলনায় ৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ১১৭.৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

এসএমই ঋণ : ২০১৫ সালে মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে এসএমই-এর অবদান ছিল ৭৯.৯ শতাংশ। ২০১৪ সালের তুলনায় এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ ৩৪১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ১৭০৯.৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।[৩৯]

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৮ জুন ১৯৯৫ তারিখে ইসলামি শারি'আহভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ তারিখ থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ১২৯টি। অত্র ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি হিসেবে এআইবিএল ক্যাপিট্যাল মার্কেট সার্ভিসেস লিমিটেড, এআইবিএল ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, এআইবিএল এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এবং মিলেনিয়াম ইনফরমেশন সল্যুউশন লিমিটেড নামে চারটি পৃথক কোম্পানি রয়েছে।

২০১৫ সালে ব্যাংকের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির শেয়ার ছিল ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির যথাক্রমে ২.২ শতাংশ ও ২.৫ শতাংশ। ২০১৫ সালে আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিমের গড় সুদহার ব্যবধান ১.৩ শতাংশ। ২০১৫ সালে ব্যাংকটির অতিরিক্ত তারল্যের স্থিতি ২০১৪ সালের তুলনায় ৫৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৯১০.০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শিল্প ঋণ : ২০১৫ সালে ব্যাংকের বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে শিল্পঋণের অংশ ৫২.৪ শতাংশ। শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২০১৪ সালের তুলনায় ৭.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ১৭৩৬৯.০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলতঃ দেশে শিল্পায়নে অবদান রাখার অংশ হিসেবে বিগত বছরেরগুলোর ঋণের অগ্রগতির ধারাবাহিকতার কারণে শিল্প ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি ঘটেছে।

এসএমই ঋণ : ২০১৫ সালে মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে এসএমই এর অবদান ৫৫.১ শতাংশ। ২০১৪ সালের তুলনায় এসএমই খাতে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ৩৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে

---

৩৯. *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১৮২৪৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিগদ বছরেরগুলোর অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় এসএমই এর ঋণ বিতরণের বৃদ্ধি ঘটেছে। ২০১৪ সালে ভোক্তা ঋণ বিতরণের অংশ মোট বিতরণকৃত ঋণের ০.০১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ : ব্যাংক কর্তৃক ২০১৫ সালে ৪৪০৬৫ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ৯২০.০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা ২০১৪ সালে ৩৮৫০ জন উদ্যোক্তার বিপরীতে ৮৩০.০ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১০.৮ শতাংশ বেশি।

নারী উদ্যোক্তা : ২০১৫ সালে ২৭৮ জন নারী উদ্যোক্তাকে ব্যাংকের ১৬৩৫.০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা ২০১৪ সাল ২১০ জন নারী উদ্যোক্তার বিপরীতে ১৫২২.০ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬.৯ শতাংশ বেশি।[৪০]

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল) ১৯৯৫ সালে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এসআইবিএল সারা দেশে ১১১টি শাখার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের জন্য আমানত ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে।

২০১৫ সালে ব্যাংকের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির অবদান ছিল ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির যথাক্রমে ১.৮ শতাংশ ও ২.২ শতাংশ। ব্যাংকের আমানত ২০১৪ সালের তুলনায় ২০.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ১৪৯৭৮১.১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ২০১৪ সালের তুলনায় ২৪.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ১৩৪১১৬.৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা মোট আমানতের ৮৯.৫ শতাংশ। ২০১৫ সালে আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিমের গড় সুদহার ব্যবধান ৫.০ শতাংশ।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শিল্প ঋণ : ২০১৫ সালে ব্যাংকের বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিম এর মধ্যে শিল্পঋণের অংশ ২৮.৭ শতাংশ। শিল্প ঋণের পরিমাণ ২০১৪ সালের তুলনায় ১৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ৭৪০৯২.০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

এসএমই ঋণ : ২০১৫ সালে ব্যাংকের মোট ঋণের মধ্যে এসএমই-এর অবদান ৮.৯ শতাংশ। ২০১৪ সালের তুলনায় এ ঋণ ৮৩.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ২২৮৩৮.৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৫ সালে ভোক্তা ঋণের অংশ মোট ঋণের মাত্র ০.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ : ২০১৫ সালে ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং বছর শেষে উক্ত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৭৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

---

৪০. *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

নারী উদ্যোক্তা : ২০১৫ সালে ৫২৭ জন নারী উদ্যোক্তাকে ৬৯৭৩.৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা ২০১৪ সালে ৩৬৮ জন নারী উদ্যোক্তার বিপরীতে ৪৩৮৩.৭ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫৯.১ শতাংশ বেশি।[৪১]

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড

৩ আগষ্ট ১৯৯৯ তারিখে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড তৃতীয় প্রজন্মের প্রচলিত ধারার ব্যাংক হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। ১ জুলাই ২০০৪ তারিখ থেকে ব্যাংকটি সম্পূর্ণ ইসলামি শারি'আহ মুতাবিক পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠা কালীন ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ২২৫.০ মিলিয়ন টাকা, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪১২২.৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ২৬৯৬ জনশক্তি নিয়ে ১০৩টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকটি উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান করছে।

২০১৫ সালে ব্যাংকের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির শেয়ার ছিল ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির যথাক্রমে ২.৮ ও৩.২ শতাংশ। ২০১৫ সালে আমানত এবং বিনিয়োগ ও অগ্রিমের গড় মুনাফা হার ব্যবধান ৫.১ শতাংশ। ২০১৫ সালে ব্যাংকটির অতিরিক্ত তারল্যের স্থিতি ৬৫৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শিল্প ঋণ : ২০১৫ সালে ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত বিনিয়োগ ও অগ্রিমের মধ্যে শিল্প খাতে বিতরণের অংশ ২৫.৩ শতাংশ। ব্যাংকটি শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২০১৪ সালের তুলনায় ১.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ৬২১০৫.৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলতঃ সাম্প্রতিক সময়ে শিল্প খাতে বিনিয়োগ চাহিদা হ্রাসের কারণে বিতরণ হ্রাস পেয়েছে।

এসএমই ঋণ : ২০১৫ সালে ব্যাংকের মোট শিল্প বিনিয়োগের মধ্যে এসএমই-এর অবদান ৩৬.৯ শতাংশ। ২০১৪ সালের তুলনায় বিতরণের পরিমাণ ১৫.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২২৯০৩.০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৫ সালে ভোক্তা খাতে বিতরণ মোট বিতরণের মাত্র ০.১ শতাংশ দাঁাড়িয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণ : ২০১৪ সালে বিনিয়োগ খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ২৫২৬৩.৪ মিলিয়ন টাকা যা ২০১৫ সালে ৩৮.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৮৮৩.৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

নারী উদ্যোক্তা : ২০১৫ সালে ৩২৫ জন নারী উদ্যোক্তাকে ৫৬৭২.১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা ২০১৪ সালে নারী উদ্যোক্তা খাতে বিনিয়োগের তুলনায় ২৭.৩ শতাংশ বেশি।[৪২]

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৫ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখ থেকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে এবং ১ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়। ৩১ ডিসেম্বর

---

৪১. *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

২০১৫ তারিখ পর্যন্ত রাজধানীসহ সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে ব্যাংকের ১৪৮টি শাখা এবং নিজস্ব ১১১টি এটিএম বুথসহ নেটওয়ার্ক। এ ছাড়া ব্যাংকের রয়েছে অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, স্কুল ব্যাংকিং, এসএমই ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এসএমএস ব্যাংকিং, দ্রুতগতির রেমিট্যান্স সেবা, নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প ও কৃষি বিনিয়োগ প্রকল্প। ব্যাংকটি ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির আওতায় আর্তপীড়িত মানবতার সেবা ও দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ক্রীড়ার উন্নয়নে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কাজ করে আসছে।

২০১৫ সালে ব্যাংকের আমানত এবং বিনিয়োগ (ঋণ ও অগ্রিম) স্থিতির পরিমাণ ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির যথাক্রমে ২.৮ শতাংশ ও ৩.০ শতাংশ। মূলতঃ মানসম্পন্ন গ্রাহক সেবা ও আকর্ষণীয় মুনাফার কারণে আমানত স্থিতির বৃদ্ধি ঘটেছে এবং বিনিয়োগ দক্ষ ব্যবস্থপনার কারণে বিনিয়োগ স্থিতি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালে আমানত এবং বিনিয়োগের গড় মুনাফার হার ব্যবধান ২.২ শতাংশ। ২০১৫ সালে ব্যাংকটির অতিরিক্ত তারল্যের স্থিতি ২০১৪ সালের তুলনায় ১৮৭.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৬১৫.৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শিল্প ঋণ : ২০১৫ সালে ব্যাংকের বিতরণকৃত মোট বিনিয়োগের মধ্যে শিল্প বিনিয়োগের অংশ ৪.৯৫ শতাংশ। শিল্পে ব্যাংকের বিনিয়োগ বিতরণের পরিমাণ ২০১৪ সালের তুলনায় ৪৭.২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ৬৯৭২.১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

এসএমই ঋণ : ব্যাংক কর্তৃক ২০১৫ সালে এসএমই-খাতে ৫২৪০.০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়, যা মোট বিনিয়োগের ৩.৭ শতাংশ।

ক্ষুদ্র ঋণ : ২০১৪ সালে ক্ষুদ্র খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ৫৫.২ মিলিয়ন টাকা, যা ২০১৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৫৫.৭ মিলিয়ন টাকা।

নারী উদ্যোক্তা : ২০১৫ সালে ব্যাংক কর্তৃক ২০৫ জন নারী উদ্যোক্তাকে ১৭৬.৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা ২০১৪ সালে ১১৭ জন নারী উদ্যোক্তার বিপরীতে ৬২.৫ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৮২.৭ শতাংশ বেশি। মূলতঃ এ খাতে অধিক গুরুত্বারোপের কারণে বিতরণের বৃদ্ধি ঘটেছে।[৪৩]

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণসহ কল্যাণমুখী আর্থসামাজিক সেবার লক্ষ্যে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১০ মে ২০০১ তারিখে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম ইসলামি শারি'আহ মুতাবিক পরিচালিত হয়। ২০১৫ সাল শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন দাঁড়িয়েছে ৭৩৪৬.৯ মিলিয়ন টাকা।

২০১৫ সালে ব্যাংকের আমানত এবং বিনিয়োগ (ঋণ ও অগ্রিম) স্থিতির অংশ ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত এবং বিনিয়োগ (ঋণ ও অগ্রিম) স্থিতির যথাক্রমে ১.৩ শতাংশ ও ১.৬ শতাংশ। ব্যাংকের আমানত স্থিতি ২০১৪ সালের তুলনায় ১০.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ১০৯২৫৮.৭ মিলিয়ন

৪৩. *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

টাকায় দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে বিনিয়োগ (ঋণ ও অগ্রিম) স্থিতির পরিমাণ ২০১৪ সালের তুলনায় ১৫.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ৯৬৮৩৪.৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা আমানত স্থিতির ৮৮.৬ শতাংশ। ২০১৫ সালে আমানত এবং বিনিয়োগ (ঋণ ও অগ্রিম) গড় সুদহার ব্যবধান ৫.০ শতাংশ। ২০১৫ সালে ব্যাংকটির অতিরিক্ত তারল্যের স্থিতি ২০১৪ সালের তুলনায় ৩৯.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৪৭৭.০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শিল্প ঋণ : ২০১৫ সালে ব্যাংকের বিতরণকৃত মোট বিনিয়োগের মধ্যে শিল্প বিনিয়োগের অংশ ৪৭.৩ শতাংশ। শিল্প বিনিয়োগ বিতরণের পরিমাণ ২০১৪ সালের তুলনায় ৭০.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ১৮৬৫৪.০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলতঃ চলমান অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ থাকায় শিল্প ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি ঘটেছে।

এসএমই ঋণ : ২০১৫ সালে মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে এসএমই খাতের অবদান ৩৯.৮ শতাংশ। ২০১৪ সালের তুলনায় এসএমই খাতে বিনিয়োগ বিতরণ ৪৪.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ১৫৭০২.০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে ২০১৫ সালে ভোক্তা ঋণ বিতরণের অংশ মোট বিতরণকৃত ঋণের ৫.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণ : ২০১৫ সালে ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত বিনিয়োগ এর মধ্যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের শেয়ার ২০.১ শতাংশ। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিতরণের পরিমাণ ২০১৪ সালের তুলনায় ৯৩.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ৭৯৪৩.০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

নারী উদ্যোক্তা : ২০১৫ সালে ১৩৯ জন নারী উদ্যোক্তাকে ৮৩৬.০ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে, যা ২০১৪ সালে ১০৩ জন নারী উদ্যোক্তার বিপরীতে প্রদানকৃত ৯৭৬.০ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৪.৩ শতাংশ কম।[৪৪]

ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড

ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড ২০ মে ২০১৩ তারিখে যাত্রা শুরু করে। ব্যাংকটির মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৪৪টি শাখার মধ্যে Authorized Dealer (AD) শাখার সংখ্যা ৬টি।

২০১৫ সাল শেষে ব্যাংকের আমানত এবং বিনিয়োগ স্থিতি ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত এবং বিনিয়োগ স্থিতির উভয়ক্ষেত্রে ০.৭ শতাংশ, যা ২০১৪ সাল শেষে ছিল উভয়ক্ষেত্রে ০.৫ শতাংশ। ২০১৫ সালে ব্যাংকের আমানত এবং বিনিয়োগের গড় মুনাফা হারের ব্যবধান ছিল ৫.৯ শতাংশ। ২০১৫ সালে ব্যাংকের তারল্যের স্থিতি ২০১৪ সালের তুলনায় ৩৮.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮০৬২.৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শিল্প ঋণ : ২০১৫ সালে ব্যাংকের বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিম ১৭৫৪৪.১০ মিলিয়ন টাকার মধ্যে শিল্পঋণের অংশ ৮.৯ শতাংশ। শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২০১৫ সাল শেষে ১৫৫৯.৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

---

৪৪. *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

এসএমই ঋণ : ২০১৫ সালে মোট বিতরণকৃত ঋনের মধ্যে এসএমই খাতের অবদান ৪.০ শতাংশ। এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ ২০১৫ সালে ৭০৮.০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৫ সালে ভোক্তা ঋনের পরিমাণ ২২৮.৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে যা বিতরণকৃত ঋণের ১.৩ শতাংশ।

নারী উদ্যোক্তা : ২০১৫ সালে ইউনিয়ন ব্যাংক ১০ জন নারী উদ্যোক্তাকে ৪.০ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।[৪৫]

উপরিউক্ত পর্যালোচনার পর বলা যায় যে, ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত মোট ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক শারি'আহর নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। জন সাধারণের আগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বাংলাদেশ ব্যাংকও এসব ব্যাংকগুলোকে পরিচালনা করার জন্য বিশেষ প্রবিধিও প্রণয়ন করেছে।

৪৫. *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম

দিন দিন ইসলামি ব্যাংকিংয়ে আগ্রহ বাড়ছে। দেশে ৫৭টি ব্যাংকের মধ্যে পুরোদমে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে ৮টি ব্যাংক। এছাড়া ৯টি প্রচলিত সনাতনী ব্যাংকের ১৯টি শাখা এবং ৮টি প্রচলিত ব্যাংকের ২৫টি উইন্ডোর মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম চলছে। এসব ব্যাংক, শাখা এবং উইন্ডোতে মোট আমানতের পরিমাণ ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা। যা দেশের সকল ব্যাংকের মোট আমানতের শতকরা ১৮.২৮ ভাগ। ২০১৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা। একইভাবে বিনিয়োগের পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৪৬]

ইসলমি ব্যাংকিং প্রসার পেলেও দেশে এখন পর্যন্ত ইসলামি ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য পূর্ণাঙ্গ কোন নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত নেই। সাধারণ ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি এক বিশাল অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে ইসলামি ব্যাংক। তাই সংশ্লিষ্টরা শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা দাবি করে আসছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চলতি বছরের জুন শেষে দেশের ব্যাংকগুলোতে ১১১২টি ইসলামি ব্যাংকিং শাখা রয়েছে। ২০১৪ সালের জুন শেষে এ পরিমাণ ছিল ৮৮৭টি। অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে ২২৫টি। বর্তমানে ইসলামি ধারার ৮টি ব্যাংকের শাখা রয়েছে ১০৬৮টি। ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বর্তমানে বিনিয়োগ হয়েছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা। ৩ বছর পূর্বের একই সময়ে যা ছিল ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৯৬ কোটি টাকা। এ সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে বিনিয়োগ এবং কমেছে উদ্বৃত্ত তারল্যের পরিমাণ। বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকিংয়ে উদ্বৃত্ত তারল্যের পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৮৮৬ কোটি টাকা। ৩ মাস পূর্বে যা ছিল ৮ হাজার ৩২ কোটি টাকা। আর ৩ বছর পূর্বে এর পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া বিনিয়োগ-আমানতের অনুপাত ৩ বছর পূর্বের চেয়ে বেশ পরিবর্তন হয়েছে। ৩ বছর পূর্বে ছিল শতকরা ০.৮৫ ভাগ আর এখন তা ০.৯৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

ইসলামি ধারার ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে দেশে বেশি রেমিট্যান্স আসে। বিশেষ করে ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে। ২০১৭ সালের জুন মাস শেষে দেখা গেছে, ৮ হাজার ৮৬৭ কোটি টাকা এসেছে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। যা গত ৩ মাস পূর্বের চেয়ে শতকরা ৩৩.১৩ ভাগ বেশি। ইসলামি ব্যাংকিংয়ের গুরুত্ব অনুধাবন ও প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের চেয়ে লাভজনক হওয়ায় অনেক ব্যাংকই প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে শারি'আহভিত্তিক ব্যাংক হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করেছে। আর যে সব প্রচলিত ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে তারা ইসলামি ব্যাংকিংয়ে তাদের জনশক্তি বাড়াচ্ছে। বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকিংয়ে মোট জনশক্তি রয়েছে প্রায় ৩০ হাজার ৩৩৬ জন।

---

৪৬. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*, Ibid, pp. 52-53

জানা যায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা গ্রাহক পর্যায়ে হস্তক্ষেপ-সক্ষমতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং অ্যাপ্রোচ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ও কল্যাণমূলক প্রণোদনার কারণে ইসলামি ব্যাংকগুলো তরুণ-যুবকসহ বিপুলসংখ্যক গ্রাহক আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, কল্যাণ ও গ্রাহককেন্দ্রিক মডেলের কারণে অনেক ঋণগ্রহীতা ও আমানতকারী ইসলামি ব্যাংকিং পছন্দ করেন।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ইসলামি অর্থায়ন নিয়ে বলা হয়েছে, প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের তুলনায় ইসলামি অর্থব্যবস্থা এখন যৎসামান্য। তবে আস্থা ও ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসের কারণে এ খাতে মুসলিম বিশ্বের যে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে তাতে এটা অনেক সম্ভাবনাময় একটা খাত।

বাংলাদেশের ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক হলো– ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ফার্স্ট সিকিউরিটিজ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এক্সিম ব্যাংক), সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড।

এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা বলেন, বাস্তবভিত্তিক ব্যাংকিং এবং যথাযথ নিয়ম মেনে ঝুঁকি মুকাবিলা করার কারণে টেকসই ব্যাংকিং হিসেবে ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামি ব্যাংকগুলোর সাফল্য দেখে এর প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। এ আগ্রহ শুধু মুসলিম প্রধান দেশে হচ্ছে তা নয়, অমুসলিম প্রধান রাষ্ট্রেও ইসলামি ব্যাংকিংয়ের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসায়িক মুনাফা নয়; সমাজ উন্নয়ন ও মানবতার সেবাই ইসলামি ব্যাংকিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য– এটাই জনসাধারণের কাম্য।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান আবুল কাসেম হায়দার বলেন, দেশের অনেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামি ধারায় বিনিয়োগ করছে। সাধারণ ধারার ব্যাংকগুলোও ইসলামিক উইন্ডো ও শাখা খুলে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে এখন পর্যন্ত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা নেই। শিগগিরই বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে দেশ ও জাতির প্রভূত কল্যাণ হবে এটাই সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশা।

প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডো[৪৭]

ক্রম.	ব্যাংকের নাম	ইসলামি ব্যাংকিংয়ে রূপান্তরের সাল
১.	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	২০১০
২.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	২০১০
৩.	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩
৪.	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫

৪৭. *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম* ২০১৫-২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০, ৪২, ৬৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৬, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৬

ক্রম.	ব্যাংকের নাম	ইসলামি ব্যাংকিংয়ে রূপান্তরের সাল
৫.	সাউথ-ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩
৬.	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩
৭.	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	২০০৯
৮.	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩
৯.	দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড (আল-মানারাহ)	২০০৩
১০.	এবি ব্যাংক লিমিটেড	২০০৪
১১.	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	২০০৮
১২.	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২০০৮
১৩.	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	২০০৪

বৈদেশিক ব্যাংকগুলোতে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডো[৪৮]

ক্রম.	ব্যাংকের নাম	ইসলামি ব্যাংকিংয়ে রূপান্তরের সাল
১.	ব্যাংক আল-ফালাহ	১৯৯৮ (প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহরাইন, পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করা হয় শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন)
২.	স্টান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক	২০০৪ (সাদিক)
৩.	এইচএসবিসি	২০০৪ (আমানাহ) বর্তমানে বন্ধ
৪.	ব্যাংক আল-আরাফাহ	২০০৫ (একটি শাখা)

‘সুদ হারাম; ব্যবসা হালাল’ মূলনীতির উপর বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং গড়ে উঠেছে। একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকের কিছু শাখা ও উইন্ডোও একই ধারায় পরিচালনা করার প্রয়াস পেয়ে যাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণ। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিদেশি ব্যাংকও ইসলামি আদর্শের আলোকে ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ইসলামি ধারার ব্যাংকের ও শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচার-আচরণ, গ্রাহককে সেবা প্রদানের মানসিকতা সবকিছুতেই ভিন্ন ধরনের একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ এ ধারার ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে লেনদেন করতে সবচেয়ে নিরাপদ মনে করে। এ কারণে বিশ্বব্যাপী ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ধারণা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

৪৮. *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭, ১৪৪-১৪৫

চতুর্থ অধ্যায়

শারি‘আহ আইন এর পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ : শারি‘আহ আইন এর সংজ্ঞা, উৎস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শারি‘আহ আইন-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ব্যবসা-বাণিজ্যে শারি‘আহ-এর নীতিমালা

চতুর্থ অধ্যায়

শারি‘আহ আইন এর পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শারি‘আহ আইন এর সংজ্ঞা, উৎস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সমাজের প্রত্যেকেরই রয়েছে নানাবিধ চাহিদা। ব্যক্তি একাই নিজের সে সব চাহিদা মিটাতে সক্ষম নয়। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে সমাজের অন্যদের সহযোগিতার প্রতি তাকে মুখাপেক্ষী হতে হয়। ফলে স্বভাবতই সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষের জীবন সমাজবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সমাজের সকলের অধিকারকে সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজন একটা পরিপূর্ণ আইনি ব্যবস্থা ও বিধানের; যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করবে, অধিকারের সীমা নির্দিষ্ট করে দিবে ও প্রত্যেকের স্বেচ্ছাচারিতাকে আইনের দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করবে। এ ব্যবস্থা না হলে মানুষের সামষ্টিক জীবন খুবই দুষ্কর হয়ে পড়বে। কেননা মানুষের একটা প্রবণতা হচ্ছে নিজের সুবিধা ও স্বার্থকে বড় করে দেখা। এ প্রবণতা যদি আইন দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে পারস্পরিক জুলুম-নির্যাতন বেড়ে যাবে, অধিকার ক্ষুণ্ন হবে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। আর প্রতাপশালী ও কূটজাল বিস্তারকারীদের দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং মানুষ সবসময়ই সুশৃঙ্খল আইন-কানুন সম্বলিত এমন এক জীবনব্যবস্থা মেনে চলার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করেছে, যাতে সমাজের সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়, কেউ কারও অধিকার হরণ করতে না পারে এবং কেউই তার নিজের সীমালঙ্ঘন করে অন্যের সীমায় অনুপ্রবেশ করতে না পারে। বস্তুত একটা সুষম, কল্যাণমুখী ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের পক্ষে সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ-জীবন যাপন করা কোনমতেই সম্ভবপর নয়। এজন্যই আল্লাহতা‘আলা মানবজাতির প্রতি রহমত স্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন এক মহান শারি‘আহ বিধান তথা সার্বিক আইন ও বিধান যার ভিত্তিতে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সার্থক সমাধান এবং তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের সুষ্ঠু মীমাংসা ও নিষ্পত্তি হতে পারে। মহান আল্লাহর নাযিলকৃত শারি‘আহ তাঁর অগণিত অন্যান্য সকল নি‘আমতের মতই বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিরাট রহমত হয়ে দেখা দিয়েছে। আল্লাহতা‘আলা বলেন–

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

‘এর পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি এর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।’[১]

বস্তুত আল্লাহর শারি‘আহই হচ্ছে তাঁর বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক ন্যায়পরায়ণতা স্থাপনের যথার্থ বিধান। আল্লাহতা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে নিজ নিজ জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী করে ছেড়ে দেন নি। বরং তাদেরকে প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত করেছেন ইসলামি শারি‘আহর বিধান

১. আল-কুরআন, ৪৫ : ১৮

উপস্থাপন করে। মানব রচিত কোন বিধানই প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত ও পবিত্র নয়। তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হচ্ছে আল্লাহতা'আলার শারি'আহর বিধান। কেননা তিনিই মানবের সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং সৃষ্টির প্রয়োজন ও তা পূরণ করার পরিপূর্ণ বিধান তিনি ছাড়া আর কেউই যথাযথভাবে প্রদান করতে সক্ষম নয়।

অতএব ইসলামি শারি'আহ মেনে নেয়া ইমান ও ইসলামের অনিবার্য দাবি। আল্লাহতা'আলা বলেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُه أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلاً مُّبِيْنًا.

'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।'[২]

আল্লাহতা'আলা আরও বলেন–

فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে উহা মেনে না নেয়।'[৩]

কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় মুসলিম দেশসমূহ দীর্ঘকাল ধরে ঔপনিবেশিকতার যাতাকলে থেকে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আকিদাগত নানা বিপর্যয়ের মুখোমুখী হয়েছে; কেননা ঔপনিবেশবাদীরা মুসলিমদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের চালচলনকে ইসলামের মূলধারা থেকে বিচ্যুত করে নেয়ার যাবতীয় চেষ্টা-তদবির করতে কোন প্রকার ত্রুটি করেনি। তারা অবশেষে এ সকল মুসলিম দেশসমূহ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেও পিছনে রেখে গেছে তাদের অনৈসলামি চিন্তা-চেতনার অত্যন্ত প্রভাবশালী স্বাক্ষর, যা রেখাপাত করেছে মুসলিমদের কার্যগত ও চারিত্রিক জীবনের বহুক্ষেত্রে এবং পাল্টে দিয়েছে তাদের চিন্তাধারা ও আইনি প্রক্রিয়ার অনেক কিছু। এর ফলে মুসলিম সমাজের বিরাট একটা অংশ হারিয়েছে তাদের বিবেকের স্বাতন্ত্র্যবোধ, মানসিকতায় ফুটে উঠেছে পরাধীনতা ও হীনমন্যতা।

মিশনারি, প্রাচ্যবিদ এবং তাদের দোসর ও তল্পীবাহীদের মাধ্যমে যে চিন্তাধারা ও দর্শন মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষিত সমাজে অত্যন্ত সুকৌশলে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তন্মধ্যে একটা হল এই যে– 'ইসলামি শারি'আহ একটা প্রাচীন জীবন পদ্ধতি, যা এ যুগে অচল এবং আধুনিক জীবনের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা ও প্রগতির বিভিন্ন উত্থান-পতনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সামর্থ্য তার নেই। অতএব শারি'আহ অনুসরণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা দেয়। কেননা শারি'আহ আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের পুরনো। সে যুগ আর বর্তমান যুগ এক নয়। সে পরিবেশ ও বর্তমান পরিবেশ এক নয় এবং সে যুগের লোকেরা আজকের প্রগতিশীল লোকদের থেকে ভিন্ন

২. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৬
৩. আল-কুরআন, ৪ : ৬৫

প্রকৃতির ছিল।' এভাবে তারা বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেও যখন মুসলিমদের বৃহত্তর অংশকে বিচ্যুত করতে ব্যর্থ হলো, তখন তারা আবারো এ কথা বলে আঘাত হানল যে, 'শারি'আহ আইনের উৎস কুরআন নয়।' নিচে শারি'আহ আইন-এর সংজ্ঞা, উৎস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হলো–

শারি'আহ আইন-এর সংজ্ঞা

শারি'আহ (شريعة) একটা আরবি একবচনের শব্দ, বহুবচনে শারায়ি' (شرائع); যা আরবি শিন, রা ও আইন (ش ر ع) তিনটি মূলবর্ণ থেকে উৎপন্ন। এর আভিধানিক অর্থ হলো– 'দীন, জীবন-পদ্ধতি, ধর্ম, জীবনাচার, নিয়মনীতি ইত্যাদি।'[৪] তবে আরবি ভাষায় শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো– 'পানির উৎসস্থল বা যে স্থান থেকে পানি উৎসারিত হয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সেখানে এসে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে।'[৫] অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে শারি'আহ-এর আভিধানিক অর্থ হলো– পানি পান করার স্থান, ঘাট, ঝর্ণা, জলাশয় বা কূপে যাওয়ার পথ, অনুসরণীয় স্পষ্ট পথ, অভ্যাস, আইন, বিধান, পথ, পন্থা, ইত্যাদি।[৬] আল্লামা রাগিব ইস্পাহানি রহ. বলেন, 'শারি'আহকে এ নামে অভিহিত করার কারণ, যে ব্যক্তি যথার্থভাবে শারি'আত গ্রহণ করবে সে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারীর ন্যায় পবিত্র হয়ে যায়।[৭]

এ অর্থে মহান আল্লাহতা'আলা ঘোষণা করেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِه نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِه اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ

'তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি অহি করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ইসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ কর না।'[৮]

শারি'আহ শব্দটি শির'আত উচ্চারণে যে জীবন পদ্ধতির অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ

'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শারি'আহ ও জীবন-পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি।'[৯]

Wikipedia, the free Encyclopedia তে শারি'আহ সম্পর্কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, Sharia (Arabic : شريعة transliteration: Šarī`ah) is the body of Islamic religious law. The term means "way" or "path to the water source"; it is the legal framework within which the public and some private aspects of life are regulated for those living in a legal system based on Islamic principles of jurisprudence and for Muslims living outside the domain. **Sharia** deals with many aspects of day-to-day life, including politics, economics, banking, business, contracts, family, sexuality, hygiene, and social issues.

---

৪. ইসমাইল ইবন হাম্মাদ আল-যাওহারি, *আস-সিহাহ*(কায়রো : দারুল হাদিস, ২০০৯), পৃ. ৫৯২

৫. ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*(কুয়েত : দারুন নাওয়াদির, ২০১০), খ.১০, পৃ. ৪০-৪১

৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০

৭. আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানি, *আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন*(রিয়াদ : মাকতাবাতু নাজ্জার মোস্তফা আল-বায, তা.বি.), পৃ. ৩৪০

৮. আল-কুরআন, ৪২ : ১৩

৯. আল-কুরআন, ৫ : ৪৮

পরিভাষায় শারি‘আহ-এর সংজ্ঞায় প্রখ্যাত তাবিয়ি কাতাদাহ রহ. বলেন– ‘শারি‘আহ হচ্ছে আল্লাহতা‘আলার পক্ষ থেকে আরোপিত নির্দেশ, নিষেধাজ্ঞা, সীমারেখা ও ফারায়িজ।’[১০]

ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, ‘আল্লাহতা‘আলা যেসব আকিদা ও আমল মানুষের জন্য প্রণয়ন করেছেন, তা-ই শারি‘আহ।’[১১] তিনি অন্যত্র বলেছেন, ‘আল্লাহতা‘আলা, রাসুলুল্লাহ সা. ও উলুল আমর তথা মুসলিম প্রশাসক ও আমির-এর আনুগত্য করা।’[১২]

শারি‘আতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে মওলানা আবদুর রহীম বলেন,

الشريعة هي الطريقة الْمستقيمة التي يفيد منها الْمستميكون بها هداية وتوفيقا.

‘এক সুদৃঢ় ঋজু পথ, যদ্বারা তার অবলম্বনকারী লোকেরা হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড লাভ করতে পারে।’[১৩]

ড. আবদুল কারিম জাইদান বলেন, ‘মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যেসব বিধি-বিধান জারি করেছেন তাকে শারি‘আত বলা হয়। সে বিধান কুরআন অথবা রাসুলুল্লাহ সা.-এর বাণী, কর্ম বা সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে।’[১৪]

মান্না খলিল আল কাত্তান বলেন,

ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والْمعاملات ونظم الحياة في شعبها الْمختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.

‘আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য আকিদা, ইবাদত, আখলাক, লেনদেন ও জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে বান্দাদের সাথে তাদের প্রভুর ও তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক পরিচালনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি লাভের জন্য যেসব বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছেন তা-ই শারি‘আহ।’[১৫]

ইসলামি শারি‘আহ-এর সংজ্ঞা আরও সহজভাবে এভাবে দেয়া যায় যে, ‘আল্লাহতা‘আলা জীবন ও জগত পরিচালনার জন্য রাসুলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে স্বীয় বান্দাদেরকে যে সার্বিক হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান প্রদান করেছেন, তা-ই হলো ইসলামি শারি‘আহ।’ এ সংজ্ঞার আলোকে আল্লাহতা‘আলার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও এতদুভয়ের ভিত্তিতে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মাকরুহ ও হারাম ইত্যাদি যে সকল বিধান প্রণয়ন করা হয় তা হচ্ছে শারি‘আহ।

আশ-শারি‘আহ বলতে সাধারণত ‘আদ-দীন’ তথা সার্বিক ইসলামি জীবন বিধানকে বুঝানো হয়। তবে ‘শারি‘আহ’ বলতে কখনো ইসলামের আইনগত দিককেও বুঝানো হয়ে থাকে। সেটা হচ্ছে শারি‘আহ খাছ বা বিশেষ অর্থে শারি‘আহ।

---

১০. আল-জামি লিআহকামিল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২১১

১১. ইবন তাইমিয়া, *মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া*(মদিনা মুনাওয়ারা : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ২০০৪), খ. ১৯, পৃ. ৩০৬

১২. ইবন তাইমিয়া, *মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ৩০৯

১৩. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ৯

১৪. ড. আবদুল কারিম জাইদান, *আল-মাদখাল রিদ দিরাসাতিশ শারি‘আতিল ইসলামিয়াহ*(আলেকজান্দ্রিয়া : দারু উমর ইবনুল খাত্তাব, ১৯৬৯), পৃ. ৩৯

১৫. মান্না আল কাত্তান, *তারিখুত তাশরিইল ইসলামি*(কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ৫ম প্রকাশ, ২০০১), পৃ. ১৪

অতএব মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কল্যাণে যে বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছেন তাকেই শারি'আহ বলা হয় এবং শারি'আহ-এর এ বিধি-বিধান মূলত কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে নির্ধারিত।

ইসলামি শারি'আহ-এর উৎস

ইসলামি শারি'আহ-এর উৎস প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত। (১) মুখ্য ও মৌলিক উৎস (২) গৌণ ও সম্পূরক উৎস। ইসলামি শারি'আহ-এর মুখ্য ও মৌলিক উৎস চারটা। সেগুলো হলো–[১৬]

(১) আল-কুরআন; (২) আস-সুন্নাহ; (৩) আল-ইজমা ও (৪) আল-কিয়াস।

এগুলোর পাশাপাশি ইসলামি শারি'আহ-এর কয়েকটা সম্পূরক ও গৌণ উৎস রয়েছে। সেগুলো হলো–[১৭] (১) ইসতিহসান; (২) ইসতিসলাহ বা মাসালিহ মুরসালা; (৩) শারউ মান কাবলানা বা পূর্ববর্তী শারি'আত; (৪) ইসতিসহাব; (৫) আমালু আহলিল মদিনা; (৬) উরফ ও রেওয়াজ; (৭) কাওলুস সাহাবি;

ইসলামি শারি'আহ-এর মুখ্য ও মৌলিক উৎসগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ :

আল-কুরআন আল-কারিম : ইসলামি শারি'আহ-এর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে আল-কুরআন আল-কারিম। এ ব্যাপারে সকল সাহাবা কিরাম রা., সকল যুগের ইমামগণ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফুকাহা ও সকল উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য ও ইজমা প্রতিষ্ঠিত। ইসলামি শারি'আহ-এর সকল বিধানই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কুরআনুল কারিম থেকে উৎসারিত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহতা'আলা নিজেই শারি'আহ প্রণয়নকারী।[১৮]

আল-কুরআনকে মোটামুটি তিনভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যথা– (ক) আভিধানিক (খ) পারিভাষিক ও ব্যবহারিক এবং (গ) অবয়বগত সংজ্ঞা।

আল-কুরআন-এর আভিধানিক সংজ্ঞা : বিশ্লেষণধর্মী 'আলিমগণ আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) শব্দের বিশ্লেষণে কয়েকটি মত প্রদান করেছেন। কারো কারো মতে, আল-কুরআন শব্দটা মাহমুয বা হামযাযুক্ত। আবার কারো কারো মতে, তা হামযাযুক্ত নয়। আরবি قُرْاٰنٌ শব্দটা قَرَأَ–يَقْرَأُ ক্রিয়ার বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ থেকে মাসদার বা ক্রিয়ামূল। আয-যাজ্জাজের মতে قَرَأَ–يَقْرَأُ ক্রিয়ার বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ এর ক্রিয়ামূল (مصدر)। আল-লিহয়ানির মতে, قَرَأَ يَقْرَأُ ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল তিনভাবে হয়ে থাকে : (১) قَرْأٌ (২) قِرَاءَةٌ এবং (৩) قُرْاٰنٌ

এ ক্রিয়াটা মূলে সকর্মক ক্রিয়া (فعل متعدي) হলেও কোন কোন সময় সকর্মক ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশের জন্য এর সাথে অতিরিক্ত একটি ب (বা) হরফ যুক্ত হয়। যেমন, قَرَأْتُ الْقُرْاٰنَ (আমি কুরআন পাঠ করেছি), এ একই অর্থে আবার قَرَأْتُ بِالْقُرْاٰنِ (আমি কুরআন পাঠ করেছি) ব্যবহৃত হয়।[১৯]

---

১৬. মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী, অনূঃ আবদুল মান্নান তালিব, *ইসলামি ফিকহের ঐতিহাসিক পটভূমি*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ডিসেম্বর ২০১৪), পৃ. ৬২

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৭৭

১৮. আল-কুরআন, ৪৫ : ১৮

১৯ ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *কুরআন পরিচিতি*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫), পৃ. ১

قَرْءٌ শব্দটা পাঠ করা এবং একটা বিষয়কে অপর একটা বিষয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করার অর্থও প্রকাশ করে। একটা বর্ণকে অপর একটা বর্ণের সাথে মিলিয়ে উচ্চারণ করা হলে তাকে قِرَاءَةٌ (কিরাআত) বলা হয়।[২০]

قُرْاٰنٌ পঠিত (مَفْعُوْلٌ = مَقْرُوْءٌ) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় এর অর্থ হয় সে গ্রন্থ, যা পাঠ করা হয় তথা পঠিত।[২১]

প্রসিদ্ধ আরবি ভাষাবিদগণের মতে, القُراٰنُ শব্দটি মাছদার। যা قِرَاءَةٌ শব্দের সমার্থবোধক। قُراٰنٌ শব্দটি এর ক্রিয়ামূলের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে বহুল ব্যবহারের কারণে আল্লাহ্‌র বাণী সমষ্টির নাম ধারণ করেছে।[২২]

القُراٰنُ শব্দটি মাছদার, যা ق ر ء ধাতুমূল (মাদ্দাহ্‌) থেকে উৎকলিত। যেমন বলা হয়, قَرَأَ قِرَاءَةً وَقُرْاٰنًا- পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে-[২৩] إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْاٰنَه فَإِذَا قَرْأْنَاه فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَه

কুরআন (قُراٰنٌ) শব্দটাতে হামযা অক্ষর (قُرْءَانٌ) রয়েছে। কোন কোন ইমাম এটাকে হামযা ছাড়া (قُراٰنٌ) উল্লেখ করেছেন। সে অবস্থায় এর অর্থ হবে قَرَنَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ অর্থাৎ কোন একটা বিষয়কে অন্য একটা বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইমাম শাফি‘ঈ, বৈয়াকরণ আল-ফাররা ও আবুল হাসান ‘আলি ইবন ইসমাইল আল-আশ‘আরি রহ. আল-কুরআনকে হামযা ছাড়া (قُرْاٰنٌ) উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফি‘ঈ এটাও বলেছেন যে, আল-কুরআন শব্দটা কুরআন মাজিদের নাম। কুরআন (قُرْاٰنٌ) শব্দটা হামযাযুক্তও নয় এবং অন্য কোন শব্দ হতে গঠিতও নয়; বরং এটা হচ্ছে এমন একটা গ্রন্থ সংকলন, যা আল্লাহতা‘আলা তাঁর রাসুল সা.-এর উপর নাযিল করেছেন। তিনি আরও বলেন, কুরআন (قُرْاٰنٌ) শব্দটাকে যদি কিরাআত (قِرَاءَةٌ) ক্রিয়ামূল হতে উদ্ভূত বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে পাঠ করা হয় এমন সব বিষয়কেই কুরআন নামে অভিহিত করতে হবে। কিন্তু তা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল যেমন আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী ছিল, তেমনই কুরআনও আল্লাহতা‘আলার নাযিলকৃত বাণী।[২৪]

---

২০ "قَرَأْتُ الشَّيْءَ قُرْآنًا: جمعته وضممت بعضه بعضا" দ্র. মাজদুদ দীন আল ফিরূযাবাদি, *বাসাইরু যাবিত তাময়িয ফি লাতাইফি কিতাবিল আযিয*(কায়রো : ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, মিশর, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৬ হি.), খ. ৪, পৃ. ২৬২-২৬৩

২১ আবুল ফদল জামালউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*(কুয়েত : ইসলামি, ওয়াকফ, দা‘ওয়াহ্ ও ইরশাদ মন্ত্রণালয়, কুয়েত, বিশেষ প্রকাশনা, ১৪৩১ হি., ২০১০ খ্রি.), খ.৩, পৃ. ৪৩; সাইয়িদ মুরতযা আল হুসাইনি আযযাবিদী, *তাজুল ‘আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস*(কুয়েত : মাতবা‘আতু হুকুমাতিল কুয়েত, ১৩৮৫ হি.,), খ.৮, পৃ. ৫২৪

২২ أما لفظ القرآن فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة ثم نقل من هذا الْمعنى الْمصدري وجعل اسماً للكلام الْمعجز الْمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق الْمصدر على مفعوله، ذلك مما نختاره استناداً إلى موارد اللغة وقوانين الإشتقاق واليه ذهب اللحياني وجماعة দ্র. মুহাম্মাদ আব্দুল আযিম আয-যারকানি, *মানাহিলুল ‘ইরফান ফি উলুমিল কুরআন*(মদিনা মুনাওয়ারা : দার ইবন আফফান, ১৪১১ হি.), খ.২, পৃ. ১৩-১৪

২৩ ‘এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করার দায়িত্ব আমারই। অতএব যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।’ দ্র. আল কুরআন, ৭৫ : ১৭-১৮

২৪ আবুল ফদল জামালউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৪৪; আয-যারকানি, *মানাহিলুল ‘ইরফান ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৪

আল-আশ‘আরির মতে, قَرَنَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ থেকে اَلْقُرْآنُ উদ্ভুত। এর অর্থ– একটি বস্তু অপর বস্তুর সাথে সংযোজিত হয়েছে। কুরআন মাজিদের সুরাসমূহ এবং আয়াতগুলো পরস্পরের সাথে সংযোজিত বলে তাকে কুরআন বলা হয়।

ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন,[২৫]

كان الشافعي يهمز "قرأت" ولا يهمز القرآن، ويقول: هو اسم لكتاب الله غير مهموز.

আরবি ভাষাবিদ আল-ফাররার মতে, আল-কুরআন নামটি আল-কারাইন (القرائن) থেকে উদ্ভুত। এটা করিনা (قرينة) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ অনুরূপ। যেহেতু কুরআনের একটা আয়াত অপর আয়াতকে সত্যায়ন করে এবং এক আয়াত অপর আয়াতের অনুরূপ। এ কারণে ‘কুরআন’ কে কুরআন বলা হয়।

জাহিলি যুগে ‘আরবগণ কারাআ (قَرَأَ) শব্দটি তিলাওয়াত (تِلَاوَةٌ) অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অর্থেও ব্যবহার করত। যেমন তারা বলত,[২৬]

مَا قَرَأَتْ هٰذِهِ النَّاقَةُ سَلًى قَطُّ

প্রাক-ইসলামি যুগের কবি ‘আমর ইবন কুলসুমের কবিতায়ও শব্দটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–[২৭]

تُرِيْكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى خَلَاءٍ   وَقَدْ أَمِنْتَ عُيُوْنَ الْكَاشِحِيْنَا

ذِرَاعِي عَيْطَلٍ أَدَمَاءَ بِكْرٍ   هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِيْنَا

“শত্রুগণের চোখ এড়িয়ে ঢুকবে যখন সঙ্গোপনে, আমার প্রিয়ার রূপ মাধুরী দেখতে পাবে দুই নয়নে।
আমার প্রিয়ার যুগল বাহু দীর্ঘ নিটোল, শুভ্র উজল, কণ্ঠ-দরাজ শুভ্র সতেজ, বন্ধ্যা-উটের জঙ্ঘা যুগল।”[২৮]

আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনুস সারি আয-যাজ্জাজ, আবুল হাসান ‘আলি ইবনুল হায লুগাবি আল-লিহয়ানি প্রমূখ পণ্ডিতগণের একটা বৃহৎ দল এটাকে হামযাসহ (قُرْءَانٌ) পাঠ করেন। আয-যাজ্জাজের মতে (قُرْءَانٌ) শব্দটা (فُعْلَانٌ) এর সমওজনের। যেমন, فُرْقَانٌ, এবং (قرء) হতে উদ্ভুত। এর অর্থ সন্নিবেশ করা। যেমন, পানি হাওজে জমা করা হলে বলা হয়– "قَرَأَ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ" আল লিহয়ানি বলেন, কুরআন (قُرْءَانٌ) শব্দটা হামযাযুক্ত এবং قَرَأَ ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল। তাঁর মতে, (قُرْءَانٌ) শব্দটা اَلرُّجْحَانُ، اَلْكُفْرَانُ، اَلْغُفْرَانُ শব্দের সমওজনের। এটা قَرْءٌ শব্দ হতে গঠিত এবং এর অর্থ

---

২৫ ‘ইমাম শাফিঈ রহ. "قرأت" শব্দকে হামযা বিশিষ্ট বলেন। কিন্তু কুরআনকে হামযা বিশিষ্ট বলেন না। তার মতে, এটা হামযা বিশিষ্ট নয়। বরং তা আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের একটি নাম।’ দ্র. বদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আয-যারকাশি, *আল বুরহান ফি উলুমিল কুরআন*(কায়রো : দারুল হাদিস, ১৪২৭ হি.), পৃ. ১৯৫

২৬ ‘এ উষ্ট্রীটি কখনো গর্ভবতী হয়নি এবং বাচ্চা জন্ম দেয়নি।’ দ্র. আল-ফিরূযাবাদি, *বাসাইরি যাবিত তাময়িয*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২৬২-২৬৩

২৭ ‘নিম্নমানের উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করেনি।’ দ্র. আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন ইবন আহমদ আয যাওযানি, *শারহু আল-মু‘আল্লাকাতুস সাব‘আ*(বৈরুত : আদ দারুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১১৫

২৮ ‘আমর বিন কুলথুম, অনুঃ মৌলানা নূরুদ্দীন আহ্‌মদ, *’অস্-সব্‘উ-ল্-মু‘অল্লকাত*(ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড, ১ম প্রকাশ, ১৯৭২), পৃ. ১৭৮

তিলাওয়াত বা পাঠ করা। প্রকৃতপক্ষে এটাই সঠিক। কেননা, শব্দের বিচারে قُرْاٰنٌ শব্দটা ক্রিয়ামূল এবং কিরাআতের সমার্থক। যেমন, কবি হাসসান বিন ছাবিত রা. হযরত উসমান রা. এর স্মরণে বলেন,[২৯]

ضَحَّوْا بِأَشْمَط عُنْوَانُ السَّجُوْدِ بِه
يُقَطِّعُ اللَّيْلَ تَسْبِيْحًا وَقُرْاٰنًا.

মূলত সকল আসমানি গ্রন্থের সারবস্তু এতে জমা করা হয়েছে বলে তাকে কুরআন বলা হয়।[৩০] প্রকৃতপক্ষে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানই কুরআন মাজিদে সন্নিবেশিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৩১]

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

আল্লাহতা'আলা আরো বলেন,[৩২]

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ.

কুরআন শব্দটি পাঠ করা অর্থে ব্যবহার করে হামযাসহ আল্লাহতা'আলা উল্লেখ করেছেন,[৩৩]

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْاٰنَه فَإِذَا قَرْأْنَاه فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَه.

পবিত্র কুরআনের ৬১ আয়াতে 'কুরআন' শব্দটার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৪] কুরআনে ৬৯ বার قُرْاٰنٌ শব্দটার উল্লেখ রয়েছে।[৩৫]

আল-কুরআন-এর পারিভাষিক ও ব্যবহারিক সংজ্ঞা : ইসলামি শারি'আতের পারিভাষায় ও ব্যবহারিক অর্থে 'আল-কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহতা'আলার সে মহাগ্রন্থ, যা তিনি তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সা.-এর উপর নাযিল করেছেন এবং সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক বর্ণনারীতিতে তা বর্ণিত হয়েছে।' বলা হয়েছে–

أما الكتاب هو القرآن الْمنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمكتوب في الْمصاحف الْمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا بلا شبهة.

'কিতাব বলতে এমন কুরআনকে বুঝায়, যা রাসুলুল্লাহ সা.-এর উপর নাযিল করা হয়েছে। এটি মুসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি নবী কারিম সা.-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির[৩৬] পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।'[৩৭]

---

২৯ হাসসান ইবন ছাবিত রা., *দিওয়ান*(বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৪৪

৩০ ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন*(বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়ান, ৪র্থ সং., ১১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ২৪৪

৩১ 'আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি– মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয় স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ।' আল কুরআন, ১৬ : ৮৯

৩২ 'কিতাবে কোনো কিছুই আমি বাদ দেইনি।' দ্র. আল কুরআন, ৬ : ৩৮

৩৩ এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করবার দায়িত্ব আমারই। অতএব যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।' দ্র. আল কুরআন, ৭৫ : ১৭-১৮

৩৪ ইমাম যাদা হাসানি, *ফতহুর রহমান লি তাবিলিল আয়াতিল কুরআন*(বৈরুত : আল মাতবাতু আল আহ্লিয়্যাহ্, ১২২৩ হি.), পৃ. ৩৫৮-৩৫৯

৩৫ আল কুরআন, ২:১৮৫, ৪:৮২, ৫:১০১, ৬:১৯, ৭:২০৪, ৯:১১১, ১০:১৫, ৩৭, ৬১, ১২:২, ৩, ১৩:৩১, ১৫:১, ৮৭, ৯১, ১৬:৯৮, ১৭:৯, ৪১, ৪৫, ৪৭, ৬০, ৭৮, ৮২, ৮৮, ৮৯, ১০৬, ১৮:৫৪, ২০:২, ১১৩, ১১৪, ২৫:৩০, ৩২, ২৭ : ১, ২, ৭৬, ৯২, ২৮:৮৫, ৩০:৫৮, ৩৪:৩১, ৩৬:২, ৬৯, ৩৮:১, ৩৯:২৭, ২৮, ৪১:৩, ২৬, ৪৪, ৪২:৭, ৪৩:৩১, ৪৬:২৯, ৪৭:২৪, ৫০:১, ৪৫, ৫৪:১৭, ২২, ৩২, ৪০, ৫৫:২, ৫৭:৭৭, ৫৯:২১, ৭২:১, ৭৩:৪, ২০, ৭৫:১৭, ১৮, ৭৬:২৩, ৮৪:২১, ৮৫:২১

৩৬ 'যে বর্ণনার সনদের সকল স্তরেই বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, তাদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা কথা রচনা বা বলা স্বভাবতই অসম্ভব বলে মনে হয়, এরূপ বর্ণনাকে মুতাওয়াতির বলা হয়।' দ্র. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৯৭০), পৃ. ৪৭

উক্ত সংজ্ঞায় 'যা রাসুলুল্লাহ সা.-এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে' বলে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহ থেকে কুরআনকে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং 'যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে' বলে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ নেই, সেগুলো থেকেও কুরআন মাজিদকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। যেমন– ঐ সমস্ত আয়াত যেগুলোর বিধান বলবৎ আছে; কিন্তু তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে। আর 'যা সন্দেহাতীতভাবে তাওয়াতুর পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আসছে' সংজ্ঞায় এ শর্তারোপের মাধ্যমে যা এ প্রক্রিয়ায় বর্ণিত নেই সেগুলো থেকেও কুরআন মাজিদকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে।

এ সংজ্ঞার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, গোটা কুরআনই মুতাওয়াতির পন্থায় প্রমাণিত এবং মুসহাফে উসমানিতে যা আছে তা পুরোটাই মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত। কুরআনের কোন অংশই মুসহাফে উসমানি থেকে বাদ পড়ে যায়নি। এটাই গোটা মুসলিম উম্মাহর আকিদা ও অকাট্য সত্য।

আল-কুরআনের আরো কতিপয় সংজ্ঞা নিচে প্রদত্ত হলো–

"القرآن هو كلام الله الْمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الْمتعبد بتلاوته".

'কুরআন মাজিদ আল্লাহতা'আলার বাণী। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর ইহা অবতীর্ণ। এর তিলাওয়াত করা ইবাদত।'[৩৮]

এ সংজ্ঞায় উল্লিখিত শব্দসমূহের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ–

كلام الله এর মধ্যে كلام শব্দটি সকল প্রকার বাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু পরবর্তী শব্দ الله দ্বারা মানুষ, জিন এবং ফেরেশেতাগণের কথা কালামের আওতা থেকে বহির্ভুত হয়ে গেছে।

الْمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم এর মধ্যে الْمنزل শব্দটি আল্লাহপাকের এমন সব কালামকে কুরআন হওয়া থেকে বহির্ভুত করে দেয়, যে সকল কালাম তিনি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আর আল্লাহতা'আলার এ ধরনের কালাম সীমাহীন। যেমন আল্লাহতা'আলা বলেন,[৩৯]

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِه مَدَدًا.

আল্লাহতা'আলা বলেন,[৪০]

وَلَوْ أَنَّمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّه مِنْۢ بَعْدِه سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللهِ ؕ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

الْمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতীর্ণ) শর্ত দ্বারা তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ কুরআনের সংজ্ঞা থেকে বহির্ভুত হয়ে গেছে। যেমন– তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল।

الْمتعبد بتلاوته (এর তিলাওয়াত করা ইবাদত) শর্তের প্রেক্ষিতে খবরে আহাদ সূত্রে বর্ণিত কিরাআতসমূহ এবং হাদিসে কুদসি কুরআনের আওতাভুক্ত হওয়া থেকে বহির্ভুত হয়ে গেছে।

মোটকথা আল-কুরআন হলো, আল্লাহর কালাম, যার মুকাবিলা করতে মানুষ অক্ষম, জিবরাঈল আমিন আ.-এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর উপর এটি অবতীর্ণ, মুসহাফসমূহে এটা

---

৩৭ শাইখ আহমদ মোল্লাজিওন, *নূরুল আনওয়ার*(বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১৭

৩৮ মান্না খলিল আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফি 'উলুমিল কুরআন*(কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, তা.বি.), পৃ. ১৬

৩৯ 'বলুন, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কালাম শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাহায্যার্থে অনরূপ আরো সমুদ্র আনলেও।' দ্র. আল কুরআন, ১৮ : ১০৯

৪০ 'পৃথিবীর সকল বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র তার সাথে যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' দ্র. আল কুরআন, ৩১ : ২৭

লিপিবদ্ধ মুতাওয়াতির ধারায় এটা আমাদের নিকট পর্যন্ত বর্ণিত। এর তিলাওয়াত করা ইবাদত যার সূচনা সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং পরিসমাপ্তি সূরা নাস-এর মাধ্যমে।

কিতাবুল্লাহর আলোকে কুরআনের সংজ্ঞা : আল্লাহতা'আলা তাঁর কিতাবে কুরআনের সংজ্ঞায় বলেন,[৪১]

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الأَمِيْنُ. عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ.

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল-কুরআনুল কারিমের গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্টসমূহ বর্ণিত হয়েছে, তাহলো–

- কুরআন মাজিদ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নযিলকৃত।
- আল-কুরআন রূহুল আমিন হযরত জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে মহানবী মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতারিত।
- আল-কুরআন রাসুলুল্লাহ সা.-এর উপর এজন্য নাযিল হয়েছে, যাতে তিনি তা দ্বারা উম্মতকে সতর্ক করতে পারেন। এ পর্যায়ে আল্লাহতা'আলা বলেন,[৪২]

  لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.
- আল-কুরআন স্পষ্ট আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে।

হাদিসের আলোকে কুরআনের সংজ্ঞা : রাসুলুল্লাহ সা. কুরআনুল কারিমের সংজ্ঞায় বলেন,[৪৩]

كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله، هو حبل الله الْمتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط الْمستقيم، وهو الذى لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، وهو الذى تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا: انا سمعنا قرآنا عجبا، يهدى إلى الرشد فامنا به. من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم.

নামের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের পরিচয় : রাসুলুল্লাহ্ সা.-এর উপর নাযিলকৃত কুরআনকে আল্লাহতা'আলা স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম ইবন জারির আত-তাবারি রহ. তাঁর তাফসির গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহতা'আলা পবিত্র কুরআনকে

---

৪১ 'আল-কুরআন জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। জিবরাইল আ. তা নিয়ে অবতরণ করেছেন, আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন। এটা নাযিল করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।' দ্র. আল-কুরআন, ২৬ : ১৯২-১৯৫

৪২ 'রাসূলগণ আসার পর যাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে।' দ্র. আল-কুরআন, ৪ : ১৬৫

৪৩ 'আল্লাহর কিতাব তাতে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ রয়েছে। তোমাদের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ রয়েছে। তোমাদের পার্থিব জীবনের হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ আছে। তা হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ব্যবধানকারী। তাতে অসামঞ্জস্য কিছু নেই। অহংকার বশতঃ যে ব্যক্তি এটিকে পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। যে এটা ভিন্ন অন্য কিছুতে হিদায়াত অন্বেষণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে পথভ্রষ্ট করে দিবেন। এটা আল্লাহ প্রদত্ত শক্ত রশি। এটা বিজ্ঞপূর্ণ স্মরণিকা এবং একটি সরল-সহজ পথ। প্রবৃত্তির অনুসারীরা এটাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। অন্য কিছু এর সাথে সংমিশ্রিত হবে না। এর অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণে 'আলিমগণ পরিতৃপ্ত হবে না। পুনঃপুনঃ তিলাওয়াতে এর স্বাদ হ্রাস পাবে না। এর অভিনবত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। জিনগণ যখন এ কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা থেমে থাকেনি। বরং তারা বলে উঠে– আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করছি। যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যে ব্যক্তি এ কুরআন অনুসারে কথা বলবে সে সত্যকথা বলবে। আর যে এর অনুসারে 'আমল করবে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। যে এর অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করবে সে ন্যায়বিচার করবে। আর যে এর প্রতি আহ্বান জানাবে সে সঠিক পথে দিশাপ্রাপ্ত হবে।' দ্র. আবু ঈসা তিরমিজি, *জামি' আত-তিরমিজি*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ-দুয়ালিয়্যাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৪৬৪, হাদিস নং ৪৯০৬

চারটি নামে উল্লেখ করেছেন।[৪৪] সেগুলো হলো- (ক) আল-কুরআন (القرآن)[৪৫] (খ) আল-ফুরকান (الفرقان)[৪৬] (গ) আল-কিতাব (الكتاب)[৪৭] (ঘ) আয-যিকর (الذكر)[৪৮]। কুরআনের আরও একটি নাম পবিত্র কুরআনে উক্ত হয়েছে। তাহলো- (ঙ) তানযিল (تَنْزِيْلُ)।[৪৯]

পবিত্র কুরআনকে 'আল-কুরআন' নামে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, এটা পাঠ করা হয় এবং এটা বহু আয়াত ও সুরার সংকলন। তাছাড়া এতে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিভিন্ন ইতিবৃত্ত ও ঘটনাবলী অনবদ্য রীতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– মহান আল্লাহতা'আলা ইরশাদ করেছেন,[৫০]

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ق صلى وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ.

আল-কুরআনকে 'আল কিতাব' নামকরণের কারণ এই যে, এটা একটা লিখিত গ্রন্থ এবং এটাকে যথারীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন– আল্লাহতা'আলা ইরশাদ করেন,[৫১]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّه عِوَجًا.

আল-কুরআনকে 'আয-যিকর' নামে এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এতে আল্লাহতা'আলা স্বীয় বান্দাকে বিভিন্ন আদেশ-উপদেশ প্রদান করেছেন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব কুরআন হল বান্দার প্রতি আল্লাহর নির্দেশনামা। যেমন– আল্লাহতা'আলা ইরশাদ করেন,[৫২]

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ أَنْزَلْنٰهُ.

আল-কুরআনকে 'তানযিল' বলে নামকরণ করা হয়েছে। তার কারণ হলো– তানযিল বলা হয় অল্প অল্প করে নাযিল হওয়া। হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর উপর ২৩ বছর যাবত ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে ক্রমান্বয়ে নাযিল হয়েছে বলে একে তানযিল বলা হয়। যেমন– আল্লাহতা'আলা ইরশাদ করেন,[৫৩]

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَأَه عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلاً.

আল্লামা আবুল মা'আলি আযিযি ইবন আব্দুল মালিক রহ. কুরআনের ৫৫টি নামের উল্লেখ করেছেন।[৫৪] কেউ কেউ এর ৯০টি থেকেও অধিক নামের উল্লেখ করেছেন। তবে এগুলো সবই কুরআনের গুণবাচক নাম। যেমন–

১. কুরআন (قراٰن) পঠিত গ্রন্থ : إِنَّه لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ

---

৪৪ দ্র. ان الله ذكره سمى تنزيله الذى انزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم أسماء أربعة: القرآن، الفرقان، الكتاب، الذكر ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারির আত তাবারি, *তাফসির তাবারি*(বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৫ হি.), খ.১, পৃ. ৪৩

৪৫ يٰس وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ দ্র. আল কুরআন, ৩৬ : ১-২

৪৬ تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهِ দ্র. আল কুরআন, ২৫ : ১

৪৭ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْه দ্র. আল কুরআন, ২ : ২

৪৮ وَاِنَّه لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ দ্র. আল কুরআন, ৪৩ : ৪৪

৪৯ وَإِنَّه لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দ্র. আল কুরআন, ২৬ : ১৯২

৫০ 'আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি- ওয়াহ্‌য়ির মাধ্যমে তোমার নিকট এ কুরআন বর্ণনা করে; যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।' দ্র. আল কুরআন, ১২ : ৩

৫১ 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে তিনি বক্রতা রাখেননি।' দ্র. আল কুরআন, ১৮ : ১

৫২ 'এটা কল্যাণময় উপদেশ, আমি তা নাযিল করেছি।' দ্র. আল কুরআন, ২১ : ৫০

৫৩ 'আর আমি কুরআন নাযিল করেছি অল্প অল্প করে, যাতে আপনি তা পর্যায়ক্রমে মানুষকে পড়ে শুনাতে পারেন এবং আমিও তা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।' দ্র. আল কুরআন, ১৭ : ১০৬

৫৪ ইমাম জালালুদ্দিন আস সুয়ূতি, *আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*(রিয়াদ : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪১৬ হি.), খ.২, পৃ. ৩৩৬-৩৩৯; আয-যারকাশি, *আল বুরহান ফি উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-১৯৪

২. কিতাব (كتاب) গ্রন্থ : ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

৩. কালাম (كلام) বাণী : يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ

৪. নুর (نور) জ্যোতি : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

৫. হুদা (هدى) দিশারি : وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

৬. রহমাহ্ (رحمة) দয়া : وَإِنَّه لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

৭. ফুরক্বন (فرقان) পার্থক্যকারী : تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِه

৮. শিফা (شفاء) আরোগ্য : وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ

৯. মাও‘ইজাহ্ (موعظة) উপদেশ : قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

১০. যিকর (ذكر) উপদেশ : وَاِنَّه لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ

১১. কারীম (كريم) মর্যাদাপূর্ণ : إِنَّه لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ

১২. আলিয়্যু (علي) মহান : وَإِنَّه فِىْ أُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ

১৩. হিকমাহ্ (حكمة) প্রজ্ঞা : حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ

১৪. হাকীম (حكيم) জ্ঞানগর্ভ : يٰس. وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ

১৫. মুহাইমিন (مهيمن) সংরক্ষক : مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

১৬. মুবারক (مبارك) কল্যাণময় : وَهٰذَا كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ

১৭. হাবলুন (حبل) রশি : وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

১৮. সিরাতুম মুস্তাকীম (صراط مستقيم) সঠিক পথ : وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا

১৯. ক্বইয়িম (قيم) যথার্থ : وَلَمْ يَجْعَلْ لَّه عِوَجًا سكتة قَيِّمًا

২০. ফাছলুন (فصل) মীমাংসাকারী : إِنَّه لَقَوْلٌ فَصْلٌ

২১. নাবাউন আযীম (نبأ عظيم) মহাসংবাদ : عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ

২২. আহসানুল হাদীছ (أحسن الحديث) উত্তম বাণী : اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا

২৩. তানযীল (تنزيل) ধীরে ধীরে নাযিল করা : وَإِنَّه لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

২৪. রূহ্ (روح) আত্মা : وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا ط

২৫. ওয়াহ্য়ি (وحي) প্রত্যাদেশ : قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ صلى

২৬. মাছানী (الْمَثَانِىْ) বার বার পঠিত : وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ

২৭. আরাবী (عربي) আরবি : إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

২৮. ক্বউলুন (قول) বাণী : وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ

২৯. বাছাইর (بصائر) স্পষ্ট প্রমাণ : قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ

৩০. বায়ান (بيان) স্পষ্ট বর্ণনা : هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ

৩১. ইলমুন (علم) জ্ঞান : وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

৩২. হাক্ক (حق) সত্য :	قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
৩৩. 'আজাব (عجب) বিস্ময়কর :	إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا
৩৪. তাযকিরাহ্ (تذكرة) উপদেশ :	إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ
৩৫. 'উরওয়াতুল উছক্বা (عروة الوثقى) সুদৃঢ় রজ্জু :	فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى
৩৬. মুতাশাবিহুন (متشابه) সামঞ্জস্যপূর্ণ :	كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ
৩৭. ছিদকুন (صدق) সত্য :	وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصِّدْقِ
৩৮. 'আদলুন (عدل) ন্যায় বিচার :	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا
৩৯. ঈমান (إيمان) বিশ্বাস :	سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ
৪০. আমর (أمر) আদেশ :	ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَهٗ إِلَيْكُمْ
৪১. বুশরা (بشرى) সুসংবাদ :	وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ
৪২. মাজিদ (مجيد) সম্মানিত :	قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ
৪৩. মুবীন (مبين) সুস্পষ্ট :	الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ
৪৪. বাশীরুন নাযীরুন (بشير نذير) সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী :	بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ
৪৫. আযীয (عزيز) মহিমাময় :	وَإِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ
৪৬. ক্বফ (ق) ক্বফ, বিচ্ছিন্ন বর্ণ :	قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ
৪৭. বালাগুন (بلاغ) বার্তা :	هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ
৪৮. ক্বছাছ (قصص) কাহিনীসমূহ :	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
৪৯. 'আজিম (عظيم) মহান :	وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ
৫০. বুরহান (برهان) প্রমাণ :	يٰأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
৫১. বাইয়্যিনাহ্ (بينة) স্পষ্ট প্রমাণ :	بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ
৫২. মুফাছছাল (مفصل) সুস্পষ্ট :	هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا
৫৩. যিকরা (ذكرى) সদুপদেশ :	وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ
৫৪. তাবছিরাহ্ (تبصرة) জ্ঞান :	تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ.
৫৫. মুছদ্দিক্ব (مصدق) সত্যায়নকারী :	وَهٰذَا كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ.
৫৬. এক সুরাতে পরপর দু'টি আয়াতে চারটি নাম :	فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ. مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ.

এগুলো হলো আল-কুরআনের সেসব গুণবাচক নাম, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। হাদিসেও আল-কুরআনের কয়েকটি গুণবাচক নামের বর্ণনা রয়েছে।[৫৫] হাদিসে উল্লিখিত নামগুলো হলো–[৫৬]

১. আন-নাজাহ্ (النجاة) মুক্তি;

---

৫৫ আল-ফিরূযাবাদি, *বাসাইরু যাবিত তাময়িয*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৮৮-৯৫

৫৬ আবু ঈসা তিরমিজি, *জামি' আত-তিরমিযি*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ-দুয়ালিয়্যাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৪৬৪, হাদিস নং ৪৯০৬

২. হাবলুল্লাহিল মাতিন (حبل الله الْمتين) আল্লাহ্‌র শক্ত রশি;

৩. আল মুরশিদ (الْمرشد) সঠিক পথপ্রদর্শক;

৪. আল মু'আদ্দিল (الْمعدل) ভারসাম্য রক্ষাকারী;

৫. আদ দাফি' (الدافع) প্রতিরোধকারী;

৬. ছহিবুল মু'মিন (صاحب الْمؤمن) মু'মিনের সাথী;

৭. কালামুর রহমান (كلام الرحمن) দয়াময়ের বাণী।

কুরআনকে কেন 'কুরআন' বলা হয় এবং এর এরূপ নামকরণের কয়েকটি কারণ নিচে তুলে ধরা হলো–

(ক) কুরআন বহু আয়াত ও সুরার সমষ্টি;
(খ) পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও সহিফাসমূহে যে সব শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছিল, এ গ্রন্থে তার সার-সংক্ষেপ সন্নিবেশিত হয়েছে;
(গ) এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী উম্মতগণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা ও ঘটনাবলী, আদেশ-নিষেধ, অঙ্গীকার, সতর্কিকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যথোচিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে;
(ঘ) কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটা শ্রেষ্ঠ সংকলন।[৫৭]
(ঙ) আল-কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। তাই কুরআনকে 'আল-কুরআন' বলে নামকরণ করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআনের নামকরণের ব্যাপারে উলামায়ে ইসলাম সবসময়ই 'সংকলন' অর্থটাকে সামনে রেখেছেন। কিন্তু কিছু লোক এটাকে সঠিক বলে স্বীকার করেন না। তারা বলেন, القرآن শব্দটি সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়েছে সুরা আল-মুয্‌যাম্মিলে এবং নাযিলের ক্রমানুসারে এটা তৃতীয় সুরা।[৫৮] সে সময় এ সকল সুরার কোন সংকলন ছিল না অথবা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের কোন সারসংক্ষেপও এতে ছিল না। অতএব কুরআন নামকরণের সাথে 'সংকলন' বা 'সংগ্রহ' অর্থের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

তাদের আপত্তির জবাবে এ কথা বলা যায় যে, প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিষয়বস্তু প্রকাশের এক একটি বিশেষ পরিভাষা বিদ্যমান রয়েছে, যা বিশেষ বর্ণনারীতি বা বাকরীতির বৈশিষ্ট্য বহন করে। তদ্রূপ কুরআন মাজিদেরও নিজস্ব একটা বাকরীতি রয়েছে। আর তা অন্যান্য সকল কিছু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাতে এমন সব বিষয়েরও উল্লেখ রয়েছে, যা এখন পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। তখন তা দ্বারা বর্তমান ধারা অনুসারে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে বলে ধরে নেয়া হয়। অতএব সুরা মুয্‌যাম্মিলের যেখানে 'কুরআন' নামের উল্লেখ রয়েছে, তা দ্বারা সে পবিত্র গ্রন্থকে বুঝানো হয়েছে, যা রাসুলুল্লাহ্ সা.-এর উপর নাযিল হতে শুরু করেছে, যা ভবিষ্যতে একটা সংকলনের রূপ লাভ করবে, পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাতে বহু আয়াত ও সুরার সমাবেশ ঘটবে এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার একটা সারসংক্ষেপে পরিণত হবে।

---

৫৭ আল-ফিরূযাবাদি, *বাসাইরু যাবিত তাময়িয*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২৬৩; আয-যারকাশি, *আল বুরহান ফি উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫-১৯৬

৫৮ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً দ্র. আল কুরআন, ৭৩ : ৪

ইবন শিহাব যুহরি রহ. তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন,

لَما جمعوا القرآن فكتبوه فى الورق قال أبو بكر رضي الله عنه التمسوا له اسما. فقال بعضهم السفر وقال بعضهم الْمصحف فإن الحبشة يسمونه الْمصحف وكان أبو بكر أول من جمع كتاب الله وسماه الْمصحف.

‘সাহাবিগণ যখন কুরআন একত্রিত করেন এবং কাগজে লিপিবদ্ধ করেন, তখন হযরত আবু বকর রা. তাদেরকে কুরআনের একটা নাম অন্বেষণ করতে বলেন। এতে কেউ কেউ এর নাম আস-সফর (السفر) রাখার এবং কেউ কেউ আল-মুসহাফ (الْمصحف) রাখার প্রস্তাব করেন। আবিসিনিয়ার অধিবাসীগণ এ ধরনের গ্রন্থকে আল-মুসহাফ (الْمصحف) বলে আখ্যায়িত করত। হযরত আবু বকর রা.-ই আল্লাহর কিতাবকে প্রথম একত্রিত করেন এবং তিনিই এর নাম রাখেন আল-মুসহাফ (الْمصحف)।’[৫৯]

আল-কুরআন-এর অবয়বগত সংজ্ঞা : মুসহাফে উছমানি হতে গ্রন্থবদ্ধ যে কুরআন এখন বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান, এতে ত্রিশটি জুয বা পারা, ৭টি মনযিল বা হিজব, ১৪টি সাজদা, ৫৫৪টি রুকু‘ এবং ৬২৩৬টি আয়াত রয়েছে। তবে আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। এ মতভেদের কারণ হলো, রাসুলুল্লাহ্ সা. কোন কোন সময় কিছু কিছু আয়াতের শেষে থামতেন, আবার কখনও মিলিয়ে পড়তেন। তাই কেউ কেউ সে সকল আয়াতকে পৃথক গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ মিলিয়ে হিসেব করেছেন। ফলে সংখ্যার এ তারতম্য ঘটেছে। তবে ৬২০০টি আয়াতের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। তাবি‘ইন, তাব‘ই তাবি‘ইন এবং অন্যান্য আলিমগণ পবিত্র কুরআনের ৭৭,৪৩৭টি শব্দ এবং ৩,২৩,৬৭১টি হরফ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কোন কোন তাফসিরকার পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে এভাবে বিভক্ত করেছেন,

• ওয়াদা সম্পর্কিত আয়াত সংখ্যা	: ১০০০
• সতর্কিকরণ ও শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত সংখ্যা	: ১০০০
• নিষেধসূচক আয়াত	: ১০০০
• আদেশসূচক আয়াত সংখ্যা	: ১০০০
• উপমাসূচক আয়াত সংখ্যা	: ১০০০
• কাহিনীমূলক আয়াত সংখ্যা	: ১০০০
• হালাল সংক্রান্ত আয়াত সংখ্যা	: ২৫০
• হারাম সংক্রান্ত আয়াত সংখ্যা	: ২৫০
• তাসবিহ্ সম্পর্কিত আয়াত সংখ্যা	: ১০০
• মানসুখ (রহিত) আয়াত সংখ্যা	: ৬৬
মোট	**: ৬৬৬৬**

আল-কুরআন ও শারি‘আহ-এর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। এটা সর্বযুগের সকল মুসলিম আলিমগণের ঐকমত্য ও ইজমা যে, ইসলামি শারি‘আহ কুরআনেরই বিধান। কেননা কুরআনই শারি‘আহকে সত্যায়ন করেছে। ইসলামি শারি‘আহর বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যাবে যে, আকিদা ও বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলো যেমন– তাওহিদ, রিসালাত ও

---

৫৯ আল্লামা আস-সুয়ুতি, *আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫১

আখিরাত ইত্যাদি বিষয় কুরআনের বিশাল অংশ জুড়ে আলোচিত হয়েছে। শিরক, কুফরের পরিচিতি সম্পর্কে কুরআনে বিশদ আলোচনা রয়েছে। ইমানের আরকানের মধ্যে আল্লাহ, মালাইকা, আসমানি কিতাব, নবী-রাসুলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমানের অপরিহার্যতার কথা কুরআনে বলা হয়েছে। ইসলামের আরকানের মধ্যে শাহাদাত, সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জের বর্ণনা কুরআনে রয়েছে। আকিদার পাশাপাশি শারি'আহর বিভিন্ন আমল ও মু'আমালাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও কুরআনে রয়েছে। ব্যক্তির নিজের করণীয়, বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন ও সংরক্ষণ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন, অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়, রাজনৈতিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয়সহ শারি'আহর সকল মৌলিক কিছুই স্পষ্টভাবে কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহতা'আলা বলেন।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

'আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।'[৬০]

আল্লাহতা'আলা আরও বলেন,

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ.

'কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি।'[৬১]

আল-কুরআনে শারি'আহ অনুসরণ করার সরাসরি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহতা'আলা ঘোষণা করেন,

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

'এর পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি এর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না।'[৬২]

বিগত ১৪০০ বছর পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সম্মানিত যে সকল ইমাম, আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তি রয়েছেন, তাদের কোন একজনও এ কথা দাবি করেননি যে, শারি'আহ কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু। সাহাবাগণের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত রচিত তাফসির, হাদিস, ফিকাহ, উসুলে ফিকাহসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি রেফারেন্স গ্রন্থসমূহে শারি'আহকে কুরআনেরই বিধান বলা হয়েছে। কেননা শারি'আহ সাব্যস্ত হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে এবং কুরআনই শারি'আহর প্রাথমিক উৎস ও দলিল। কুরআন ছাড়া শারি'আহর অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না।

আস-সুন্নাহ : সুন্নাহ ইসলামি শারি'আহ-এর দ্বিতীয় মৌলিক উৎস। কুরআনের পরেই এর অবস্থান। সুন্নাহর শাখা-প্রশাখা অনেক বিস্তৃত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনেক বেশি, আইনি ব্যবস্থাপনা অনেক সূক্ষ্ম। কেননা সুন্নাহ মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা ও কুরআনে বর্ণিত সাধারণ নীতিমালার বিশ্লেষণ। এ কারণে সুন্নাহ ইসলামি শারি'আহর অকাট্য উৎস।[৬৩]

---

৬০. আল-কুরআন, ১৬ : ৮৯
৬১. আল-কুরআন, ৬ : ৩৮
৬২. আল-কুরআন, ৪৫ : ১৮
৬৩. আল-কুরআন, ৪৫ : ১৮

সুন্নাহর শাব্দিক অর্থ : আরবি সুন্নাহ (سُنَّةٌ) শব্দটার বাংলা অর্থ– পথ, পদ্ধতি, পন্থা, নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি ইত্যাদি।[৬৪] শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটা ভাল-মন্দ উভয় পথ-পদ্ধতি বুঝায়। যেমন আল্লাহতা'আলা বলেন,

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلاً.

'আমার রাসুলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না।'[৬৫]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء.

'যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো ভালো রীতির প্রচলন করবে এবং পরবর্তীকালে সে অনুযায়ী আমল করা হলে আমলকারীর প্রতিফলের সমপরিমাণ প্রতিফল তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। তবে এতে তাদের প্রতিফলের কোনরূপ ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে এবং পরবর্তীতে সে অনুযায়ী আমল করা হলে ঐ আমলকারীদের মন্দ প্রতিফলের সমপরিমাণ প্রতিফল তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। তবে এতে তাদের মন্দ প্রতিফলের কিছুমাত্র হ্রাস হবে না।'[৬৬]

সুন্নাহর পারিভাষিক অর্থ : ফকিহগণ সুন্নাহ বলতে আইনের ঐ ধরনকে বুঝিয়ে থাকেন, যা ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু তা পালন করার জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং যা বিদ'আতের বিপরীত।[৬৭]

উসুলবিদগণের পরিভাষায় সুন্নাহ বলা হয়–

السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره.

'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ, সম্মতি ও অনুমোদনকে বলা হয় আস-সুন্নাহ।'[৬৮] আস-সুন্নাহ মূলত কুরআনেরই ব্যাখ্যা। আল্লাহতা'আলা বলেন,

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

'প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্টভাবে প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।'[৬৯]

আল্লাহতা'আলা আরও বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوٰى. إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى.

'এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এটা তো অহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।'[৭০]

---

৬৪. মাজদুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আল-ফিরুযাবাদি, *আল-কামুস আল-মুহিত*(কায়রো : দারুল হাদিস, ২০০৮), ৮১৫
৬৫. আল-কুরআন, ১৭ : ৭৭
৬৬. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, খ. ৬, মার্চ ২০১৫), পৃ. ১৮৭, হাদিস নং ৬৫৫৬
৬৭. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*(দামেশক : দারুল ফিকর, খ.১, ১৯৮৬), পৃ. ৪৩২
৬৮. মুহাম্মাদ বিন আলি আশ-শাওকানি, *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকিকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসুল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
৬৯. আল-কুরআন, ১৬ : ৪৪

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে, রাসুলুল্লাহ সা.-এর কথা, কাজ, মৌন সম্মতি ও গুণাবলী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে সব কিছুই সুন্নাহ।[৭১] এ সংজ্ঞার আলোকে রাসুলুল্লাহ সা.-এর স্বভাবগত চারিত্রিক গুণাবলীও সুন্নাহর আওতাভুক্ত।

উসুলবিদগণ অন্যভাবেও সুন্নাহর বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের মতে, সুন্নাহ বলতে শারই' বিধানের ঐ ধরনকে বুঝায় যা পালন করলে সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়, কিন্তু পরিত্যাগ করলে শাস্তি পেতে হয় না। যেমন– বিভিন্ন ওয়াক্তের ফরয সালাতের পূর্বের ও পরের সুন্নাত সালাত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নাহ শব্দটা মানদুব শব্দের সমার্থবোধক। যা ওয়াজিব, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ থেকে ভিন্ন একটা পরিভাষা।[৭২]

রসুলুল্লাহ সা.-এর ইশারা, ইঙ্গিত, চিঠিপত্র, চুক্তিনামা, সন্ধি অথবা তিনি যেসব কাজ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরিত্যাগ করেছেন, সবকিছুই উসুলবিদগণের দৃষ্টিতে সুন্নাহর আওতাভুক্ত।[৭৩] যেমন, আবু বকর রা.-কে ইমামতি অব্যাহত রাখার জন্য রসুল সা.-এর ইশারা, বিভিন্ন সম্রাটের কাছে লেখা তাঁর পত্রাবলী।

সুন্নাহ ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে দু'টো মত বিদ্যমান। জমহুরের মতে, হাদিস বলতে শুধু রাসুল সা.-এর বাণীকে বুঝায়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে হাদিসের চেয়ে সুন্নাহ ব্যাপক এবং হাদিস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। অন্য মত অনুযায়ী হাদিস দ্বারা রসুল সা., সাহাবা ও তাবিয়িগণের বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি বুঝায়। এ দৃষ্টিতে হাদিস ব্যাপক অর্থবোধক ও সুন্নাহ হাদিসের একটা অংশবিশেষ।[৭৪]

সুন্নাহ শব্দটা বিদ'আতের বিপরীত। সুন্নাহ শারি'আহ অনুমোদিত আর বিদ'আত শারি'আহ নিষিদ্ধ পদ্ধতি।[৭৫]

সুন্নাহর সংজ্ঞায় কোন কোন উসুলবিদ বলেন, কুরআন ব্যতীত রাসুল সা. থেকে প্রকাশিত যাবতীয় বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিই সুন্নাহ।[৭৬] তারা 'কুরআন ব্যতীত' শর্তটা যোগ করেছেন এ যুক্তিতে যে, কুরআন রাসুল সা. থেকে প্রকাশিত নয়; বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি জিবরাইল আ. থেকে তা গ্রহণ করে উম্মতের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[৭৭]

অতএব রাসুল সা.-এর নবুওয়াতের পূর্বেকার কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি সুন্নাহ হিসেবে গণ্য হবে না।[৭৮]

আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ উভয়ই যে অহি, সে ব্যাপারে আলিমগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হাদিস শাস্ত্রের উসুল অনুযায়ী সুন্নাহ-এর যে সকল হাদিস সার্বিক বিবেচনায় বিশুদ্ধ শুধু সেগুলোই শারি'আহ-এর দলিল ও উৎস হিসেবে গৃহীত।

---

৭০. আল-কুরআন, ৫৩ : ৩-৪
৭১. ড. মুস্তফা আস-সুবায়ি', *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৭২. আলি ইবন মুহাম্মদ আল-আমিদি, *আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২২৭
৭৩. মুহাম্মাদ বিন আলি আশ-শাওকানি, *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকিকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসুল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
৭৪. আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবন মুসা আল-লাখমি আশ-শাতিবি, *আল-মুআফাকাত ফি উসুলিস শারি'আহ*(কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়াতিল কুবরা, তা.বি., খ.৪), পৃ. ৪
৭৫. ইবন বাদরান হাম্বালি, *আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমদ*(কায়রো : আল-মাতবাআতুল মুনিরিয়্যাহ, ১৯২৭), পৃ. ৮৯
৭৬. মুহাম্মাদ বিন আলি আশ-শাওকানি, *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকিকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসুল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
৭৭. ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয-যুহাইলি, *আল-ওয়াজিয ফি উসুলিল ফিকহিল ইসলামি*(দামেশক : দারুল খাইর, ২০০৬), পৃ. ১৮৯
৭৮. প্রাগুক্ত।

আল-ইজমা : রাসুলুল্লাহ সা.-এর জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন ইসলামি শারি‘আহর কেন্দ্রবিন্দু। মুসলিম উম্মাহ নতুন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তাঁর উপর অহি অবতীর্ণের মাধ্যমে আল্লাহতা‘আলা উক্ত পরিস্থিতির সমাধান করে দিতেন। এ কারণে তাঁর যুগে ইজমার কোন আবশ্যকতা দেখা দেয়নি। তাঁর ইন্তিকালের পর নতুন নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের অপরিহার্যতা সামনে রেখে সামষ্টিক ইজতিহাদের মাধ্যমে ইজমার সূচনা হয়।

ইজমার শাব্দিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইজমা শব্দটা দুটো অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমত: কোন কিছুর জন্য দৃঢ় সংকল্প করা, দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করা।[৭৯] এ অর্থে আল্লাহতা‘আলা ঘোষণা করেন,

فَأَجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ.

‘তোমরা যাদেরকে শরিক করেছ তৎসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করে লও।’[৮০]

একই অর্থে রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

لا صيام لِمن لم يجمع قبل الفجر.

‘যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়ত নিশ্চিত করল না, তার রোযা হল না।’[৮১]

দ্বিতীয়ত: একমত হওয়া বা ঐকমত্য পোষণ করা। কোন বিষয়ে একমত হওয়ার জন্যও দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে হয়। অতএব একক ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয় সামষ্টিক রূপ নিয়ে ঐকমত্য সম্পন্ন হয়।

ইজমার পারিভাষিক অর্থ : উসুলবিদগণ ইজমার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ উসুলবিদের মতে–

إنه اتفاق الْمجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.

রাসুলুল্লাহ সা.-এর ইন্তিকাল পরবর্তী বিভিন্ন যুগে শারি‘আতের কোন বিধানের ব্যাপারে তাঁর উম্মতের মুজতাহিদগণের ঐকমত্য হল ইজমা।[৮২]

উপরোক্ত সংজ্ঞায় ইজমার যেসব বৈশিষ্ট্য ও দিক ফুটে উঠেছে তাহল,

ঐকমত্য : একটা মতের উপর সকলেই সম্মত হওয়া। এ ঐকমত্যের ধরন বিভিন্ন হতে পারে। কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে, নীরব থেকে ও সম্মতি জানিয়ে।

মুজতাহিদ : মুজতাহিদ বলা হয় ঐ আইন গবেষককে, যার মধ্যে ইজতিহাদের যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকার প্রেক্ষিতে তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে শার‘ই বিধান উদ্ভাবনে ক্ষমতাবান। অতএব এ সংজ্ঞা থেকে যার ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই এবং যিনি অন্য মুজতাহিদের অনুকরণ করেন, তিনি বাদ পড়ে যান।

যুগ : যুগ বলতে যিনি শারই‘ বিধান উদ্ভাবন করবেন ঐ মুজতাহিদের সমসাময়িক যুগ বুঝতে হবে। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সব মুজতাহিদের উক্ত বিষয়ে একমত হওয়া শর্ত নয়। এ

---

৭৯. আলি ইবন মুহাম্মদ আল-আমিদি, *আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৬১

৮০. আল-কুরআন, ১০ : ৭১

৮১. ইমাম নাসাই, *সুনানুন নাসাই*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ-দুওয়ালিয়্যাহ, ২০০১), পৃ. ২৫৪, হাদিস নং ২৩৩৬

৮২. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১৪

জাতীয় শর্ত আরোপ করা হলে কিয়ামতের পূর্বে কোন উজমা সংঘটিত হওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং এ দ্বারা উদ্দেশ্য, যখন নতুন কোন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন করার প্রয়োজন হয় এবং যেসব মুজতাহিদ উক্ত বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের সাথে জড়িত থাকেন তাদের যুগ।

উম্মতে মুহাম্মাদি : কুরআনে এ উম্মতকে 'মধ্যপন্থী উম্মত' ও 'উত্তম উম্মত' নামকরণ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা.-এর উম্মত বলতে যারা তাঁর দা'ওয়াত গ্রহণ করেছেন তাদের বুঝায়। অতএব পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের ইজমা ইসলামি শারি'আতের উৎস নয়। একইভাবে ইসলামি উম্মাহ ব্যতীত অন্য জাতির ইজমাও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা শারি'আতের দৃষ্টিতে তারা কাফির; আর দীনি মাসআলায় কাফিরের মন্তব্য সর্বদা পরিত্যাজ্য।

রাসুলুল্লাহ সা. এর ইন্তিকাল : রাসুলুল্লাহ সা. জীবিত থাকা অবস্থায় ইজমার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। সে সময় শারি'আতের উৎস ছিল দুটো– কুরআন ও সুন্নাহ। তখন কোন ব্যাপারে ঐকমত্য সম্পন্ন হলেও তা সুন্নাহ হিসেবে গণ্য। কেননা রাসুলুল্লাহ সা.-এর বাণী, কাজ ও সমর্থন সবকিছুই সুন্নাহ।

শারই' বিধান : শারই' বিধান, ভাষাগত বিষয়, বুদ্ধিভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐকমত্য সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু সব ঐকমত্যই ইজমা নামে অভিহিত হবে না; বরং শারি'আতের বিধান সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তা ইজমা বলে পরিগণিত হবে। ইমাম আর-রাযি, ইমাম আল-আমিদি, আল-ইনসাভি, কামালুদ্দিন ইবনুল হুমামসহ অনেকে মনে করেন, উপরোক্ত সব বিষয়ে এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ মুজতাহিদের ঐকমত্য সম্পন্ন হলে তার অনুসরণ করা আবশ্যক।

ইজমা হচ্ছে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদগণ কোন এক যুগে শারি'আহ-এর কোন এক বিধানের উপর একমত হওয়া।[৮৩] ইজমার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের বিপরীত কোনো কিছুর উপর একমত না হওয়া। এজন্যই রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة

'আমার উম্মাতকে আল্লাহতা'আলা ভ্রষ্টতার উপর কখনো একমত করবেন না।' ইজমার বিধানের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّه مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِه جَهَنَّمَ ؕ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا.

'কারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাস!'[৮৪]

অতএব উপরিউক্ত দিকসমূহ বিবেচনান্তে জানা যায়, রাসুলুল্লাহ সা.-এর ইন্তিকালের পর মুসলিমগণ নতুন বিষয়ের শারই' বিধান জানতে চাইলে সমসাময়িক মুজতাহিদগণ যদি উক্ত নতুন বিষয়ের কোন একটা বিধান উদ্ভাবন করে তার উপর একমত হন, তাহলে তাদের এ ঐকমত্যকে

৮৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-গাযালি, *আল-মুসতাসফা মিন ইলমিল উসুল*(মদিনা মুনাওয়ারা : মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯), খ.১, পৃ. ১৭৩

৮৪. আল-কুরআন, ৪ : ১১৫

ইজমা বলা হবে। ইজমা সংঘটিত হওয়ার পর তা শারি'আতের প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য হয়। খুলাফায়ে রাশিদিনের সকলেই তাদের সামনে নতুন কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে এ পদ্ধতিতে কাজ করতেন। এ কারণেই খলিফা উমর রা. সাহাবি ও মুজতাহিদগণকে ইসলামি রাষ্ট্রের তৎকালীন রাজধানী মদিনা কেন্দ্রিক বসবাসে উদ্বুদ্ধ করতেন।

আল-কিয়াস : কিয়াস ইসলামি শারি'আহর চতুর্থ উৎস। কিয়াসের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। নতুন বিষয়ের ইসলামি বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কিয়াসের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় বর্ণিত বিধান সীমিত। অপর দিকে মানুষের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ চলমান। দৈনন্দিন জীবনে মুখোমুখী হওয়া এসব ঘটনার শারই' বিধান জানতে তাদের কিয়াসের প্রয়োজন রয়েছে। কিয়াস হচ্ছে কোন বিষয়ের জন্য সে বিধান নির্ধারণ করা, যে বিধান স্পষ্টভাবে অন্য একটা বিষয়ের জন্য কুরআন বা হাদিসে বর্ণনা করা আছে, উভয় বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকারী ইল্লাত বা কারণ থাকার কারণে।[৮৫] কিয়াস যে শারি'আহ-এর উৎস ও দলিল সে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে বহু প্রমাণ রয়েছে।[৮৬]

কিয়াসের শাব্দিক অর্থ : আরবি কিয়াস (قياس) শব্দটা ক্রিয়ামূল। যা দু'টো বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়–

প্রথমত : পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ। একটা দিয়ে অন্যটার পরিমাপ করা। যেমন বলা হয়–

قست الأرض بالْمتر.

'আমি মিটারের মাধ্যমে ভূমির পরিমাপ করেছি।'[৮৭]

দ্বিতীয়ত : তুলনা করা, একটার সাথে অন্যটার সাদৃশ্য নির্ধারণ করা। যেমন বলা হয়–

قايست بين العمودين.

'আমি স্তম্ভ দুটোর পরিমাপ নির্ধারণের জন্য পরস্পরের মধ্যে তুলনা করেছি।[৮৮]

কিয়াসের পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় কিয়াসের সংজ্ঞা সম্পর্কে উসুলবিদগণ বলেন–

القياس هو إلحاق مالم يرد به نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.

'যে বিষয়ের বিধানে কোন নস বর্ণিত হয়নি, উক্ত বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের জন্য তাকে যে বিষয়ের বিধানে নস বর্ণিত হয়েছে তার সাথে এ ভিত্তিতে মিলানো যে, উক্ত বিধানের ইল্লাতের তথা কার্যকারণের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে।'[৮৯]

আল্লামা ইবনুল হাজিব সংক্ষেপে বলেছেন, 'কিয়াস হলো বিধানের ইল্লাতের দিক থেকে শাখা-প্রশাখা মূলের অনুরূপ হওয়া।[৯০]

---

৮৫. ইমামুল হারামাইন, *আল-বুরহান ফি উসুলিল ফিকহ*(দোহা : কাতার বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯৯ হি.), খ.২), পৃ. ৩৮৭

৮৬. ড. মুহাম্মদ আল-মুখতার আশ-শানকিতি, *আল কিয়াস ফিল ইবাদাত*(রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২০ হি.), ১৮৫-২২৫

৮৭. ড. আবদুল করিম যাইদান, *আল-ওয়াজিয ফি উসুলিল ফিকাহ*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৭ম প্রকাশ, ২০০১), পৃ. ১৯৪

৮৮. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫৭২

৮৯. ড. আবদুল করিম যাইদান, *আল-ওয়াজিয ফি উসুলিল ফিকাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৯০. শামসুদ্দিন মাহমুদ ইবন আবদুর রহমান আল-ইস্পাহানি, *বায়ানুল মুখতাসার শারহে মুখসারি ইবনুল হাজিব*(মক্কা মুকাররমা : উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, খ.৩), পৃ. ৫

ইবনুল হাজিবের উক্ত সংজ্ঞার কয়েকটা দিক রয়েছে–

সামঞ্জস্য : মূল ও শাখা-প্রশাখা একই ধরনের হওয়া। এ দ্বারা শাখা মূলের অনুরূপ হওয়া অথবা এক শাখা অন্য শাখার মত হওয়া, উভয়ই উদ্দেশ্য হতে পারে।

শাখা-প্রশাখা : শাখা তথা গৌণ বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য যার বিধানের ব্যাপারে কোন নস বর্ণিত অথবা ইজমা সংঘটিত হয়নি।

মূল : যে বিষয়ের বিধানে কুরআন-সুন্নাহর নস বর্ণিত অথবা মুজতাহিদগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইল্লাত : মূল ও শাখা উভয়ের মধ্যকার অংশীদারিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য। যার ভিত্তিতে অংশীদারিত্বমূলক বিধান নির্গত হয়।

বিধান : বিধান বলতে মূল বিষয়ের শারই‘ বিধান, যা বান্দার কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট।

অতএব বলা যায়, শাখা যদি ইল্লাত তথা আইনের কার্যকারণের দিক থেকে মূলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তবে মূলের বিধানকে শাখার জন্যও সাব্যস্ত করাকে কিয়াস বলা হয়।

ইসলামি শারি‘আহর সম্পূরক ও গৌণ উৎসগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ–

ইসতিহসান (উত্তম বিধান নির্ধারণ) **:** ইসলামি আইনের যেসব উৎসের ব্যাপারে আলিমগণের মতপার্থক্য রয়েছে তন্মধ্যে ইসতিহসান অন্যতম। কোন বিষয়ের বিধানের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য বিষয়ের বিধান গ্রহণ না করে বিশেষ বিবেচনায় ভিন্ন বিধান গ্রহণই ইসতিহসানের মূল প্রতিপাদ্য। হানাফি মাযহাবে এ উৎসের অধিক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ইসতিহসানের কয়েকটি দৃষ্টিকোণ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও কম-বেশি সকলেই এ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন।

আরবি ইসতিহসান শব্দটা হুসনুন শব্দ থেকে উৎপন্ন। হুসনুন শব্দের অর্থ উত্তম, ভাল, সুন্দর, যা খারাপের বিপরীত। সে হিসেবে ইসতিহসান অর্থ ভাল মনে করা, উত্তম বিবেচনা করা, পছন্দ করা, অনুমোদন করা।[৯১] কোনো কিছু উত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়াকেও ইসতিহসান বলা হয়।[৯২] আবার বিশেষ কোন অর্থ বা আকৃতি, যার প্রতি কেউ আকৃষ্ট হয় বা পছন্দ করে, তাকেও ইসতিহসান বলে, যদিও তা অন্যের নিকট অপছন্দনীয় হয়।[৯৩] আল্লামা সারাখসি বলেন, আদিষ্ট বিষয় অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বনই ইসতিহসান।[৯৪] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী,

اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَه ط أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَأُولٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ.

‘যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।’[৯৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا ط.

‘এবং তোমার সম্প্রদায়কে তাদের যা উত্তম তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও।’[৯৬]

---

৯১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু‘জামুল ওয়াফী : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

৯২. আলাউদ্দিন আবুবকর আলা-কাসানি, *বাদায়িউস সানায়ে‘ ফি তারতিবিশ শারা‘ই*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৬), খ. ৫, পৃ. ১১৮

৯৩. আলি ইবন মুহাম্মদ আল-আমিদি, *আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১৯১

৯৪. আবু বকর মুহাম্মদ আস-সারাখসি, *উসুলুস সারাখসি*(হায়দারাবাদ : লাজনাতুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), খ.২, পৃ. ১৯০

৯৫. আল-কুরআন, ৩৯ : ১৮

ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদগণ ইসতিহসানের বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। উসুলুল ফিকহের গ্রন্থে উল্লিখিত ইসতিহসানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

دليل ينقدح في نفس المجتهد وتعسر عبارته عنه.

'ইসতিহসান শারি'আতের এমন এক দলিল, যা মুজতাহিদের অন্তরে প্রকাশ পায়, কিন্তু তা ভাষায় বিশ্লেষণ জটিল হয়।'[৯৭] কেউ কেউ এ সংজ্ঞাটি মালিকি মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম কাযি ইবন রুশদের প্রতি সম্পৃক্ত করেন।[৯৮] এ সংজ্ঞা উসুলবিদগণের প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই এটা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইমাম আল-গাযালি 'যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না' এটাকে হতবুদ্ধিতা বলেছেন। কেননা যা যৌক্তিকতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায় না, তা ভ্রম ছাড়া কিছুই না। আর এ জাতীয় ভ্রম শারি'আহ আইনের উৎস হতে পারে না।[৯৯] একইভাবে আল-আমিদিও যৌক্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, মুজতাহিদের অন্তরের ধারণাপ্রসূত বিষয় ইসলামি আইনে প্রমাণ হতে পারে না।[১০০] বিশিষ্ট উসুলবিদ আদুদুদ্দিন আল-ইযি উক্ত সংজ্ঞায় উল্লিখিত 'প্রকাশ পায়' শব্দের দু'টি সম্ভাবনার দিক তুলে ধরেছেন। প্রথমত 'প্রকাশ পাওয়া' বিষয়টি শারি'আহসম্মত হওয়া সাব্যস্ত হলে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তার উপর আমল করা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত প্রকাশিত বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হলে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা পরিত্যাজ্য। অতএব বলা যায়, এ সংজ্ঞা ইসতিহসানের যথাযথ সংজ্ঞা নয়।[১০১]

কাযি আবুল হাসান আল-মাওয়ারদি ইসতিহসানের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন,

العدول عن قياس إلى قياس أقوى.

'দুটি কিয়াসের মধ্যে তুলনামূলক অধিকতর শক্তিশালী কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।'[১০২] এ সংজ্ঞায় বর্ণিত অর্থে ইসতিহসানকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কেননা উসুলুল ফিকহের নীতিমালা অনুযায়ী দুটি কিয়াসের মধ্য থেকে শক্তিশালী কিয়াসটিই গ্রহণযোগ্য।[১০৩] তবে এ সংজ্ঞাটিও পরিপূর্ণ নয়। কেননা নাসের ভিত্তিতে ইসতিহসান, ইজমার মাধ্যমে ইসতিহসান, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসতিহসানসহ ইসতিহসানের অন্যান্য প্রকার এ সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে যায়।

ইমাম আশ-শাতিবি বলেন,

الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي.

---

৯৬. আল-কুরআন, ৭ : ১৪৫

৯৭. আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবন মুসা আশ-শাতিবি, *আল-ই'তিসাম*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৩৬

৯৮. মুহাম্মদ ইবন আহমদ আবু যাহরাহ, *ইবন হাযম*(কায়রো : আল-মাবতাআতু আহমদ আলি মুখাইমির, ২য় প্রকাশ, ১৯৪৫), পৃ. ৪২৬

৯৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-গাযালি, *আল-মুসতাসফা মিন ইলমিল উসুল*(মদিনা মুনাওয়ারা : মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯), খ.১, পৃ. ১৭৩

১০০. আলি ইবন মুহাম্মদ আল-আমিদি, *আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১৯২

১০১. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *ইসলামী আইনের উৎস*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, আগস্ট ২০১৩), পৃ. ১৩২

১০২. কাযি আবুল হাসান আল-মাওয়ারদি, *আদাবুল কাযি*(বাগদাদ : মাতবাআতুল ইরশাদ, ১৯৭১), খ.১, পৃ. ৬৫০

১০৩. জালালুদ্দিন আল-মাহাল্লি, *শারহে মিনহাজুত তালিবিন লিন নাবাভি বিহাশিয়াতি কালইউভি ওয়া আমিরাহ*(কায়রো : মাতবাআতুল ইসা আল-বাবি আল-হালাবি, তা.বি.), খ.২, পৃ. ৩৫৩

'ইসতিহসান হল, সামগ্রিক দলিলের বিপরীতে আংশিক স্বার্থ বা কল্যাণ গ্রহণ'[১০৪] পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলোর তুলনায় এ সংজ্ঞাটি ব্যাপক অর্থবোধক।

ইসতিসলাহ বা মাসালিহ মুরসালা (জনকল্যাণ বিবেচনা) **:** উসুলবিদগণ কিয়াসের ক্ষেত্রে কর্মের বৈশিষ্ট্য ও বিধানের মধ্যকার উপযোগিতাকে শারি'আহ প্রণেতা কর্তৃক বিবেচনার দিক বিবেচনার দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। শারি'আত প্রণেতা কর্মের যেসব বৈশিষ্ট্যকে আইন প্রণয়নের উপযুক্ত কার্যকারণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন সেগুলো মুনাসিব মু'তাবার (বিবেচ্য উপযোগ) এবং যেগুলো তিনি পরিত্যাগ করেছেন সেগুলো মুনাসিব মুলগা (পরিত্যাজ্য উপযোগ) হিসেবে স্বীকৃত। এ দু'প্রকার ছাড়া আরও এক প্রকার মুনাসিব রয়েছে, যা গ্রহণ বা পরিত্যাগের ব্যাপারে নাস বা ইজমায় কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। এ প্রকার মুনাসিবকে ইমাম মালিক রহ. মাসালিহ মুরসালাহ, ইমাম আল-গাযালি ইসতিসলাহ, মুতাকাল্লিম উসুলবিদগণ মুনাসিব মুরসাল মুলাইম, কেউ কেউ ইসতিদলাল মুরসাল, ইমামুল হারামাইন ও ইবনুস সাম'আনি ইসতিদলাল নামকরণ করেছেন।[১০৫]

মাসালিহ মুরসালাহ পরিভাষাটি মাসালিহ ও মুরসালাহ দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। মাসালিহ শব্দটি মাসলাহা শব্দের বহুবচন, যার অর্থ কল্যাণ, মঙ্গল, স্বার্থ।[১০৬] আর মুরসালাহ অর্থ মুক্ত, বন্ধনহীন।[১০৭] অতএব মাসালিহ মুরসালাহ অর্থ সাধারণ কল্যাণ, কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে পরিভাষাটি জনকল্যাণ, জনস্বার্থ, জনকল্যাণচিন্তা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পরিভাষায় মাসালিহ মুরসালাহ বলা হয়, 'ঐ সব বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীকে, যা শারি'আত প্রণেতার উদ্দেশ্যে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু তা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করার পক্ষে-বিপক্ষে কোন দলিল নেই। অথচ তা বিবেচনায় এনে কোন বিধান প্রণয়ন করলে মানুষের কল্যাণ সাধিত অথবা অকল্যাণ দূরীভূত হয়।[১০৮] যেমন– উমর রা.-এর জেলখানা ও দিওয়ান প্রতিষ্ঠা।

উরফ (রেওয়াজ ও প্রথা) **:** ফকিহগণ অনেক মাসআলার বিধান উদ্ভাবনে উরফ বা প্রথার উপর নির্ভর করেছেন। এ কারণে ইসলামি আইনে উরফ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত। ইসলামি আইনের প্রমাণাদি এ উৎসকে সমর্থন করে। একে কেন্দ্র করে অনেক ফিকহি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। এমনকি সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনাও এর প্রামাণিকতার স্বীকৃতি প্রদান করে। ইসলামি আইনের পাশাপাশি প্রচলিত আইনেও উরফ তথা প্রথা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

অভিধানে উরফ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কল্যাণ, উত্তম, খারাপের বিপরীত, ধারাবাহিকতা, স্বীকৃতি, অনুমোদন, সমর্থন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি।[১০৯]

পরিভাষায় উরফ বলা হয়, 'যেসব বিষয় মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বা তাদের মধ্যে প্রচলিত কর্মকাণ্ড যাতে তারা অভ্যস্ত হয়েছে, অথবা যেসব শব্দ প্রকৃত অর্থের বিপরীতে বিশেষ অর্থ প্রদানের জন্য তারা ব্যবহার করে, যা অন্যরা শ্রবণ করলে সহজবোধ্য হয় না।'[১১০]

---

১০৪. আবু ইসহাক ইবরাহিম আশ-শাতিবি, *আল-মুওয়াফাকাত*(আল-খুবার : দারু ইবন আফফান, ১৯৯৭), খ.৪, পৃ. ২০৬

১০৫. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৭৫২

১০৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৬

১০৭. ড. মুহাম্মদ মোস্তফা আয-যুহাইলি, *আল-ওয়াজিয ফি উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

১০৮. আবু ইসিহাক ইবরাহিম আশ-শাতিবি, *আল-মুওয়াফাকাত*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৪৩

১০৯. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১০৪

সাদ্দুয যারায়ে (অন্যায়ের উপকরণ রোধকরণ) **:** সম্পূরক অপরাধ বর্তমান সময়ে আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অপরাধ দমনে প্রণীত বিভিন্ন আইনে এ পরিভাষাটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এর ভিত্তিতে মূল অপরাধের সাথে সাথে উক্ত অপরাধের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী সম্পূরক অপরাধগুলো নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকে। ইসলামি আইনের অন্যতম উৎস সাদ্দুয যারায়ের দাবিও একই। কোন হারাম কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বা ফরয কাজ থেকে বিরতকারী কার্যাবলি নিষিদ্ধ করাই সাদ্দুয যারায়ে।

সাদ্দুয যারায়ে পরিভাষাটি দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সাদ্দ ও যারায়ে। সাদ্দ শব্দের অর্থ বাধা, প্রতিবন্ধকতা এবং ক্রিয়ামূল হিসেবে এর অর্থ বন্ধ করা, বাধা দেয়া, নিবারণ করা ইত্যাদি।[১১১] আর যারায়ে শব্দটি যারি'আহ শব্দের বহুবচন। যার অর্থ মাধ্যম, উসিলা, পথ ইত্যাদি।[১১২]

পরিভাষায় সাদ্দুয যারায়ে বলা হয়, যে সব অনুমোদিত কাজ বা উপায়-উপকরণ শারি'আত নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডে নিমজ্জিত করে, তার পথ রুদ্ধ করাই সাদ্দুয যারায়ে।[১১৩]

ইসতিসহাব (পূর্বের বিধান অক্ষুণ্ন রাখা) **:** ইসতিসহাব শব্দটি সাহবুন থেকে নির্গত। শব্দটির আভিধানিক অর্থ কোন কিছু বা অবস্থা স্থায়ী করতে চাওয়া, সঙ্গী মনোনীত করা, সঙ্গে থাকা, সঙ্গী হওয়া ইত্যাদি।[১১৪]

পরিভাষায়, 'পূর্বে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বহাল রাখা এবং যা অনানুমোদিত ছিল তার প্রত্যাখ্যান স্থায়ীকরণই ইসতিসহাব।'[১১৫]

আমালু আহলিল মদিনা (মদিনাবাসীর কর্ম) **:** আমালু আহলিল মাদিনা পরিভাষাটি তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। আমাল অর্থ কাজ, কর্ম। আহল শব্দের অর্থ অধিবাসী, অধিকারী এবং মদিনা শব্দের অর্থ নগর, শহর ইত্যাদি। তবে এখানে মদিনা দ্বারা নবী কারিম সা.-এর হিজরতের শহর মদিনা মুনাওয়ারা উদ্দেশ্য এবং মদিনাবাসী বলতে প্রথম তিন যুগ তথা সাহাবা, তাবিয়ি ও তাবি তাবি'ইনগণের যুগের মদিনাবাসীই উদ্দেশ্য। অতএব আমালু আহলিল মদিনার শাব্দিক অর্থ মদিনাবাসীর কর্ম।

পরিভাষায় মদিনাবাসীর কর্ম বলতে বুঝানো হয়, যে কাজের ব্যাপারে সাহাবা ও তাবি'ইগণের যুগে মদিনার অধিবাসী বিজ্ঞ আলিমগণ সকলে অথবা তাদের অধিকাংশ ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী আমল করেছেন। উক্ত কাজের বিধিবদ্ধতার সূত্র বর্ণনানির্ভর বা ইজতিহাদপ্রসূত যাই হোক না কেন।

কাওলুস সাহাবি (সাহাবিগণের অভিমত) **:** কওলুস সাহাবি পরিভাষাটি কওল ও সাহাবি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। কওল শব্দের অর্থ কথা, উক্তি, বাণী, বক্তব্য, মত, অভিমত ইত্যাদি।[১১৬] আর সাহাবি শব্দটি মূলত সাহিব থেকে সম্বন্ধ স্থাপনকারী আরবি ইয়া অক্ষর সহযোগে ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানে সাহিব শব্দটির অর্থ হলো– সঙ্গী, সাথী, নিকটতম বন্ধু, মালিক, অধিকারী,

---

১১০. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১০৪
১১১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮
১১২. মাজদুদ্দিন আল-ফিরূযাবাদি, *আল-কামুসুল মুহিত*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৩
১১৩. ইবন তাইমিয়া, *বায়ানুদ দালিল আলা বুতলানত তাহলিল*(রিয়াদ : মাকতাবাতু লিনা, ২য় প্রকাশ, তা.বি.), পৃ. ৩৫১
১১৪. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
১১৫. ইবন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *ই'লামুল মুআক্কি'ইন*(দাম্মাম : দারু ইবন জাওযি, ১৪২৩ হি.), খ.১, পৃ. ৩৩৯
১১৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৭

কোন মত বা পদ্ধতির অনুসরণকারী, কোন কিছুর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রহরী ইত্যাদি। অতএব কওলুস সাহাবি অর্থ রাসুল সা.-এর সাথীর উক্তি বা অভিমত।

শারউ মান কাবলানা (পূর্ববর্তী শারি'আত) : শারউ মান কাবলানা বা আমাদের পূর্ববর্তীদের শারি'আত বলা হয় ঐসব বিধি-বিধান ও আইন-কানুনকে, যা মহান আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য প্রণয়ন করেছিলেন, যা তাদের নবী ও রাসুলগণ যেমন– ইবরাহিম, মুসা, ইসা আ.-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন এবং যার মূল উদ্দেশ্য ছিল হালাল ও হারামের ভিত্তিতে মানুষের সাথে তার প্রতিপালকের এবং মানুষের সাথে অপর মানুষের সম্পর্ক পরিচালনা করা।[১১৭]

ইসলামি শারি'আহর আনুষঙ্গিক ও গৌণ উৎসগুলোর প্রত্যেকটা কুরআন ও সুন্নাহর সমর্থনপুষ্ট ও এতদুভয়ের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে শারি'আহর উৎস দুই প্রকার। এক, যাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র নকলের সাথে। দুই, যাদের সম্পর্ক কেবল রায়ের সাথে। প্রথম প্রকার উৎসের ভিত্তি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ এবং দ্বিতীয় প্রকার উৎসের ভিত্তি হচ্ছে কিয়াস ও ইসতিদলাল। ইসলামি শারি'আতে বুনিয়াদি ও কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ; বুদ্ধি তার অনুসারী মাত্র। অন্যদিকে মানব রচিত আইন অধিকতর বুদ্ধিনির্ভর।

শারি'আহ আইন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আল্লাহতা'আলা মানুষ ও এ বিশ্বজগতসহ সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। সুস্থ, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য একটা পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষকে প্রদান করেছেন শারি'আহ আইন।

'শারি'আহ' আরবি শব্দটির আভিধানিক অর্থ দীন, ধর্ম, জীবনব্যবস্থা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদি।[১১৮] তবে আরবি ভাষায় শব্দটার বুৎপত্তিগত অর্থ হল, পানির উৎসস্থল বা যে স্থান থেকে পানি উৎসারিত হয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সেখানে এসে পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করে।[১১৯]

অতএব 'আল্লাহতা'আলা যে সব আকিদা ও আমল মানুষের জন্য প্রণয়ন করেছেন, তা-ই শারি'আহ।[১২০] অন্যভাবে বলা যায়, 'শারি'আহ হচ্ছে আল্লাহতা'আলা, রাসুল সা. ও উলুল আমর তথা মুসলিম প্রশাসক ও আমিরের আনুগত্য করা।[১২১]

ইসলামি শারি'আহ হল, 'মহান আল্লাহ জীবন ও জগত পরিচালনার জন্য রাসুল সা.-এর মাধ্যমে যে সার্বিক হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান প্রদান করেছেন, তা-ই ইসলামি শারি'আহ।

ইসলামি শারি'আহর বৈশিষ্ট্য

ইসলামি শারি'আহর অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উপস্থাপিত হলো–

ইসলামি শারি'আহ রব্বানি তথা আল্লাহ প্রদত্ত : ইসলামি শারি'আহ প্রণয়ন করেছেন সে মহান স্রষ্টা, যিনি মানুষ ও জগত সৃষ্টি করেছেন এবং জগতের স্থান-কাল ও পাত্র ভেদে মানুষের জন্য কি কি সবচেয়ে কল্যাণকর তা তিনি জানেন। আল্লাহতা'আলা বলেন,

---

১১৭. ড. আনাওয়ার শুআইব আবদুস সালাম, *শারউ মান কাবলানা মাহিয়্যাতুহু ওয়া হুজিয়্যাতুহু ওয়া নাআতুহু ওয়া দাওয়াবিতুহু ওয়া তাতবিকাতুহু*(কুয়েত : কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা কমিটি, ১ম প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ১৫৭

১১৮ ইসমাইল ইবন হাম্মাদ আল-জাওহারি, *আস-সিহাহ*(কায়রো : দারুল হাদিস, ২০০৯), পৃ. ১২৩৬

১১৯ ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ. ১৭৪

১২০ ইবন তাইমিয়া, *মাজমু আল-ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ৩০৬

১২১ ইবন তাইমিয়া, *মাজমু আল-ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ৩০৯

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ط مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ط سُبْحٰنَ اللهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

'তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোন হাত নাই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং তারা যাকে শরিক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে!'[১২২]

আল্লাহতা'আলা আরও বলেন,

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

'যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।'[১২৩]

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে,

وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

'আল্লাহ সর্বজ্ঞ; প্রজ্ঞাময়।'[১২৪]

অত্রএব ইসালামি শারি'আহ সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত ও মানবতার জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর।

ইসলামি শারি'আহ বিশ্ব মানবতার জন্য : ইসলামি শারি'আহর সমস্ত আহকাম, বুনিয়াদি নীতিমালা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জাতি, দেশ ও বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

'আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।'[১২৫]

قُلْ يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

'বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসুল।'[১২৬]

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

'আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'[১২৭]

ইসলামি শারি'আহর ব্যাপকতা : ইসলামি শারি'আহতে রয়েছে মানব জীবনের প্রতিটি দিকের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা, আহকাম ও আইন-কানুন, চাই তা মানুষের আকিদা, ইবাদত ও চরিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিচার পদ্ধতি সংক্রান্ত হোক। আল্লাহতা'আলা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

'আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।'[১২৮]

---

১২২ আল-কুরআন, ২৮ : ৬৮
১২৩ আল-কুরআন, ৬৭ : ১৪
১২৪ আল-কুরআন, ৮ : ৭১
১২৫ আল-কুরআন, ২১ : ১০৭
১২৬ আল-কুরআন, ৭ : ১৫৮
১২৭ আল-কুরআন, ৩৪ : ২৮
১২৮ আল-কুরআন, ১৬ : ৮৯

ইসলামি শারি‘আহর মৌলিকত্ব ও চিরস্থায়ীত্ব : ইসলামি শারি‘আহর নীতিমালা মৌলিক এবং এর উৎস সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন বলে তা কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী। আল্লাহতা‘আলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا له لَحٰفِظُوْنَ.

‘আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই উহার সংরক্ষক।’[১২৯]

ইসলামি শারি‘আহ পালনে সহজতা ও কঠোরতা লাঘব : মানুষ যাতে ইসলামি শারি‘আহর আহকাম অত্যন্ত সহজে পালন করতে পারে আল্লাহতা‘আলা সেভাবেই শারই‘ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তদুপরি পালন করতে গিয়ে যখনই কেউ কোন যুক্তিগ্রাহ্য সমস্যার মুখোমুখী হয়, তখনই তার উপর থেকে হুকুমের ভার লাঘব করে দেয়া হয়। আল্লাহতা‘আলা বলেন,

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

‘আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চাহেন এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।’[১৩০]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

‘তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন না।’[১৩১]

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا.

‘আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।’[১৩২]

বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে চমৎকার সমন্বয় : ইসলামি শারি‘আহ একদিকে যেমন ইবাদত পালনের মাধ্যমে মানুষকে আখিরাতমুখী হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে, অপরদিকে পৃথিবীর বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ও দাবি পূরণের নির্দেশও তাকে দিয়েছে। পৃথিবীর কাজ ও ব্যস্ততার মাঝেও যাতে মানুষ আল্লাহর ইবাদত পালন করে সেদিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে,

رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالأَبْصَارُ.

‘সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।’[১৩৩]

আবার ইবাদত পালনের পাশাপাশি তাদেরকে জীবিকা অর্জনের নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

‘সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।’[১৩৪]

ব্যক্তি ও সমষ্টির যথাযথ মূল্যায়ন : ইসলামি শারি‘আহতে ব্যক্তি ও সমষ্টির কারো স্বার্থহানী না করে সকলের স্বার্থের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তিস্বার্থকে কখনো অবজ্ঞা করা হয়নি; তবে ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তখন সামষ্টিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

---

১২৯ আল-কুরআন, ১৫ : ৯

১৩০ আল-কুরআন, ২ : ১৮৫

১৩১ আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

১৩২ আল-কুরআন, ২ : ২৮৬

১৩৩ আল-কুরআন, ২৪ : ৩৭

১৩৪ আল-কুরআন, ৬২ : ১০

ইসলামি শারি‘আহ যুগোপযোগী : ইসলামি শারি‘আহ প্রগতিশীল। কেননা কালের আবর্তনে উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক চিন্তা-গবেষণার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এতে রয়েছে। সুতরাং যাবতীয় নতুন অবস্থার সাথে তা সামঞ্জস্যশীল হতে সক্ষম। রাসুল সা.-এর যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেমন এর সফল কার্যকারিতা রয়েছে, তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত এর কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন থাকবে। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত এটাই আল্লাহর দেয়া সর্বশেষ ও একমাত্র জীবনব্যবস্থা।

ইসলামি শারি‘আহ উদার : ইসলামি শারি‘আহ উদারতাসম্পন্ন। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সা. বলেন,

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

‘আমাকে উদারতাসম্পন্ন দীন সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে।’[১৩৫] এর ফলে এমন কি অমুসলিমগণ ইসলামি রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে থাকেন।

ইসলামি শারি‘আহ সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে : জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামি শারি‘আহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইসলামি শারি‘আহর গুরুত্ব : শারি‘আহ ও সমাজের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধন রয়েছে। বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে সমাজ গড়ে উঠে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সমাজের প্রত্যেকের রয়েছে নানাবিধ চাহিদা। ব্যক্তি একাই নিজের সেসব চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে সমাজের অন্যদের সহযোগিতার প্রতি তাকে মুখাপেক্ষী হতে হয়। ফলে স্বভাবতই মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সমাজবদ্ধ। সমাজের সকলের অধিকারকে সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজন একটা পরিপূর্ণ আইনি ব্যবস্থা ও বিধানের, যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করবে, অধিকারের সীমা নির্দিষ্ট করে দিবে ও প্রত্যেকের স্বেচ্ছাচারিতাকে আইনের দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করবে। এ ব্যবস্থা না হলে মানুষের সামষ্টিক জীবন হয়ে পড়বে খুবই দুষ্কর। কেননা মানুষের একটা প্রবণতা হচ্ছে নিজের সুবিধা ও স্বার্থকে বড় করে দেখা। এ প্রবণতা যদি আইন দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে পারস্পরিক যুলুম-নির্যাতন বেড়ে যাবে, অধিকার ক্ষুণ্ন হবে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। আর প্রতাপশালী ও কূটজাল বিস্তারকারীদের দৌরাত্ম প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং মানুষ সব সময়ই সুশৃঙ্খল আইন-কানুন সম্বলিত এমন এক ব্যবস্থা মেনে চলার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করেছে, যাতে সমাজের সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়, কেউ কারো অধিকার হরণ করতে না পারে এবং কেউই তার সীমা লঙ্ঘন করে অন্যের সীমায় অনুপ্রবেশ করতে না পারে। বস্তুত একটা সুষম, কল্যাণমুখী ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের পক্ষে সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ জীবন যাপন করা কোনমতেই সম্ভবপর নয়। এজন্যই আল্লাহর অবতারিত শারি‘আহ তার অগণিত অন্যান্য সকল নি‘আমতের মতই বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিরাট রহমত হয়ে দেখা দিয়েছে। এর ভিত্তিতেই হতে পারে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সার্থক সমাধান ও তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের সুষ্ঠু মীমাংসা ও নিষ্পত্তি।[১৩৬]

বস্তুত আল্লাহর শারি‘আহই হচ্ছে তার বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক ন্যায়পরায়ণতা স্থাপনের যথার্থ

১৩৫ ইমাম আহমাদ, *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৭১০; ২৪৭৭১

১৩৬ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*(ঢাকা : ইফাবা, জানুয়ারি ২০১৫), খ.১, পৃ. ২৩

বিধান। নিঃসন্দেহে সমগ্র মানবতার প্রতি এটা তার অনুগ্রহ ও করুণা। আল্লাহতা'আলা তার বান্দাদেরকে নিজ নিজ জীবন, সংগঠন ও সমাজের উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী করে ছেড়ে দেননি। বরং তাদেরকে প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত করেছেন ইসলামি শারি'আহর বিধান উপস্থাপন করে। মানব রচিত কোন বিধানই প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত ও পবিত্র নয়। তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হচ্ছে আল্লাহর শারি'আহ বিধান।

ইসলামি শারি'আহ ও প্রচলিত আইনের মধ্যে পার্থক্য : ইসলামি শারি'আহর মতই প্রচলিত মানব রচিত আইনসমূহ যদিও জনস্বার্থের কল্যাণ সাধনের অঙ্গীকার করে এবং সমাজের আইন, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করার আশাবাদ ব্যক্ত করে, কিন্তু এর সাথে ইসলামি শারি'আহর রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য, যাতে ইসলামি শারি'আহর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে সকল মানব রচিত মতবাদ ও আইনের উপর, যা মানুষ তার সীমাবদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে রচনা করেছে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তুলো ধরা হলো–[১৩৭]

১. **ইসলামি শারি'আহ আল্লাহ প্রদত্ত :** মানব রচিত নয় বলে শারি'আহ আইন সব ধরনের ক্রটিমুক্ত। পক্ষান্তরে মানুষ যেহেতু তার সকল কাজে পদে পদে ভুল-ক্রটি, অজ্ঞতা ও অক্ষমতার মুখোমুখি হয়, ফলে তাদের তৈরি আইন ও মতবাদ হয়ে থাকে নানাপ্রকার ভুল-ক্রটি ও সীমাবদ্ধতায় পরিপূর্ণ। তদুপরি পরিবেশ, প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে তা মোটেই মুক্ত নয়। অথচ শারি'আহ প্রণয়ন করেছেন সর্বজ্ঞানী মহাবিজ্ঞানময় এমন এক ইলাহ, আসমান ও যমিনের অণু পরিমাণ কোন বস্তুও যার থেকে অদৃশ্য ও অজ্ঞাত নয়, যিনি মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। ফলে স্বভাবতই তিনি তাদের সার্বিক কল্যাণের উপযোগী বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। 'মা'আলিম ফিত তরিক' গ্রন্থকার বলেন, 'যে শারি'আহ আল্লাহ মানব জীবনকে সুসংবদ্ধ করার জন্য প্রণয়ন করেছেন তা এমনই এক বিধান যা জগতের সাধারণ নিয়মের সাথে সম্পর্কিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং মানবজীবন ও যে জগতে সে মানব বাস করে তার মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনেই এ শারি'আহ আইন মেনে চলার আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, বরং যে আইন মানুষের ভিতরের স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে ও যে আইন মানুষের বাহ্যিক জীবনকে পরিচালনা করে এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে এবং মানব ব্যক্তিত্বের ভিতর ও বাইরের দু'টো দিকের মধ্যে একটা সঙ্গতি বিধানের তাড়নায়ও এ শারি'আহ আইন মেনে চলা উচিত। মানুষ যখন জগতের সকল নিয়মনীতি জানার সামর্থ রাখে না এবং সাধারণ জাগতিক নিয়মের সকল দিক আয়ত্বও করতে পারে না, এমন কি যে সত্ত্বা তাদের ফিতরাত ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেন ও তাদেরকে নিজের অধীনস্ত করে রাখেন, তারা ইচ্ছা করুক বা না করুক– সে সত্ত্বাকেও তারা আয়ত্ব করার সামর্থ রাখে না, তাহলে মানব জীবনের জন্য এমন বিধান রচনার অধিকার তাদের নেই,

১৩৭ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, মে ২০১৭), খ.১, পৃ. ১৭৫

যা দ্বারা মানুষের জীবন ও জগতের সঞ্চালনে এবং তাদের সুপ্ত স্বভাব ও বাহ্যিক জীবনে একটা ব্যাপক সামঞ্জস্য সাধিত হতে পারে। এ কাজের অধিকার রাখেন জগতের স্রষ্টা, মানুষের স্রষ্টা, যিনি নিজের ইচ্ছামত একটা নিয়মের অধীনে জগত ও মানবকে পরিচালিত করেন।'[১৩৮]

নিয়ম-কানুন ও আইন প্রণয়নে মানুষের মধ্যে বিস্ময়কর বিরোধিতার উপস্থিতি উপরোক্ত বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে সত্যায়ন করছে। কেননা পুঁজিবাদে মানুষ অসীম সম্পত্তির মালিক হতে পারে। পক্ষান্তরে কম্যুনিজম ও সমাজতন্ত্র এর পুরোপুরি বিপরীত। সেখানে ব্যক্তি সম্পদের মালিক হতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত সত্য কথা হলো, মানুষ যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন, সে আসলে অক্ষম এবং তার জ্ঞান যতই বিস্তৃত হোক না কেন, তা সীমিত। অতএব মানুষের পক্ষে এমন বিধান রচনা অসম্ভব যা পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য, সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর ও উপযোগী এবং সকল জাতির সুখ-শান্তির নিশ্চয়তা দানকারী।

২. **ইসলামি শারি'আহ চারিত্রিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে :** ইসলামি শারি'আহর দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনা, ব্যক্তি ও সমষ্টির সার্বিক কল্যাণ এবং জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর হিফাজতের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আখলাক। এজন্য রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاقِ.

'আমাকে উত্তম ও সৎ চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে।'[১৩৯]

আর তাই ইসলামি শারি'আহর যাবতীয় হুকুম-আহকাম চারিত্রিক মূলনীতি ও নৈতিকতার সঙ্গে সর্বতোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ। যারা তাদের আচার-ব্যবহারে, কর্মে ও জীবনের পথ পরিক্রমায় চারিত্রিক সততার দাবি অনুযায়ী চলে, ইসলামি শারি'আহ তাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করে। আর যারা এর বিপরীত পথে চলে ইসলামি শারি'আহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য যথার্থ শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে মানবরচিত আইনে এদিকের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। যেমন, চারিত্রিক অধঃপতন হিসেবে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও মানবরচিত আইনে যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি মাত্র দু'টো অবস্থাতেই দেয়া হয়।

(ক) যখন জবরদস্তিমূলক ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়;

(খ) যখন একপক্ষের সম্মতি ও অপর পক্ষের অসম্মতি থাকে।

এছাড়া অন্য সকল অবস্থায় ব্যভিচারের শাস্তির কোনো ব্যবস্থা মানবরচিত আইনে নেই। মদ্যপান, সমকামিতা ইত্যাদি আরো অনেক ক্ষেত্রের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। অথচ ইসলামি শারি'আহতে এ সব কিছুই পুরোপুরি নিষিদ্ধ ও আইনত দণ্ডনীয়।

৩. ইসলামি শারি'আহর দৃষ্টিতে আল্লাহ ও তার দেয়া বিধানের প্রতি সঠিক আকিদা পোষণ হচ্ছে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় উপকরণ এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ

---

১৩৮ সাইয়েদ কুতুব, *মা'আলিম ফিত তরিক*(কায়রো : দারুশ শুরুক, ১৯৭৯), পৃ. ১১১

১৩৯ ইমাম মালিক, *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, হাদিস নং ৩৩৫৭; ইমাম আহমাদ, *মুসানদ আহমাদ*, হাদিস নং ৮৯৫২

সাধনের মৌল ভিত্তি। কেননা তাকওয়াই শুধু সমাজের সকল মানুষকে সততা ও সত্যের পথে পরিচালিত করতে পারে এবং অন্যায়-অবিচার ও যুলুম থেকে রক্ষা করতে পারে। পক্ষান্তরে মানব রচিত কোন আইনেই মানুষের স্রষ্টার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের কোন গুরুত্ব নেই। ফলে সে আইন সমাজ থেকে সকল অন্যায় ও অবিচার দূর করতে অক্ষম।

শারি‘আহ আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ইসলামি শারি‘আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কথাটিকে আরবিতে নাম দেয়া হয়েছে ‘মাকাসিদে শারি‘আহ। শারি‘আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গভীরভাবে হৃদয়াঙ্গম করার জন্য এর আরবি পরিভাষাটির কিছুটা বিশ্লেষণ দরকার।

‘মাকাসিদে শারি‘আহ শিরোনামটিতে দুটি শব্দ রয়েছে। একটি হচ্ছে মাকাসিদ, যা মাকসাদ শব্দের বহুবচন। আরবিতে মাকসাদ শব্দটির একাধিক আভিধানিক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধানতম অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য।[১৪০] বাংলায় বলা হয় মনযিলে মাকসাদ অর্থাৎ গন্তব্যস্থল, যার উদ্দেশ্যে মানুষ যাত্রা করে থাকে। এদিক থেকে মাকসাদ ও মাকসুদ শব্দদ্বয়ের অর্থ প্রায় একই। আরেকটি শব্দ হচ্ছে শারি‘আহ। অতএব ‘মাকাসিদে শারি‘আহ’ ইসলামি আইন বিষয়ক জ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ শাখা, যা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শাস্ত্র হিসেবে আজ মুসলিম বিশ্বেও বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পঠিত হচ্ছে। সেজন্য ইসলামি শারি‘আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কথাটির বদলে এখানে মাকাসিদে শারি‘আহ কথাটিই বেশি ব্যবহৃত হবে।

পূর্ববর্তী মুসলিম পণ্ডিতগণ মাকাসিদে শারি‘আহর কোন সূক্ষ্ম পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেননি, যদিও বিষয়টি তাদের অনেকেরই জানা ছিল। তারা মাকাসিদে শারি‘আহর নানা বিষয় যেমন হিকমত বা প্রজ্ঞা, ইল্লাত বা কার্যকারণ, মাসালিহ বা কল্যাণ এবং মাফাসিদ বা অকল্যাণ প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। শারি‘আহর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা মাকাসিদে শারি‘আহর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন।[১৪১] পরবর্তী সময়ে মুসলিম পণ্ডিতগণ ইসলামি জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার সংজ্ঞা প্রদানে ব্রতী হন। তারই অংশ হিসেবে মাকাসিদে শারি‘আহর একাধিক সংজ্ঞা তারা দিয়েছেন। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো–

১. তিউনিসিয়ার প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত মুহাম্মাদ তাহির ইবন আশুর বলেন, ‘ব্যাপকার্থে মাকাসিদে শারি‘আহ হচ্ছে সে সব উদ্দেশ্য ও হিকমত, শারি‘আহর সকল কিংবা অধিকাংশ হুকুমের ক্ষেত্রে আল্লাহ যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন।’[১৪২]

২. প্রফেসর ড. আহমাদ রাইসুনি বলেন, ‘সকল বান্দার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে যে সব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শারি‘আহ প্রণয়ন করা হয়েছে তা-ই হলো মাকাসিদে শারি‘আহ।[১৪৩]

৩. ড. মুহাম্মদি সাদ আল-ইয়ুবি মাকাসিদে শারি‘আহর সংজ্ঞায় বলেন, ‘মাকাসিদে শারি‘আহ

---

১৪০ ড. শাওকি দাইফ, *আল-মু‘জামুল ওয়াসিত*(কায়রো : মাকতাবা আশ-শুরুক আদ-দুওয়ালিয়্যাহ, ২০০৪), খ.২, পৃ. ৭৩৭

১৪১ ড. মুহাম্মাদ সা’দ আল-ইয়ুবি, *মাকাসিদুশ শারি‘আহ আল-ইসলামিয়া*(রিয়াদ : দারুল হামযাহ, ১৯৯৮), পৃ. ২৩-২৪

১৪২ মুহাম্মাদ তাহির ইবন আশুর, *মাকাসিদুশ শারি‘আহ*(দোহা : ধর্ম ও ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ২০০৪), পৃ. ৫১

১৪৩ ড. আহমাদ আল-রাইসুনি, *ইমাম শাতিবির মাকাসিদ তত্ত্ব*(কায়রো : দারুল কালিমা, ২০১৪), পৃ. ৭

হচ্ছে সে সকল উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও হিকমত, শারি'আহ প্রণয়নের সময় সকল বান্দার কল্যাণ সাধনের জন্য সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে যেগুলোর প্রতি আল্লাহ লক্ষ্য রেখেছেন।[১৪৪]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো খুবই কাছাকাছি। এগুলোর আলোকে সংক্ষেপে বলা যায় যে, মাকাসিদে শারি'আহ হচ্ছে সে সকল মাসালিহ ও কল্যাণমুখী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সমষ্টি, শারই' হুকুম মেনে চলার মাধ্যমে বান্দাদের জন্য যা অর্জিত হওয়ার ইচ্ছা আল্লাহ করে থাকেন।

মাকাসিদে শারি'আহর উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শারি'আহর বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও বিষয়সমূহে। ইবাদত, মু'আমালাত, বিবাহ-শাদি, অপরাধ আইন ও কাফফারা প্রভৃতি সকল অধ্যায়েই শারি'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মাকাসিদ বর্ণিত আছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শারি'আহর প্রতিটি হুকুম ও শিক্ষা প্রণীত হয়েছে বিশেষ কিছু হিকমত, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও এমন সব কল্যাণকে সামনে রেখে যার সুফল বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে লাভ করে থাকে। এ সকল হিকমত, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কল্যাণের অনেকগুলো আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আবার বেশ কিছু কুরআন ও সুন্নাহের মূলনীতির আলোকে উদ্ভাবন করেছেন আলিম-উলামা, তাফসিরকারক ও মুজতাহিদগণ।[১৪৫] সে সবের কিছু উদাহরণ নিচে প্রদত্ত হলো−

- অযু ও গোসলের বিধান দেয়া হয়েছে সালাত ও তাওয়াফের কার্য সম্পাদনের জন্য এবং প্রত্যেক মুসলিমের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য, যাতে একটি পরিচ্ছন্ন সভ্য মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সকল জাতির মধ্যে ফুলের মতই সৌন্দর্যের আধার হয়ে বিরাজ করবে।
- জামাআতবদ্ধ সালাত ও জুমু'আহর সালাতের বিধান এসেছে মহান আল্লাহর স্মরণকে জাগরূক করার জন্য, মুসলিমদেরকে সত্য, সততা ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এবং ইমান-আকিদাকে নবায়ন করা, সহিহ জ্ঞানার্জন করা ও ইবাদতকে বিশুদ্ধ পন্থায় আদায় করার জন্য।
- সালাতের উদ্দেশ্যে আযানের বিধান দেয়া হয়েছে ইবাদতের সময় হওয়ার ঘোষণা দেয়ার জন্য এবং মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে একত্রিত করার জন্য। বস্তুত আযান হচ্ছে মানুষের বাস্তব জীবনে ইসলামের নীতি ও আদর্শ প্রচারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম এবং আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশের একটি উত্তম পন্থা।
- পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের বিধান দেয়া হয়েছে আল্লাহর ইবাদত পালনের জন্য, দিনে পাঁচবার তার সাথে সম্পর্ক নবায়ন করে স্থির আদর্শ ও আনুগত্যের উপর নিজেকে অভ্যস্ত করার জন্য, অলসতা ঝেড়ে ফেলে সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার অনুসারী হওয়ার জন্য এবং সালাত আদায়কারীকে দুনিয়ার সকল কষ্ট, জীবনের নানাবিধ সমস্যা ও শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য।

---

১৪৪ ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইয়ুবি, *মাকাসিদুশ শারি' আহ আল-ইসলামিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১৪৫ ড. নুরুদ্দিন ইবন মুখতার আল-খাদিমি, *আল-মাকাসিদ আশ-শারইয়্যাহ*(রিয়াদ : মাকতাবাতু আল-ওবাইকান, ২০০১), পৃ. ৩০-৩৩

- শুকর, মৃতদেহ ও রক্তের ন্যায় অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ মুসলিমদের উপর হারাম করার পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য ও আদেশ পালন এবং শারীরিক, মনস্তাত্বিক ও সামাজিক বিপর্যয় ও ক্ষতি পরিহার। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে এ সকল হারাম ও নিকৃষ্ট বস্তু মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
- সমাজের সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ এ জন্যই দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ নিজ অধিকার লাভ করে এবং সমাজের ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিবাদ-বিসম্বাদ দূরীভূত হয়। আর মানুষ যেন আইন ও শৃঙ্খলার পথে, অধিকার অর্জনের পথে অগ্রসর হয়।
- বিবাহ-শাদি, নানাবিধ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য অনেক মু'আমালাত ইসলামি শারি'আহর মধ্যে বৈধ করা হয়েছে মানুষের জীবন ধারণকে সহজতর করার জন্য এবং মানুষের জরুরি ও প্রয়োজনীয় লেনদেনকে সহজ করে মানুষের জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করার জন্য।

এভাবে ইসলামি শারি'আহর সকল বিধানেই নিহিত রয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, হিকমত ও কারণ।

আল-কুরআনে মাকাসিদে শারি'আহ তথা ইসলামি শারি'আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও পন্থায় উপস্থাপিত হয়েছে। নিচে তার কিছু উদ্ধৃত হলো–

১. আল্লাহতা'আলা কুরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাকিম ও প্রজ্ঞাবান। আল্লাহতা'আলা বলেন,

تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ.

'ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।'[১৪৬]

তিনি অন্যত্র বলেন,

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ.

'এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী; সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে–[১৪৭]

উক্ত আয়াতসমূহের এ কথাগুলোর অনিবার্য দাবি হল, তার প্রণীত প্রতিটি বিধানের অবশ্যই একটা হিকমত ও উদ্দেশ্য রয়েছে এবং কোন কিছুই তিনি অনর্থক উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রচলন করেননি।

২. আল্লাহ কুরআনের একাধিক স্থানে তিনি নিজেকে সবচেয়ে দয়ালু ও করুণাময় বলে উল্লেখ করেন। আল্লাহতা'আলা বলেন,

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ.

'আর আমার দয়া– তাহা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত।'[১৪৮]

একটা দু'আয় তিনি এভাবে বলা শিখিয়ে দিয়েছেন যে,

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ.

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ইমান এনেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'[১৪৯]

---

১৪৬ আল-কুরআন, ৪১ : ৪২

১৪৭ আল-কুরআন, ৩৯ : ১; ৪০ : ২; ৪৫ : ২; ৪৬ : ২

১৪৮ আল-কুরআন, ৭ : ১৫৬

১৪৯ আল-কুরআন, ২৩ : ১০৯

আর মানুষের প্রতি তার করুণা হচ্ছে, তাদের জন্য এমন সকল বিধান প্রণয়ন যা তাদের জন্য কল্যাণকর। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবন কায়্যিম 'শিফাউল আলিল' গ্রন্থে বলেন, 'তার হিকমত ও তার উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করার অর্থই হল প্রকৃতপক্ষে তার রহমত ও দয়াকে অস্বীকার করা।'[১৫০]

৩. কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি এ কাজ এ উদ্দেশ্যে করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًاؕ.

'এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।'[১৫১]

তিনি আরো বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُؕ.

'আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর।'[১৫২]

৪. কুরআনের অনেক স্থানে শারি'আহর কতিপয় মাকাসিদ ও উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে আবার কোথাও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন– দীনের সকল ক্ষেত্রে কঠোরতা বিলোপ ও অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍؕ.

'তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।'[১৫৩]

আর কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে জিহাদ, সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হাজ প্রভৃতি ইবাদতসমূহের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ.

'এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়িম কর।'[১৫৪] আর সিয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

'হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার–'[১৫৫]

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, শারি'আহর প্রতিটি হুকুমের পশ্চাতেই রয়েছে একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হল কিভাবে সে উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটি শারি'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে কোন একটি বিষয়কে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য বলে দাবি করা কিংবা উদ্দেশ্য নয় বলে ঘোষণা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন ধীরস্থিরভাবে গভীর চিন্তা-ভাবনা, বিশুদ্ধ নিয়ম-প্রণালীর অনুসরণ এবং সেসব উপায় ও পন্থাসমূহ সুনির্দিষ্ট করা যার দ্বারা সেগুলোকে সহজেই চেনা যাবে। মাকাসিদে শারি'আহ সম্পর্কে জানার এ ধরনের উপায়

---

১৫০ ইমাম ইবন কায়্যিম, *শিফাউল আলিল*(কায়রো : মাকতাবাতু দারুত তুরাছ, ১৩২৩ হি.), পৃ. ৪২৬
১৫১ আল-কুরআন, ২ : ১৪৩
১৫২ আল-কুরআন, ৪ : ১০৫
১৫৩ আল-কুরআন, ২২ : ৭৮
১৫৪ আল-কুরআন, ২০ : ১৪
১৫৫ আল-কুরআন, ২ : ১৮৩

হচ্ছে মোট পাঁচটি।[১৫৬] যেমন–

১. **আল-ইস্তিকরা তথা গবেষণাভিত্তিক অনুসন্ধান :** ইস্তিকরা হচ্ছে শারি‘আহর সকল দলিল ও হুকুম-আহকামের পূর্ণ অনুসন্ধান করে শারি‘আহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া। যেমন, শারি‘আহর সকল দলিল ও হুকুম-আহকাম অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ তথা আদ-দরুরিয়াত সর্বমোট পাঁচটি– দীন, জীবন, বিবেব-বুদ্ধি, বংশধারা ও সম্পদের হিফাজত। অতএব সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ পাঁচটি বিষয়ের হিফাজত ও সংরক্ষণ শারি‘আহ প্রণেতার অন্যতম উদ্দেশ্য।

২. **শারই‘ নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহের কারণ জানা :** ইসলামি শারি‘আতে যে সকল নির্দেশাবলী কিংবা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে যে কারণ দর্শানো হয়েছে তাদ্বারা শারি‘আহর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহতা‘আলা বলেন,

يٰأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সে প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার।’[১৫৭] আল্লাহতা‘আলা আরো বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

‘আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।’[১৫৮] আল্লাহতা‘আলা আরো বলেন,

مَا أَفَاءَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِه مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ.

‘আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট হতে তার রাসুলকে যে ফায় দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসুলের, রাসুলের স্বজনদের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।’[১৫৯]

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন,

إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا.

‘মদিনায় আগমনকারী ভ্রমণ কাফেলার কারণেই আমি তোমাদেরকে কুরবানির গোশত মওজুদ করতে নিষেধ করেছিলাম। তবে এখন তোমরা তা ভক্ষণ করতে পার, মওজুদ করতে পার এবং সদকা করতে পার।’[১৬০]

৩. **প্রাথমিকভাবে আরোপিত যে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ কিংবা নিষেধাজ্ঞা :** এটা থেকে বুঝা যায় যে, নির্দেশটি কার্যে পরিণত করা হোক এবং নিষেধকৃত বস্তু থেকে বিরত থাকা হোক– এটাই শারি‘আহ প্রণেতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অতএব কেউ যদি শারি‘আহর নির্দেশ

---

১৫৬ ড. মুহাম্মাদ সা’দ আল-ইয়ুবি, *মাকাসিদুশ শারি‘আহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

১৫৭ আল-কুরআন, ২ : ২১

১৫৮ আল-কুরআন, ১৬ : ৮৯

১৫৯ আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

১৬০ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৫০০, হাদিস নং ৪৯৪৭

বাস্তবায়ন না করে কিংবা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে সে শারি‘আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করল।

৪. **যে বক্তব্য থেকে সরাসরি মাকাসিদ জানা যায় :** এ ধরনের বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে শারি‘আহ প্রণেতা স্বয়ং তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করা। যেমন আল্লাহর বাণী–

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

‘আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।’[১৬১]

তিনি আরো বলেন,

يُرِيْدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. وَاللهُ يُرِيْدُ أَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ أَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلاً عَظِيْمًا.

‘আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদের ক্ষমা করতে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করতে চান, আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।’[১৬২]

তিনি আরো বলেন,

مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ.

‘আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।’[১৬৩]

এ ধরনের বক্তব্যের মধ্যে আরো রয়েছে– নির্ধারণ করে দেয়া, ফরয করা, হুকুম দেয়া, নির্দেশ প্রদান করা, অনুমতি দেয়া, হারাম করা ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ.

‘তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে।’[১৬৪]

তিনি আরো বলেন,

ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ.

‘এটাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন।’[১৬৫]

তিনি আরো বলেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ.

‘হে মু’মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল।’[১৬৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَائِ ذِى الْقُرْبٰى.

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।’[১৬৭]

১৬১ আল-কুরআন, ২ : ১৮৫
১৬২ আল-কুরআন, ৪ : ২৬-২৭
১৬৩ আল-কুরআন, ৫ : ৬
১৬৪ আল-কুরআন, ১৭ : ২৩
১৬৫ আল-কুরআন, ৬০ : ১০
১৬৬ আল-কুরআন, ২ : ১৮৩
১৬৭ আল-কুরআন, ১৬ : ৯০

এ সকল বক্তব্যের মধ্যে আরো রয়েছে– কল্যাণকর, অকল্যাণকর কিংবা উপকারী বা ক্ষতিকর অথবা প্রিয় বা অপ্রিয় বলে উল্লেখ করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ.

'আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর।'[১৬৮]

তিনি আরো বলেন,

فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

'তোমরা যদি তাহাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।'[১৬৯]

৫. **নির্দেশ দান বা নিষেধ করার বাস্তব কারণ থাকা সত্ত্বেও তা না করে শারি'আহ প্রণেতার চুপ থাকা :** যদি প্রয়োজনীয় কার্যকারণ থাকা সত্ত্বেও শারি'আহর নির্দেশ না আসে তাহলে বুঝতে হবে উক্ত কাজে শারি'আহর অনুমোদন নেই। আবার নিষেধ করার যথার্থ কারণ ও উপলক্ষ থাকা সত্ত্বেও যদি শারি'আহ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে কাজটি শারি'আহর দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়।

শারি'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রকরণসমূহ : শারি'আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে– মানব গোষ্ঠীকে কামনা ও লালসার হাতছানি থেকে মুক্ত করে সত্য, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে আসা যেন পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সঠিক ও যথানিয়মে কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে। কেননা এ বিধান অত্যন্ত সুদৃঢ়, সুষ্ঠু ও ঋজু।[১৭০] ইসলামি শারি'আহর প্রতিটি বিধানেরই রয়েছে বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শারি'আহর এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তিনটি প্রকরণে ভাগ করা যায়, যার প্রত্যেকটিতে রয়েছে আলাদা আলাদা প্রকারভেদ।[১৭১]

প্রথম প্রকরণ : মৌলিকত্বের দিক থেকে শারি'আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দুই প্রকার। যথা–

এক. মৌলিক মাকাসিদ : এ দ্বারা শারি'আহর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও মাকাসিদ বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ শারি'আহ প্রণেতা কোন নির্দেশ দ্বারা প্রথম যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন তা বুঝানো হয়েছে। যেমন– সালাত আদায়ের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, স্মরণ এবং অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে মুক্তি।

দুই. গৌণ ও আনুষঙ্গিক মাকাসিদ : যে সব মাকাসিদ মৌলিক মাকাসিদের সাথে কিংবা পরে অর্জিত হয় সেগুলো হচ্ছে গৌণ ও আনুষঙ্গিক মাকাসিদ। যেমন– সালাত আদায়ের মাধ্যমে শারীরিক-মানসিক প্রশান্তি লাভ, অযুর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা অর্জন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকরণ : ব্যাপকতার দিক থেকে মাকাসিদে শারি'আহ তিন প্রকার। যথা–

(১) ব্যাপক মাকাসিদ : ইসলামি শারি'আহর সকল ক্ষেত্রে ও সকল অধ্যায়ে যে সকল মাকাসিদ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ব্যাপক মাকাসিদ। যেমন–

(ক) মাসালিহ তথা কল্যাণ সাধন এবং মাফাসিদ তথা অকল্যাণ ও ক্ষতি প্রতিহতকরণ।

(খ) সহজিকরণ ও কঠোরতা বিলোপ ইত্যাদি।

---

১৬৮ আল-কুরআন, ২ : ১৮৪

১৬৯ আল-কুরআন, ৪ : ১৯

১৭০ মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শারী'আতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৭১ ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইয়ুবি, *মাকাসিদুশ শারি'আহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

(২) নির্দিষ্ট মাকাসিদ : শারি‘আহর নির্দিষ্ট অধ্যায় ও বিষয়ভিত্তিক যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় নির্দিষ্ট মাকাসিদ। যেমন– সালাতের উদ্দেশ্য, সিয়াম ও হাজের বিশেষ উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

(৩) ক্ষুদ্র মাকাসিদ : শারি‘আহর যে সকল মাকাসিদ শুধুমাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট মাসাআলার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাকে বলা হয় ক্ষুদ্র মাকাসিদ। যেমন– অযুর সময় নাকে পানি দেয়ার উদ্দেশ্য কিংবা সালাতে রুকু আদায়ের উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রকরণ : মাসালিহ বা মানব কল্যাণ সাধনের যে উদ্দেশ্যে শারি‘আহ প্রণীত হয়েছে সে দিক বিবেচনায় শারি‘আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তিন প্রকার। যথা–

(১) দরুরিয়াত (মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ);

(২) হাজিয়াত (মানব জীবনের প্রয়োজনসমূহ);

(৩) তাহসিনিয়াত (মানব জীবনের শোভাবর্ধনকারী বিষয়সমূহ)।

দরুরিয়াত (মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ) : শারি‘আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দৃষ্টিতে মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ হলো দরুরিয়াত। মহান আল্লাহ মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যই ইসলামি শারি‘আহর সকল বিধান প্রণয়ন করেছেন। মানব জীবনের সর্বাধিক জরুরি বিষয়সমূহের সংরক্ষণ ও হিফাজত সে বিধানেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামি শারি‘আহর পরিভাষায় এ বিষয়সমূহের নাম দেয়া হয়েছে দরুরিয়াত।

ইমাম শাতিবি রহ. দরুরিয়াত-এর সংজ্ঞায় বলেন, ‘দরুরিয়াত হচ্ছে দীন ও দুনিয়ার সে সকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ যার অনুপস্থিতিতে দুনিয়ার কল্যাণের সঠিক গতিধারা ব্যাহত হয়; বরং এ ক্ষেত্রে দেখা দেয় বিপর্যয়, সীমাহীন ক্ষতি ও প্রাণ হারানোর ঘটনা। আর আখিরাতে মুক্তি ও নি‘আমত লাভ হয় সুদূর পরাহত এবং সুস্পষ্ট ক্ষতিতে লিপ্ত হওয়া হয়ে উঠে অবধারিত।’[১৭২]

প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আল-মুহাল্লি বলেন, ‘যে সব বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা জরুরি পর্যায়ে পড়ে, সেগুলোই হচ্ছে দরুরিয়াত।’[১৭৩]

দরুরিয়াতের বিষয়সমূহ : দরুরিয়াত হলো পাঁচটি বিষয়। সেগুলো হলো–

- হিফজুদ দীন তথা দীনের হিফাজত;
- হিফজুন নাফস তথা জীবনের হিফাজত;
- হিফজুল আকল তথা বিবেকের হিফাজত;
- হিফজুন নাসাল ওয়াল ইজ্জাত তথা বংশধারা ও সম্মানের হিফাজত;
- হিফজুল মাল তথা সম্পদের হিফাজত।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়কে বলা আল-মাকাসিদ আল-খামসাহ বা শারি‘আহর পাঁচটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এগুলো ছাড়া পৃথিবীতে মানব জীবন কোনভাবেই চলতে পারে না। আর এ জন্যই দীন, জীবন, আকল, বংশধারা-সম্মান ও সম্পদের হিফাজত ইসলামি শারি‘আহর একটি মৌলিক লক্ষ্য

---

১৭২ আবু ইসহাক ইবরাহিম আশ-শাতিবি, *আল-মুওয়াফাকাত*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৮

১৭৩ জালালুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-মুহাল্লি, *শারহুল মুহাল্লি আলা জাময়িল জাওয়ামি*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৮

ও উদ্দেশ্য। এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দীন, তারপর মানুষের জীবন, আকল, বংশধারা ও সম্মান এবং সর্বশেষে সম্পদ। নিচে প্রমাণসহ এ পাঁচটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলো–

প্রথম বিষয় : দীনের হিফাজত : দীনকে সচরাচর ধর্ম বলা হয়ে থাকে। যদিও কুরআনে 'দীন' বলতে নিছক ধর্ম বুঝানো হয়নি। কুরআনের দীন মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সমাধান প্রদান করে থাকে। সেখানে মানুষের সামগ্রিক জীবনই থাকে দীনের আওতাভূত। ধর্মীয় জীবন সেখানে মানুষের পুরো জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অংশ নয়।

মানুষ স্বভাবতই কোন না কোন ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে, চাই সে ধর্ম সত্য হোক বা বাতিল হোক। এর বাইরে অবস্থান রয়েছে খুবই কম মানুষের। এখানে দীন বলতে যে কোন ধর্মকে বুঝানো হয়নি; বরং সে সত্য দীনকে বুঝানো হয়েছে যা মহান আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ তথা ইসলাম। কেননা মানব রচিত কোন ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, আবার অন্যান্য আসমানি দীনসমূহ সর্বশেষ দীন ইসলাম দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আল্লাহতা'আলা বলেন,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ قف.

'নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।'[১৭৪]

আল্লাহতা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الأٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

'কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।'[১৭৫]

দীনের হিফাজতের উপায় ও পন্থা : মহান আল্লাহ নিজেই এ দীনকে হিফাজতের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَه لَحٰفِظُوْنَ.

'আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।'[১৭৬]

এ আয়াতে যিকর বলতে কুরআন, সুন্নাহ এবং দীন সবকিছুকেই বুঝানো হয়েছে। দীনকে হিফাজতের জন্য আল্লাহ যে সকল পন্থা ও উপায় অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন তাহলো–

এক. দীনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা : আল্লাহ এ দীন প্রণয়ন করেছেন সে অনুযায়ী আমল করার জন্য, দীনের কিছু বচন ও উক্তি হিফাজত করার জন্য শুধু নয়। কেননা দীন হচ্ছে আকিদা-বিশ্বাস ও আমলের সমন্বয়। আকিদা হচ্ছে দীনের মূল, আর আমল ছাড়া দীনের সুফল কোনমতেই পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক মুসলিম বাস্তব জীবনে দীনকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হলে অচিরেই তার সুফল সে দেখতে পাবে। অতএব দীনের সুরক্ষার জন্য সে অনুযায়ী আমল করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্যই আল্লাহতা'আলা মানুষের উপর সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হাজসহ আরো অনেক আমল ফরয করেছেন।

---

১৭৪ আল-কুরআন, ৩ : ১৯

১৭৫ আল-কুরআন, ৩ : ৮৫

১৭৬ আল-কুরআন, ১৫ : ৯

দীন অনুযায়ী আমলের একটা সর্বনিম্ন সীমা রয়েছে যা অতিক্রম করার অনুমতি কাউকে দেয়া হয়নি। তা হচ্ছে ফরয-ওয়াজিব মেনে চলা এবং হারাম পরিহার করা। ড. আবদুল্লাহ আহমাদ আল-কাদিরি বলেন, 'এ থেকেই আল্লাহতা'আলা মুসলিমদের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর একটি সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা দ্বারা দীনের সুরক্ষা হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে ফরযে আইন যা পালন থেকে কেউই অব্যাহতি পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত শারি'আহর অর্পিত দায়িত্ব পালনের বুদ্ধিগত সামর্থ ও কার্যে পরিণত করার বাস্তব সক্ষমতা তার থাকে। এর উপমা হচ্ছে, ইমান ও ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহ। আল্লাহ প্রত্যেককেই ইমান ও ইসলাম অনুযায়ী আমলের দায়িত্ব দিয়েছেন।'[১৭৭]

দীনের আমল মানুষের জীবনে সত্যিকার অর্থে ফলপ্রসূ ও প্রভাবশালী করার জন্য প্রয়োজন এগুলোকে আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসুল সা. প্রদর্শিত পন্থায় পালন করা। এভাবে আমল করতে পারলেই তা হবে প্রকৃত দীন। কিন্তু যখনই বাস্তবায়নে ত্রুটি দেখা দিবে এবং প্রকৃত দীন ও আমলে পার্থক্য সূচিত হবে তখন এ আমলকারীকে প্রকৃত দীনের অনুসারী আমলদার হিসেবে গণ্য করা হয় না। এখান থেকেই মুসলিম ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। কেননা মুসলিমদের কাজ কখনো ঠিক হতে পারে, কখনো ভুল হতে পারে, কখনো হক ও কখনো বাতিল হতে পারে; কিন্তু ইসলাম শুধুই হক ও সত্যাশ্রয়ী, এতে বাতিল থাকার কোনই সম্ভাবনা নেই। ফলে আজকের মুসলিমদের কাজকর্ম দীনের বিরুদ্ধে কোন দলিল হতে পারে না; বরং প্রকৃত দীনের আলোকেই সকলের কর্মধারা যাচাই করা হবে।

দুই. দীনের নির্দেশনা অনুযায়ী যাবতীয় হুকুম পরিচালনা : দীনের নির্দেশনা অনুযায়ী যাবতীয় হুকুম পরিচালনা দীনের হিফাজতের একটি অন্যতম জরুরি পন্থা। কেননা দীনই যদি হুকুম পরিচালনার মূল কর্তৃপক্ষ না হয় তাহলে সে দীন হিফাজত করা সম্ভব হয় না। দীনের হিফাজতের অর্থ শুধু কাগজে-কলমে কিংবা কিতাবে একে সংরক্ষণ করা নয়। বরং মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে দীনের নির্দেশ মেনে চলাই হচ্ছে দীনের সবচেয়ে বড় হিফাজত।[১৭৮]

এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দীনকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর অবতারিত নির্দেশ ও গ্রন্থ ছাড়া অন্য আইন দ্বারা হুকুম পরিচালনা করার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর দীন ও হুকুমের স্থলে মানব প্রবৃত্তি ও মতবাদকে সেখানে স্থলাভিষিক্ত করা। দীনকে ধ্বংস করার জন্য এর চেয়ে আর বড় কোন উপায় হয়ত নেই এবং দীনের বিরুদ্ধে কৃত এর চেয়েও বড় কোন অপরাধ আর নেই।

মহান আল্লাহতা'আলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।'[১৭৯]

আল্লাহতা'আলা আরো বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

---

১৭৭ ইসলাাম ও জীবনের অপরিহার্য বিষয়সমূহ, পৃ. ৩১

১৭৮ ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইয়ুবি, *মাকাসিদুশ শারি' আহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭-১৯৮

১৭৯ আল-কুরআন, ৪ : ৬৫

'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির–সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।'[১৮০]

তিন. দীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা : দীনের প্রতি আহ্বান মূলত নবী-রাসুলগণেরই সুমাহন কাজ। এ দায়িত্ব পালনের জন্যই তারা আজীবন সংগ্রাম করেছেন, কষ্ট করেছেন এবং সকল বিপদে-আপদে চরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দা'ওয়াত ও আহ্বানের এ মহান দায়িত্ব পালন ব্যতীত কোন দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা ও প্রসারিত করা সম্ভব নয়।

বাস্তবে দেখা যায় যে, অনেকে তাদের নিজ নিজ মতবাদ বাতিল ও ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন পন্থায় তা প্রচার ও বর্ণনার কাজে লিপ্ত হয়। ইসলামের শত্রুরাও আজ ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে। তাহলে মহান আল্লাহর দেয়া সত্যকে প্রচারের জন্য এবং বিশেষ করে একে শত্রুদের বিকৃতি থেকে রক্ষা করার জন্য দা'ওয়াতি পন্থার আশ্রয় নেয়া মুসলিমদের উপর অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহতা'আলা বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

'তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকা আবশ্যক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।'[১৮১]

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط.

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস কর।'[১৮২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَادْعُ إِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

'তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'[১৮৩]

আল্লাহতা'আলা দা'ওয়াতের কৌশল বর্ণনা করে ঘোষণা করেন,

اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ط.

'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ সহকারে এবং তাদের সঙ্গে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়।'[১৮৪]

চার. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ : দীনকে হিফাজতের একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। জিহাদ একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। ব্যাপকার্থে জিহাদ আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত সকল কর্মকাণ্ডকেই বুঝায়। এ হিসেবে আল্লাহর দীনের প্রতি দা'ওয়াত ও আহ্বান জিহাদের প্রাথমিক অধ্যায়। আর বিশেষ অর্থে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত রাখার জন্য, ইসলাম ও

---

১৮০ আল-কুরআন, ৫ : ৪৪
১৮১ আল-কুরআন, ৩ : ১০৪
১৮২ আল-কুরআন, ৩ : ১১০
১৮৩ আল-কুরআন, ২৮ : ৮৭
১৮৪ আল-কুরআন, ১৬ : ১২৫

মুসলিমদেরকে ইসলাম বিরোধীদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ও ইসলামকে আল্লাহর যমিনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উলিল আমরের নেতৃত্বে যে যুদ্ধ হয়ে থাকে তাকে জিহাদ বলা হয়। আল্লাহতা'আলা বলেন,

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, হত্যা করে ও নিহত হয়।'[১৮৫]

পাঁচ. দীন বিরোধী সকল কথা ও কাজ প্রতিরোধ করা : এটাও মূলত জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। দীনের হিফাজতের জন্য এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় একে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হলো। কেননা যদি দীন বিরোধী বাতিল কথা, বিভ্রান্ত আকিদা, ভ্রষ্ট চিন্তাধারা এবং ক্ষতিকর মতবাদসমূহকে কোন প্রকার বাদ-প্রতিবাদ ছাড়াই মুসলিমদের চিন্তজগতে আঘাত হানার সুযোগ করে দেয়া হয়, তাহলে দীনের মৌলিক ধারণা লোপ পেতে থাকবে, সত্যকে বাতিল ও মিথ্যার সাথে গুলিয়ে ফেলা হবে। ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে দীন হতে মানুষ সরে যেতে থাকবে। তা যেন না হয় সে জন্য অতীতে যেমন বহু আলিম দীন সম্পর্কে সকল বিভ্রান্তি ও সংশয় অপনোদনের জন্য কলম ধরেছিলেন এবং সত্যের পক্ষে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, বর্তমানেও তেমনি মুসলিম পণ্ডিতগণ বিভিন্নভাবে কাজ করছেন।

দ্বিতীয় বিষয় : জীবনের হিফাজত : মানব জীবনের হিফাজতের জন্য ইসলাম খুব বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে। জীবনের সুরক্ষার জন্য এবং জীবনকে সকল ক্ষতি ও বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য ইসলামে প্রণীত হয়েছে বহু হুকুম-আহকাম ও দেয়া হয়েছে অনেক বিধি-বিধান। জীবনের হিফাজতের উপায় হিসেবে বিবেচিত এ বিধানের মধ্যে রয়েছে–

১. মানুষের জীবনের উপর চড়াও হওয়া হারাম।
২. হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী সকল উপায়-উপকরণ নিষিদ্ধ।
৩. কিসাস (হত্যার শাস্তি) নির্ধারণ।
৪. কোন ব্যক্তি নিহত হলে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে শাস্তি কার্যকর করার জন্য তার অপরাধ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা, যাতে নিরপরাধ কোন ব্যক্তি হত্যার শাস্তি না পায়।
৫. আক্রান্ত হওয়ার কারণে জীবনের যে সকল ক্ষতি হয়ে থাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে আক্রমণকারীর বাধ্য থাকা।
৬. কিসাসের শাস্তি ক্ষমা করার বিধান।
৭. জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে জরুরি অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তু আহারের অনুমতি।

তৃতীয় বিষয় : আকল বা বিবেকের হিফাজত : আকল বা বিবেক মানুষকে দেয়া আল্লাহর একটা বিশাল নি'আমত। মূলত আকলের মাধ্যমেই মানুষকে আর সব প্রাণীর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং এর কারণেই মানুষকে তিনি শারি'আহ অনুসরণের গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আকল বা বিবেককে সকল বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার গুরুত্ব সকল যুগে সকল শারি'আহর মধ্যেই ছিল। কুরআনে আল্লাহতা'আলা বার বার বিবেক সম্পন্ন লোকদের সম্বোধন করেছেন এবং বিবেকবান লোকদেরকে তার নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

১৮৫ আল-কুরআন, ৯ : ১১১

ইসলামি শারি‘আহতে আকলকে দু'ভাবে হিফাজত করার দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে–

১. আকল বিনষ্টকারী বাহ্যিক উপকরণসমূহ থেকে একে হিফাজত রাখা। এসব উপকরণের মধ্যে রয়েছে মদ, ড্রাগ, হিরোইন, ইয়াবা, প্যাথেডিন, মরফিন ও নেশাগ্রস্তকারী অন্যান্য মাদকদ্রব্য। আল্লাহতা‘আলা বলেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

‘হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর– যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।’[১৮৬] রাসুলুল্লাহ সা. বলেন,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

‘নেশা সৃষ্টিকারী সকল বস্তুই মদ এবং সকল মদই হারাম।’[১৮৭] তিনি আরো বলেন,

وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

‘কোন ব্যক্তি ইমানদার অবস্থায় মদ পান করতে পারে না।’[১৮৮]

তিনি অন্যত্র বলেন,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

‘যা বেশি পরিমাণে পান করলে নেশাগ্রস্ত হয়, তা কম পরিমাণে পান করাও হারাম।’[১৮৯]

২. আকল বিনষ্টকারী আভ্যন্তরীণ উপকরণসমূহ থেকে একে হিফাজত রাখা। এ সকলের মধ্যে রয়েছে দীন, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা যা আকলকে বিভ্রান্ত করে এবং শারি‘আতের আলোকে সঠিক চিন্তাধারা থেকে আকলকে অকার্যকর করে রাখে। এ জন্যই আল্লাহতা‘আলা কুরআনে কাফিরদের নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। কারণ তারা কুরআনের আয়াতসমূহ ও আল্লাহর অন্যান্য নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার ব্যাপারে নিজেদের আকলকে কোন কাজে লাগায়নি। ফলে তারা সত্যপথের দিশা লাভ করেনি। আল্লাহতা‘আলা এ ব্যাপারে বলেন,

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَعْقِلُوْنَ ط إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيْلاً.

‘তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? তারা তো পশুর মতই; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট।’[১৯০]

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّأَبْصَارًا وَّأَفْئِدَةً صلى فَمَا أَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ.

‘আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল।’[১৯১]

অতএব আকলকে সত্যের পথে পৌঁছার জন্য কাজে লাগানো উচিত এবং আকল বিনষ্টকারী সকল বিষয় থেকে একে হিফাজতের ব্যবস্থা করা উচিত।

---

১৮৬ আল-কুরআন, ৫ : ৯০-৯১

১৮৭ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৪১, হাদিস নং ৫০৪৯

১৮৮ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১১৮, হাদিস নং ১০৮

১৮৯ আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস, অনুঃ ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবু দাউদ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৪), খ.৪, পৃ. ৪৯০, হাদিস নং ৩৬৪০

১৯০ আল-কুরআন, ২৫ : ৪৪

১৯১ আল-কুরআন, ৪৬ : ২৬

চতুর্থ বিষয় : বংশধারার হিফাজত : বংশধারার হিফাজত জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। এর মাধ্যমেই মানুষ বহুকাল ধরে বেঁচে আছে এবং থাকবে। এতেই নিহিত রয়েছে জাতির শক্তি, মান ও মর্যাদা। ইসলাম বংশধারা রক্ষার প্রতি সর্বাত্মক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর এ জন্য নিম্নলিখিত উপায় ও পন্থা অবলম্বন করেছে–

১. বংশবৃদ্ধির বৈধ পন্থা হিসেবে বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ।
২. জন্মদানে সক্ষম নারীকে বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

পঞ্চম বিষয় : সম্পদের হিফাজত : সম্পদ বলতে এখানে মানুষের জীবনে যে সকল বস্তু ও টাকা-পয়সার প্রয়োজন সে সকলকেই বুঝানো হয়েছে।[১৯২] সম্পদ ছাড়া মানুষের পার্থিব জীবন কোন মতেই চলতে পারে না। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও উম্মাহ– সকলেরই সম্পদের প্রয়োজন। ব্যক্তি পর্যায়ে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা যা ছাড়া একদিনও জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব নয়। জনগোষ্ঠী ও উম্মাহর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ব্যক্তির দারিদ্র্যের প্রভাব সমগ্র উম্মাহর উপর পতিত হয়। এভাবে বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র্য দেখা দিলে উম্মাহও সংকটাপন্ন হয় এবং মান-মর্যাদা হারায়। তদুপরি শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের জন্য অর্থ ও সম্পদের প্রয়োজন। আল্লাহতা‘আলা বলেন,

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج.

‘তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে– এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে।’[১৯৩]

এভাবে প্রয়োজনীয় সম্পত্তির ব্যবস্থা হলেই শুধু উম্মাহ তার শত্রুদের মুখাপেক্ষীতা কাটিয়ে উঠতে পারবে। কেননা আজকের বিশ্ব-ব্যবস্থায় এটা স্পষ্ট যে, দরিদ্র জাতি ও দরিদ্র রাষ্ট্র শত্রুদের নানামুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হয় এবং এ সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে শত্রুরা সে জাতি ও রাষ্ট্রের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যেমন চালায়, তেমনি তাদের মধ্যে নিজেদের সংস্কৃতি, মতবাদ ও ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারার প্রসার ঘটায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি জলজ্যান্ত ও বাস্তব।

সুতরাং ইসলামে সম্পত্তির হিফাজতের গুরুত্ব অত্যন্ত প্রকট। ইসলামি শারি‘আহর দৃষ্টিতে সম্পদ অর্জন ও তা সঠিকভাবে হিফাজতের জন্য নিম্নবর্ণিত উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে–

১. হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ।
২. কারো সম্পদের উপর চড়াও হওয়া হারাম ঘোষণা।
৩. সম্পদ বিনষ্ট করা কিংবা অপচয় করা হারাম ঘোষণা।
৪. সম্পদের সুরক্ষার জন্য শারি‘আহ কর্তৃক চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির শাস্তি নির্ধারণ।
৫. বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির জামানাত ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান।
৬. সম্পদ রক্ষার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বৈধতা।
৭. ঋণ প্রদানের সময় সাক্ষী রাখা ও এর লিখিত কাগজপত্র সংরক্ষন করা।
৮. কুড়ানো সম্পদ মালিকের নিকটে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।

---

১৯২ ড. মুহাম্মাদ সা’দ আল-ইয়ুবি, *মাকাসিদুশ শারি‘আহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫
১৯৩ আল-কুরআন, ৯ : ৬০

হাজিয়াত (মানব জীবনের প্রয়োজনসমূহ) : জরুরি বিষয়গুলোর মাধ্যমে মানব জীবনের সকল চাহিদা মিটে না। জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য তার প্রয়োজন আরো অনেক কিছু। এগুলো হলো হাজিয়াত। ইমাম শাতিবি রহ. এর সংজ্ঞায় বলেন, 'হাজিয়াত হলো সে সকল বিষয়, মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ আনয়নের জন্য এবং কঠোরতা, সমস্যা ও অসুবিধা দূরীভূত করার জন্য যা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলোর প্রতি যদি বিশেষ নজর দেয়া না হয় তাহলে সাধারণভাবে বান্দার উপর সমস্যা ও অসুবিধা আরোপিত হয়, তবে তা জনকল্যাণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিপর্যয় সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না।'[১৯৪]

হাজিয়াতের হিফাজতের জন্য ইসলামি শারি'আহ নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করেছে−

১. ইবাদতের ক্ষেত্রে উদ্ভুত অসুবিধাসমূহ উঠিয়ে নিয়েছে, যা সচরাচর মানুষের পক্ষে মানিয়ে নেয়া কষ্টকর। আল্লাহতা'আলা বলেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

'তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।'[১৯৫]

وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

'যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তিনি তা চান না।'[১৯৬]

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইবাদতে রুখসাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন− অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তির জন্য রমযানে সিয়াম ভঙ্গের রুখসাত ও অনুমতি রয়েছে। এছাড়াও মুসাফির ব্যক্তির জন্য সফরে কসর সালাত আদায়ের বিধান রাখা হয়েছে। এ রকম রুখসাত শারি'আতে আরো অনেক রয়েছে।

২. মানুষ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবন যাপন করতে পারে সে জন্য অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান হিসেবে নানা প্রকার অসংখ্য পবিত্র বস্তুও ব্যবহার তাদের জন্য বৈধ করে দেয়া হয়েছে।

৩. মু'আমালার ক্ষেত্রে ইজারা, বায়' সালাম, বায়' মুরাবাহা, মুশারাকা, মুদারাবা, ইসতিসনা' প্রভৃতি ব্যবসায় পদ্ধতি জায়িয করা হয়েছে।

তাহসিনিয়াত (মানব জীবনের শোভাবর্ধনকারী বিষয়সমূহ) : তাহসিনিয়াত হচ্ছে যা দরুরিয়াত ও হাজিয়াতের পর্যায়ে পড়ে না। বরং তা শোভাবর্ধনকারী সৌন্দর্যের পর্যায়ে পড়ে। এর সংজ্ঞায় ইমাম শাতিবি রহ. বলেন, 'যা উত্তম বলে বিবেচিত তা গ্রহণ করা এবং সুস্থ-সবল বিবেক ঘৃণা করে এমন সব নিকৃষ্ট জিনিস পরিহার করা।'[১৯৭] তাহসিনিয়াতের উপমা হলো−

- সুন্দর খাবার গ্রহণ ও সুন্দর পোষাক পরিধান।
- শরীর ও পোষাক থেকে নাজাসাত, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি দূর করা।
- শারি'আহর সুন্নাত ও মুস্তাহাব পর্যায়ের কাজসমূহ।
- সকল প্রকার শিষ্টাচারিতা।
- বৈধ বিলাস সামগ্রীর ব্যবহার।

---

১৯৪ আবু ইসহাক ইবরাহিম আশ-শাতিবি, *আল-মুওয়াফাকাত*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১১

১৯৫ আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

১৯৬ আল-কুরআন, ২ : ১৮৫

১৯৭ আবু ইসহাক ইবরাহিম আশ-শাতিবি, *আল-মুওয়াফাকাত*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১১

শারি'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইনি রীতিনীতি : মাকাসিদে শারি'আহর আলোকে আলিমগণ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বেশ কিছু আইনি রীতিনীতি উপস্থাপন করেছেন, যার উপর ভিত্তি করে ইসলামি আইন বিষয়ক অনেক বিধান সহজেই উদ্ভাবন করা যায়। নিচে উদাহরণস্বরূপ অল্প কিছু উপমা উপস্থাপন করা হলো–

- ইসলামি শারি'আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানা যাবে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা।[১৯৮]
- যা দ্বারা পাঁচটি জরুরি বিষয়ের হিফাজত সম্পন্ন হবে, তা মাসলাহা ও কল্যাণ বলে গণ্য হবে এবং যা দ্বারা উক্ত পাঁচটি বিষয়ের ক্ষতি সাধিত হবে তা মাফাসিদ বা অকল্যাণ বলে বিবেচিত হবে।[১৯৯]
- যখন দুটো মন্দ বা ক্ষতি পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে, এমনভাবে যে, এর যে কোন একটি মুকাবিলা করতেই হবে, তাহলে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা হলো অধিকতর ক্ষতিকে প্রতিরোধ করা।[২০০]
- শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা হচ্ছে নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে সকল কঠোরতা ও অসুবিধা বিলোপ করা।[২০১]
- নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কঠোরতা ও অসুবিধা বজায় থাকবে।[২০২]
- কোন কাজের নির্দেশ প্রদানের অর্থই হচ্ছে শারি'আহ প্রণেতা যা চান সে কাজ বাস্তবায়িত হোক এবং কোন কাজ থেকে নিষেধ করার অথই হলো শারি'আহ প্রণেতা চান সে কাজ বাস্তবায়িত না হোক।[২০৩]
- শারি'আহ প্রণেতা কোন কাজের প্রশংসা করার দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি চান সে কাজ বাস্তবায়িত হোক।[২০৪]
- সামষ্টিক কল্যাণ ব্যক্তি কল্যাণের উপর প্রাধান্য পাবে।[২০৫]
- মৌলিক কল্যাণ গৌণ ও আনুষঙ্গিক কল্যাণের উপর প্রাধান্য পাবে।[২০৬]
- কল্যাণ অর্জনের পূর্বে অকল্যাণ দূর করা শারি'আহ প্রণেতার দৃষ্টিতে অগ্রগণ্য।[২০৭]

শারি'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ইজতিহাদ : ইমাম শাতিবি রহ. এর মতে মুজতাহিদের জন্য মাকাসিদের জ্ঞান থাকা শর্ত। কেননা মাকাসিদ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে ইজতিহাদ ভুল-ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।[২০৮] আল্লামা তাহির ইবন আশুরও অত্যন্ত জোর দিয়ে

---

১৯৮ ইমাম মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-গাযালি, *আল-মুসতাসফা মিন ইলমিল উসুল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
১৯৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১
২০০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
২০১ মাক্কারি, *আল-কাওয়ায়িদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৩২
২০২ আবু ইসহাক ইবরাহিম আশ-শাতিবি, *আল-মুওয়াফাকাত*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৮৩
২০৩ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৯৩; খ.৩, পৃ. ১২২
২০৪ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৪
২০৫ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৫০
২০৬ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৪
২০৭ মাক্কারি, *আল-কাওয়ায়িদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৪৩
২০৮ আবু ইসহাক ইবরাহিম আশ-শাতিবি, *আল-মুওয়াফাকাত*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১৭৯

বলেছেন যে, ইজতিহাদের সকল ক্ষেত্রে ইলমুল মাকাসিদের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।[২০৯]

যে কোন বিষয়ে মুজতাহিদকে হুকুম দেয়ার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এতে শারি'আহর উদ্দেশ্য কি, যাতে করে একই রকম অন্যান্য বিষয়ে অনুরূপ হুকুম প্রদান করা যায়। শারি'আহর একটি অন্যতম দলিল কিয়াস বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাকাসিদের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অনেক বেশি। তাছাড়া মাসালিহ মুরসালা শারি'আহ সমর্থিত কিনা তা পুরোপুরি নির্ভর করে ইলমুল মাকাসিদের উপর।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাকাসিদে শারি'আহর প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব : বান্দার কল্যাণ সাধনে আল্লাহর যে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে মাকাসিদে শারি'আহ বলতে মূলত তাকেই বুঝানো হয়। মহান আল্লাহ সকলের সৃষ্টিকর্তা। বান্দার পার্থিব ও পারলৌকিক প্রয়োজন পূরণই ইসলামি শারি'আহ প্রণয়নের উদ্দেশ্য। তাই মাকাসিদে শারি'আহ মূলত জীবন ঘনিষ্ট উদ্দেশ্যেরই একরাশ সমষ্টি।

পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমের বাস্তবায়ন শুধু তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। যে লক্ষ্যে আল্লাহ মানব জাতির জন্য কালজয়ী ইসলামি আদর্শ প্রদান করেছেন, সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না করে শুধু কতগুলো প্রথা পালন করা তার কাছে কোন অর্থ বহন করে না। সকল নিষেধাজ্ঞার পিছনে আল্লাহর যে সব হিকমত ও উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে সেগুলো এক সূত্রে গাঁথা, সেগুলোকে কোন অসঙ্গতি নেই। কিন্তু মাকাসিদে শারি'আহ না জানার কারণে আজ মুসলিমদের প্রাত্যহিক কর্মে দেখা দিয়েছে বৈসাদৃশ্য। অনেক সময় দেখা যায়, যে মুসলিম প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে আল্লাহর আনুগত্যের ঘোষণা দেয়, সে আবার তার অর্থনৈতিক লেনদেনে কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শে এই আল্লাহরই অবাধ্যতা করতে দ্বিধা করে না। ইসলামি শারি'আহর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে সমগ্র মানবতাকে রক্ষা করা। গভীরভাবে মাকাসিদ উপলব্ধি না করার কারণেই আজ মুসলিমের অনেকে ইসলামকে আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম হিসেবে মনে করছে। ফলশ্রুতিতে তারা ইমান হারা হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অন্যদিকে যেহেতু এ বিষয়টি সকল দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ইসলাম শিক্ষার অপরিহার্য পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়নি; ফলে এ সম্পর্কিত ব্যাপক অজ্ঞতা বিরাজ করছে অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষকদের মধ্যেও। বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে যে সকল ফাতওয়া দেয়া হয় কিংবা চাঁদ দেখাসহ আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে যে বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় তা মাকাসিদের জ্ঞান তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শারি'আহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন। এ জন্যই পূর্ববর্তী ইমাম ও পণ্ডিতগণকে দেখা যায় যে, তারা পরস্পর অনেক মতানৈক্য করেছেন; কিন্তু মাকাসিদের আলোকে তাদের মধ্যে কোন বিভেদ ছিল না। তাদের মধ্যে গবেষণা ছিল একটা অব্যাহত প্রক্রিয়া, নিজেদের কোন ভুল প্রমাণিত হলেই তারা সঠিক সিদ্ধান্তের প্রতি ফিরে আসতেন। যারা আজ দীনের দা'ই হিসেবে কাজ করছেন, ইসলামি জ্ঞান বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন তাদের জন্য এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অনেক বেশি।

ইসলামি শারি'আহর উজ্জ্বলতম দিক হলো ইজতিহাদের অনুমোদন, যার দ্বার কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত। শারি'আহকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে

---

২০৯ ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইয়ুবি, *মাকাসিদুশ শারি'আহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬

শারি'আহ-এর সকল বিধানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের প্রয়োজন পড়ে না। শারি'আহর যে সকল বিধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট যেমন– তাওহিদ, রিসালাতের ধারণা ও এগুলোর প্রতি ইমান পোষণ করার ফরযিয়াত, যা কুরআন ও হাদিসে বহুবার আলোচিত হয়েছে, সেখানে ইজতিহাদ করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে শারি'আহর যে সকল বিষয় অপরিবর্তনীয় সেগুলোকেও ইজতিহাদ ও গবেষণা করে পরিবর্তন করা যায় না। যেমন– তাওহিদের সকল বিষয়, শিরক, কুফরসহ ইমানের রুকনসমূহ, মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়গুলো ও চিরতরে হারাম ঘোষিত মন্দকাজসমূহ। অতএব তাওহিদের যে চিরন্তন ধারণা কুরআন ও সুন্নাহতে এসেছে, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করা যাবে না। যে কাজ করা রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগে শিরক ও কুফর বলে বিবেচিত হতো তা আজো শিরক ও কুফর বলে গণ্য হবে। যিনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি-ডাকাতি, সুদ-ঘুষ, মানবহত্যা ইত্যাদি যা আগে হারাম ছিল, তা আজো হারাম বলে পরিগণিত হবে। সুন্দর গুণাবলী, সততা, সত্যবাদিতা আগে যেমন প্রশংসিত ছিল আজো তা তেমনি প্রশংসিত থাকবে, অন্যদিকে মিথ্যা, ধোকা, প্রতারণা ইত্যাদি সব যুগেই ঘৃণ্য ও হারাম।

তবে শারি'আহর এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার বিধান স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। এ কারণেই শারি'আতে বিভিন্ন রুখসত দেয়া হয়েছে। তাছাড়া দরুরিয়াতের কারণে শারি'আহ ইতোপূর্বেকার নিষিদ্ধ বিধানকে সাময়িক অনুমোদন প্রদান করে। এসব মূলনীতির দলিল কুরআনে রয়েছে। এছাড়া সার্বিক মূল্যবোধ ও আকিদা ঠিক রেখে মু'আমালাতের বিষয়গুলো আঞ্জাম দেয়ার বিষয়টাও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। এগুলোর বাস্তবায়ন কিভাবে হবে সেটা হচ্ছে ইজতিহাদের অন্যতম একটা বিষয়। তবে যে কেউ ইচ্ছে করলেই নিজের মত করে ইজতিহাদ করে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করাকে ইসলাম সমর্থন করে না। মুজতাহিদ ব্যক্তিকে কুরআন, হাদিস ও আরবি ভাষায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি তাকওয়াসহ আরও বেশ কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে। উসুলে ফিকহের গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। মোটকথা হলো, শারি'আহর অপরিবর্তনীয় বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সহিহ ও বিশুদ্ধ পন্থায় ইজতিহাদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধনের প্রতি আল-কুরআন মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করছে। আল্লাহতা'আলা বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

'এবং আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।'[২১০]

কিয়াস, ইসতিহসান, ইসতিসলাহ বা মাসালিহ মুরসালা, ইসতিদলাল, শারউ মান কাবলানা বা পূর্ববর্তী শারি'আত, ইসতিসহাব, আমালু আহলিল মদিনা, উরফ ও রেওয়াজ, স্বীকৃত ব্যক্তিত্বের অভিমত, কাওলুস সাহাবি ও দেশজ আইনও শারি'আহর এ জাতীয় দলিল ও উৎসসমূহ ইজতিহাদি প্রক্রিয়ারই অংশবিশেষ। ইসলামি শারি'আহ যে প্রগতিশীল এবং সকল যুগের জন্য উপযোগী ইজতিহাদ মূলতঃ সে প্রমাণকে আরও শক্তিশালী করেছে।

২১০. আল-কুরআন, ১৩ : ১১

ইসলামি শারি‘আহ এবং উন্নয়ন ও আধুনিকতা

সৎ ও ন্যায়ভিত্তিক মূল্যবোধের আলোকে যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে ইসলামি শারি‘আহ সদা উদ্বুদ্ধ করে। আল-কুরআনে আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়ার উন্নতি চেয়ে দু‘আ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহতা‘আলা বলেন,

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ. أُوْلٰئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

‘আর তাহাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোজখের শাস্তি হতে রক্ষা কর– তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।’[২১১]

শারি‘আহর দৃষ্টিতে উন্নয়ন বলতে বুঝায় সে সকল উন্নয়নকে যার দ্বারা ব্যক্তি দুনিয়াতে উপকৃত হয়, ভাল ও সৎ মানুষে পরিণত হয়, দেশ, সমাজ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে এবং আখিরাতে নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করে আর প্রয়োজনীয় আমলে সালিহ করে জান্নাত লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। অতএব শুধুমাত্র বৈষয়িক উন্নতিই ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র উন্নয়ন নয়।

লক্ষ্য করা গেছে যে, ইসলামি শারি‘আহর বিধানগুলো আল্লাহতা‘আলা মানবজাতির জন্য এমনভাবে প্রণয়ন করেছে যার মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, চারিত্রিক উন্নয়ন এবং যাবতীয় বৈষয়িক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

ইবাদত পালনের নির্দেশ মূলতঃ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধন করে। মদ পান, যিনা-ব্যভিচার, জুয়া, মিথ্যা বলা, অন্যায় ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ তাকে চারিত্রিক উন্নয়ন দান করে। সুদ পরিহারের নির্দেশ, যাকাত-সদকা প্রদানের আদেশ এবং নানাবিধ ব্যবসায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেগবান করে। অতএব ইসলামি শারি‘আহ প্রচলিত অন্য সকল মতবাদ থেকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, যা গতিশীল, তা-ই সকল যুগের সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে এবং যা যুগোপযোগী তা-ই আধুনিক। অতএব ইসলামি শারি‘আহও চির আধুনিক। ইসলামি শারি‘আহ আধুনিক সমাজের সর্বস্তরের লোকদের ন্যায্য অধিকার যেমন সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে, তেমনি মৌলিক মূল্যবোধ ঠিক রেখে যুগের চাহিদা ও দাবির সাথেও সামঞ্জস্য বিধান করেছে। যে কোন নতুন কিছু যদি ভাল ও মানুষের জন্য কল্যাণকর হয়, শারি‘আহ তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। আধুনিকতা বলতে যদি ইমান ও মূল্যবোধ ঠিক রেখে যুগোপযোগিতা বুঝায়, যদি অন্যায়-অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা আধুনিকতার সংজ্ঞার আওতায় না পড়ে, তাহলে বলতে হবে ইসলামি শারি‘আহ চির-আধুনিক।

অতি সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী মহল এবং তাদের তল্পীবাহক কিছু বুদ্ধিজীবি মুসলিমদেরকে সংশয়ান্বিত করার জন্য ইসলামি শারি‘আহ ও কুরআনের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আবিষ্কার করেছেন এবং এ ব্যাপারে তারা পত্র-পত্রিকায় ও ইন্টারনেটে লেখালেখি করছেন। তাদের যুক্তিগুলো খুবই অপরিপক্ক। এগুলোকে যুক্তি না বলে সংশয় বলাই সমুচিত। কেউ যাতে

---

২১১. আল-কুরআন, ২ : ২০১-২০২

সংশয় দ্বারা প্রভাবান্বিত না হন সেজন্য প্রধান কয়েকটি উল্লেখ করে সেগুলোর সন্তোষজনক জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হলো–

১. সেখানে বলা হয়েছে, 'রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে শারি'আহ আইন বলে কিছু ছিল না। কেননা শারি'আহ আইন প্রবর্তন করেছেন ফকিহগণ।' এর জবাব হলো– রসুলুল্লাহ সা. এর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে। সেখানে আল্লাহতা'আলা 'শারি'আহ' অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত আয়াতের নির্দেশ রাসুল সা. ও তাঁর সাহাবাগণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অতএব 'ফকিহগণ শারি'আহ প্রবর্তন করেছেন'– কথাটা মোটেই সঠিক নয়। কেননা আয়াতটাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে– শারি'আহ আইন প্রবর্তন করেছেন স্বয়ং আল্লাহতা'আলা।

২. তারা দাবি করেছেন যে, 'শারি'আহ আইনের অনেক কিছু জাল হাদিসের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।' এর জবাবে বলা যায় যে, জাল হাদিস সর্বযুগে সকল আলিম, মুহাদ্দিস ও এমন কি সাধারণ মুসলিমদের কাছেও সর্বাঙ্গীনভাবে পরিত্যাজ্য। তাছাড়া শারি'আহ আইন যদি জাল হাদিস রচনার যুগে প্রণীত হতো তাহলে এমন অবান্তর প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া অসম্ভব ছিল না। পূর্বেও বলা হয়েছে শারি'আহ প্রণীত হয়েছে রাসুল সা. এর যুগে এবং এর প্রণেতা স্বয়ং আল্লাহতা'আলা।

৩. তারা আরও বলেছেন, 'ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস অপরিবর্তনীয়, যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু দেখা যায় শারি'আহ আইনের অনেক বিধান কখনো কখনো পাল্টে যায়।' এর জবাব হলো– শারি'আহ ও ইসলামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামি শারি'আহ-এর অনেক বিধান অপরিবর্তনীয় এবং কিছু বিধান স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। অতএব এ যুক্তি দাঁড় করিয়ে কুরআন, শারি'আহ ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা বড় ধরনের ভুল সিদ্ধান্ত।

৪. তাদের আরেকটা সংশয় হলো, 'শারি'আহ-এর বিধান ইজমা, কিয়াস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উৎস দ্বারাও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। ফলে সে সব বিধানকে কুরআনের বিধান বলা যাবে না।' এর জবাবে বলা যায় যে, ইজমা, কিয়াস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উৎস স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন দলিল নয়। বরং কুরআনই এগুলোকে দলিল হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে। অতএব ইজমা ও কিয়াস দ্বারা সাব্যস্তকৃত বিধান কুরআনেরই বিধান বলেই পরিগণিত হবে।

মূলত, শারি'আহ আইন হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে প্রণীত ইসলামেরই আইন। আর ইসলাম হচ্ছে আল্লাহতা'আলার মনোনীত দীন, যার বিভিন্ন বিধান রাসুলুল্লাহ সা. এর উপর বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। সে সকল বিধানের আইনি দিকটিই হলো শারি'আহ। আর তার সম্মিলিত রূপ হলো আল-কুরআন। অতএব শারি'আহ আইন হচ্ছে কুরআনেরই আইন। অন্য কথায় বলা যায়, শারি'আহ আইনের অন্যতম প্রধান উৎস হলো আল-কুরআন। এছাড়া সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসও শারি'আহ আইনের অন্যতম উৎস। সৃষ্টির ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণই ইসলামি শারি'আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শারি‘আহ আইন-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

শারি‘আহ আইনের অপর না ইসলামি ফিকহ। ‘প্রত্যেক জিনিসেরই একটা স্তম্ভ রয়েছে। দীন ইসলামের স্তম্ভ হলো ইসলামি ফিকহ। ইসলাম মানুষকে তার জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বুদ্ধিবৃত্তিক একটা আকিদা প্রদান করে যা তাদের সকল চিন্তা, আচরণ ও কর্মকাণ্ডের মূলভিত্তি। এরূপ কোন ভিত্তি এমন একটা সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব দাবি করে যার প্রতিটা অংশ হবে মূল আকিদার অনুগামী ও তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব, ইসলামি জ্ঞানের এমন একটা শাখার আবির্ভাব অনিবার্য ছিল যা ব্যবহারিক জীবনের এ চাহিদাকে সম্পূর্ণ করবে। ‘শারি‘আহ আইন’ হচ্ছে ইসলামি জ্ঞানের সেই বিশেষ শাখা।

প্রখ্যাত অভিধান বিশারদ আল্লামা আবুল ফদল জামালুদ্দিন মুহাম্মদ আল মিসরি রহ. বলেন,

العلم بالشيء والفهمُ له.

‘ফিকহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– কোন কিছু সম্বন্ধে জানা ও বুঝা।’[২১২]

‘ফিকহ’ শব্দটা আল-কুরআনে বিশ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

‘তাদের (মুমিনদের) প্রত্যেক’ দল থেকে একটা অংশ কেন বহির্গত হয় না যাতে তারা দীন সম্বন্ধে ফিকহ হাসিল করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে– যাতে তারা সতর্ক হয়।’[২১৩]

হাদিসেও এ শব্দটার বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন–

مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين.

‘আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দীনের জ্ঞান (তাফাক্কুহ ফিদ দীন) দান করেন।’[২১৪]

হাদিসে আরও আছে–

فَقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

‘একজন ফকিহ শয়তানের জন্য হাজার মূর্খ আবিদ অপেক্ষা ভয়ংকর।’[২১৫]

অতএব, আভিধানিক অর্থে ‘ফিকহ’ বলতে যে কোন বিষয়ের গভীর জ্ঞানকে বুঝালেও কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ও বিভিন্ন হাদিসে ‘ফিকহ’ বলতে সুনির্দিষ্টভাবে দীনের গভীর জ্ঞানকেই বুঝানো হয়েছে। প্রথম যুগে ফিকহ বলতে তাই ইসলামি জ্ঞানের বিশেষ কোন শাখাকে বুঝানো হতো না, বরং সামগ্রিকভাবে গোটা দীন সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানকে বুঝানো হতো। কিন্তু পরবর্তীতে দীনের প্রতিটা শাখা স্বতন্ত্রভাবে বিস্তৃত ও বিকশিত হতে থাকলে ফিকহ শব্দটা কুরআন-সুন্নাহ থেকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের হুকুম আহরণের যে বিজ্ঞান কেবল তার জন্যই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়।

---

২১২ আবুল ফদল জামালউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৪৩

২১৩. আল-কুরআন, ৯ : ১২২

২১৪ ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫৮, হাদিস নং ৭১

২১৫ ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী, অনূঃ মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসঊদ, *তিরমিযী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৪), খ.৫, পৃ. ১২৯, হাদিস নং ২৬৮১

অতএব, ইসলামি শরি‘আহর পরিভাষায় ফিকহ হচ্ছে ইসলামি জ্ঞানের সেই বিশেষ শাখা যা শরি‘আহর প্রামাণ্য উৎস থেকে শারি‘আহর শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত বিধি-বিধান আহরণ বা ইস্তিম্বাত করে। তাই ইমাম শাফিই রহ. ফিকহের সংজ্ঞায় বলেন,

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

‘শারি‘আহর বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে ব্যবহারিক শারি‘আহর বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ বলা হয়।’[২১৬]

সংক্ষেপে বলা যায় ফিকহ হচ্ছে ইসলামি আইন-কানুন এবং এ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। আর এ ইলমে ফিকহের উদ্দেশ্য যা তা হলো দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সাফল্য অর্জন। এ অর্থেই ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন,

معرفة النفس مالها وما عليها.

‘নফস ও আত্মার জন্য যে সব বিষয় কল্যাণকর এবং যে সব বিষয় কল্যাণকর নয় তা সহ নফস সম্বন্ধে অবহিত হওয়াকে ফিকাহ বলা হয়।’[২১৭]

এখানে জ্ঞানীগণ নফসের অনুকূলে ও প্রতিকূলের অর্থ করেছেন– ‘যার সাহায্যে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ অর্জন করে আর যার কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

শীর্ষস্থানীয় ইমামদের মতে শারি‘আহ আইনের আলোচ্য বিষয়গুলোকে নিম্নোক্ত বিভাগগুলোর আওতায় বিবেচনা করা যায়–

ইবাদত : যা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের নিয়ম-কানুন বলে দেয়। যেমন– সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি।

মু‘আমালাত : সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধান। যেমন– কেনাবেচা, ঋণ, ভাড়া, আমানত, জামানত ইত্যাদি।

মুনাকাহাত : মানবের বংশ রক্ষা সংক্রান্ত বিধি-বিধান। যেমন– বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

উকুবাত : বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংক্রান্ত বিধি-বিধান। যেমন– চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা, অপবাদ ইত্যাদির শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ড ও রক্তপণ ইত্যাদি।

মুখাসামাত : আদালাত বিষয়ক বিধি-বিধান। যেমন– অভিযোগ, বিচার বিধি, স্বাক্ষ্য-প্রমাণ ইত্যাদি।

হুকুমাত ও খিলাফত : শাসক নির্বাচন, বিদ্রোহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জিহাদ, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি, কর আরোপ ইত্যাদি।[২১৮]

শারি‘আহ আইন-এর উৎপত্তি

যেহেতু ইসলামি শারি‘আহ এর মূল উৎস হচ্ছে মানুষের প্রতি শারি‘আহ প্রণেতা আল্লাহতা‘আলার আদেশ-নিষেধ সম্বলিত বাণী। অতএব তাত্ত্বিকভাবে বলা যায় যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির পর রাসুলুল্লাহ

---

২১৬ ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৬
২১৭ সম্পাদনা পরিষদ, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
২১৮ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৫

সা. এর মাক্কি জীবন থেকেই ইসলামি শারি‘আহর যাত্রা শুরু। কিন্তু বস্তুত মাক্কি জীবনে পবিত্র কুরআনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নাযিল হলেও তার খুব সামান্য অংশই ছিল বিধি-বিধান সম্বলিত এবং প্রায় সবটুকুই ছিলো দীনের মৌলিক বিষয় বা আকিদা অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম, দীনের প্রচার, সৎ গুণাবলীর বিকাশ, সামাজিক কুপ্রথাগুলোর নিন্দা ইত্যাদি বিষয়ে। আহকাম সম্পর্কিত প্রায় সকল আয়াতই তাঁর মদিনায় হিজরত করার পর থেকে নাযিল হতে থাকে এবং মাদানি জীবনের দশ বছর ব্যাপী তা অব্যাহত থাকে। অতএব, এ বিষয়ে এটা বলাই অধিকতর যথার্থ হবে যে, ইসলামি শারি‘আহর উৎপত্তি হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সা. এর মাদানি জীবনের শুরু থেকে অর্থাৎ প্রথম হিজরি সন থেকে।

শারি‘আহ আইন-এর ক্রমবিকাশ

এটা একটা বিস্তৃত বিষয় এবং এখানে কেবল এর সংক্ষিপ্ত কিছু ধারণা উপস্থাপন করা হলো। ইসলামি শারি‘আহর উৎপত্তিকাল থেকে শুরু করে এর ক্রমবিকাশকে প্রধানত তিনটি পর্যায় বা যুগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগে শারি‘আহ আইন;
২. সাহাবিগণের যুগে শারি‘আহ আইন;
৩. তাবিয়ি-তাবিইন যুগে শারি‘আহ আইন।

এক. রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগে শারি‘আহ আইন : মহান আল্লাহতা‘আলা বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

‘আল্লাহ মু’মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করিয়াছেন, যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাহাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়।’[২১৯]

এ যুগের সময়কাল হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সা. এর মদিনায় হিজরত তথা প্রথম হিজরি সাল থেকে তাঁর ওফাতের সময় অর্থাৎ দশম হিজরি সাল পর্যন্ত। এ যুগে শারি‘আহর যাবতীয় বিষয়ই রাসুল সা. এর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তাঁর উপর ছিল নাযিলকৃত প্রত্যক্ষ অহি আল-কুরআন আর পরোক্ষ অহি যা হাদিসরূপে পরবর্তীকালে প্রচারিত হয়েছে। যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন, উদ্ভুত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ফাতওয়া, ফারাইয, দীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কুরআনের হুকুম-আহকামের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই অহির মাধ্যমে তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন, সাহাবিগণকে শিক্ষা দিতেন এবং বাস্তবে সমাজে প্রয়োগ করে দেখাতেন। সে সময় স্বতন্ত্র ফিকহ শাস্ত্র প্রণয়নের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। তথাপি, পরবর্তী যুগের ফিকহ শাস্ত্রের সব মৌলিক বিষয়ের গোড়াপত্তন এ যুগেই হয়েছিল। এমনকি, ফিকহের গতিশীলতার প্রধান উপকরণ যে ‘ইজতিহাদ’ ও ‘কিয়াস’ তার শিক্ষাও এ যুগেই হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক সহিহ হাদিস বিদ্যমান রয়েছে।[২২০]

---

২১৯. আল-কুরআন, ৩ : ১৬৪
২২০ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

রাসুলুল্লাহ সা. মুআজ ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়ামেনের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে মুআজ! তুমি কীসের ভিত্তিতে বিচার-ফয়সালা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী। রাসুল সা. বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে তা না পাও, তাহলে? তিনি বললেন, তাহলে রাসুলুল্লাহ সা. এর সুন্নাহ অনুযায়ী। রাসুল সা. বললেন, যদি রাসুলের সুন্নাতে তা না পাও তাহলে? তিনি বললেন, তখন আমি ইজতিহাদ করে রায় দিব। তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর রাসুলের প্রতিনিধিকে এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন যাতে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল সন্তুষ্ট।'[২২১] এটা ইজতিহাদের বৈধতা প্রমাণে ব্যাপক ব্যবহৃত একটা হাদিস। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, মুআজ রা. ও আবু মুসা আশআরি রা. কে ইয়ামেনে কাযি হিসেবে প্রেরণ করার সময় অনুরূপ প্রশ্নের জবাবে তারা বলেছিলেন, সুন্নাতে কোন নির্দেশনা না পেলে আমরা উদ্ভুত বিষয়টা একটা বিদ্যমান সাদৃশ্য বিষয়ের উপর কিয়াস করব এবং যা সত্যের নিকটবর্তী তার উপর আমল করব।' রাসুলুল্লাহ সা. তাদের জবাব সঠিক হয়েছে বলে মেনে নিয়েছিলেন।

সাহাবা রা. কে রাসুল সা. কিয়াসের মাধ্যমে ইজতিহাদের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। যেমন– উমরা রা. যখন রাসুলুল্লাহ সা. কে স্ত্রীকে চুম্বনের কারণে রোজা ভঙ্গ হবে কিনা তা জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি বললেন, তুমি যদি কুলি কর তাতে কি রোজা ভঙ্গ হবে?[২২২] এখানে রাসুলুল্লাহ সা. উমর রা. কে কিয়াস বা সাদৃশ্যমূলক তুলনার মাধ্যমে রোজাদারের চুম্বন ও কুলি করার মিল বুঝালেন এবং দেখালেন যে ওটার মতো এটাও রোজা ভঙ্গ করবে না।

এর পাশাপাশি তিনি সাহাবাগণকেও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এবং ইজতিহাদের জ্ঞান প্রয়োগ করার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এটা কখনো ঘটেছে তাঁর প্রত্যক্ষ শিক্ষার মাধ্যমে আবার কখনো ঘটেছে সাহাবিদের অনুরূপ কোন কাজ শোনার পর তা অনুমোদন ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে। সাহাবাগণ কখনও এমন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন যে বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর হুকুম তাদের জানা নেই তাহলে তা রাসুলুল্লাহ সা. এর আমলের আলোকে সমাধানের জন্য পেশ করতেন। রাসুলুল্লাহ সা. এর জীবদ্দশায় তাঁর কাছ থেকে জেনে নেয়ার সুযোগ আছে এমন কোন ক্ষেত্রে তারা কখনই ইজতিহাদের দারস্থ হননি; বরং স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সা.-ই ছিলেন সমাধান। সাহাবাগণ তাঁর জীবদ্দশায় এমন কোন পরিস্থিতিতেই কেবল ইজতিহাদ করেছেন যখন বিধান জানার প্রয়োজন তাৎক্ষণিক ছিলো এবং দূরত্ব বা অন্য কোন কারণে রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে তা উপস্থাপন করার কোন সুযোগ ছিলনা। এরূপ ক্ষেত্রে তারা পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ সা.-এর সামনে এর সঠিক জ্ঞানের জন্য তা উপস্থাপন করতেন। এ বিষয়ে অনেক প্রসিদ্ধ ও সহিহ হাদিস বিদ্যমান। যেমন– রাসুলুল্লাহ সা. খন্দকের যুদ্ধের দিন সাহাবিদের একটা দলকে বলেছিলেন, বনি কুরাইজার মহল্লায় না পৌঁছে কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। পথে আসরের ওয়াক্ত হলে একদল হাদিসের শাব্দিক নির্দেশ অনুযায়ী বলেছিলেন যে, তারা সেখানে পৌঁছার পূর্বে সালাত আদায় করবে না। আর অন্যদল বলেছিলেন, রাসুলুল্লাহ সা. এর

---

২২১. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, *সুনানু আবু দাউদ*(আম্মান : বাইতুল আফকার আদ-দুওয়ালিয়্যাহ, ১৯৯৫), পৃ. ৩৯৭, হাদিস নং ৩৫৯২

২২২. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, *সুনানু আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১, হাদিস নং ২৩৮৫

ইচ্ছা এটা নয় অর্থাৎ উক্ত আদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাড়াতাড়ি ঐ গোত্রে পৌঁছা, সালাত আদায় না করা নয়। অতএব পথে সালাত আদায় করাই শ্রেয়। এ প্রেক্ষাপটে রাসুলুল্লাহ সা. এর কাছে উভয় দলের ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি দুটোকেই অনুমোদন করেন।[২২৩]

অনুরূপভাবে, হাদিসে বর্ণিত আছে যে, দুজন সাহাবি সফররত অবস্থায় সালাতের সময় হলে তারা পানির অভাবে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করেন। অতঃপর সালাতের ওয়াক্ত থাকতেই পানির সন্ধান পাওয়ার পর একজন অযু করে পুনরায় সালাত আদায় করেন, আর দ্বিতীয়জন পুনরায় অযু, সালাত কোনটাই আদায় করেননি। সফর শেষে তারা রাসুল সা. এর কাছে এ ঘটনার বিবরণ জানালে, তিনি দ্বিতীয়বার যিনি অযু-সালাত আদায় করেননি তাকে বললেন, 'তুমি সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করেছ, আর তোমার প্রথমবার আদায়কৃত সালাত তোমার জন্য যথেষ্ট।' আর দ্বিতীয়জনকে বললেন, 'তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।'[২২৪] আর এ মর্মে রাসুল সা. আরও বলেন, যখন মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তখন সে দুটো সাওয়াব পায়, আর তার সিদ্ধান্ত ভুল হলে সে অন্তত একটা সাওয়াব পায়।'[২২৫]

এ সকল হাদিস ও ঘটনার বিবরণ রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগে উদ্ভূত ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানে কুরআন-সুন্নাহ ও এর ভিত্তিতে ইজতিহাদের প্রয়োগের ব্যাপারে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবিগণের কর্মপন্থাই সুস্পষ্ট দলিল।

রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগে যে সকল সাহাবি ফাতওয়া প্রদানে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আবুবকর, উমর, উসমান, আলি, আয়িশা সিদ্দিকা, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস এবং যায়িদ ইবন সাবিত রা. ছিলেন অন্যতম। রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগ তথা ইসলামি শারি'আহর উৎপত্তি যুগের কর্মপন্থার উপর ভিত্তি করেই শুরু হয় শারি'আহ আইনের দ্বিতীয় যুগ।

দুই. সাহাবিগণের যুগে শারি'আহ আইন : রাসুলুল্লাহ সা. এর ওফাত পরবর্তী সময় অর্থাৎ দশম হিজরি থেকে শারি'আহ আইনের সাহাবা যুগের সূচনা। এর ব্যপ্তি ৯০ বা ১০০ হিজরি সাল পর্যন্ত গণ্য করা যায়; কারণ এ সময়ের পর কোন অঞ্চলে আর কোন সাহাবি জীবিত ছিলেন না। কুফার সর্বশেষ সাহাবি ইন্তিকাল করেন ৮৬/৮৭ হিজরিতে, মদিনার সর্বশেষ সাহাবি সাহল ইবন সাদ রা. ৯১ হিজরিতে, বসরার শেষ সাহাবি আনাস ইবন মালিক রা. ৯৩ হিজরিতে ও দামিশকের শেষ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. ৮৮ হিজরিতে মারা যান। ১০০ হিজরিতে সর্বশেষ সাহাবি আমির ইবন ওয়াসিলাহ ইবন আবদুল্লাহ ইন্তিকাল করার মধ্য দিয়ে সাহাবা যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সাধারণভাবে এ সুদীর্ঘ সময়ের পুরোটাই সাহাবা যুগ নাম দিলেও এর মধ্যে প্রধান দুটো ভাগ রয়েছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে পরস্পর থেকে পৃথক। এ যুগ বিভাগ দুটো হচ্ছে–

(১) খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগ যার সময় কাল ৪০ হিজরি পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

(২) খুলাফায়ে রাশিদিন পরবর্তী সাহাবাদের যুগ ও তৎপরবর্তী তাদেরই সমান্তরাল শিক্ষাপ্রাপ্ত তাবিয়িদের যুগ। যার সময় কাল ৪০ হিজরি থেকে ১০০ হিজরি পর্যন্ত।

---

২২৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫০, হাদিস নং ৩৮১৯

২২৪. ইমাম আবূ দাউদ, *আবূ দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৮৬, হাদিস নং ৩৩৮

২২৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৫১৮, হাদিস নং ৬৮৫০

(১) খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে শারি'আহ আইন : রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'তোমরা আমার পরে খুলাফায়ে রাশিদিনের অনুসরণ করবে।'

রাসুলুল্লাহ সা. এর ওফাতের পর খুলাফায়ে রাশিদিনের সোনালি যুগে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল জয়ের মাধ্যমে ইসলাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লে নতুন নতুন বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ক্রমেই প্রসারমান সেই নতুন সভ্যতার চাহিদা পূরণে এবং বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নবাগত সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য কুরআন-সুন্নাহর উপর গভীর গবেষণা করার প্রয়োজন তীব্রতর হয়ে উঠে। আর সে প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতেই শারি'আহ আইন আরো বিকশিত হতে থাকে।

এ যুগেই শারি'আহ আইনের তৃতীয় উৎস তথা ইজমাউস সাহাবার অস্তিত্ব লাভ করে। ইজমাকে এ যুগে সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। এজন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ও নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণের একটা বোর্ড গঠিত হয় আর তাদেরকে যথাসম্ভব খিলাফাতের কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে করে উদ্ভুত কোন নতুন বিষয়ের মীমাংসা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহতে পাওয়া না গেলে তাদের পারস্পরিক পরামর্শ ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে এর ফয়সালা বের করা যায়। উল্লেখ্য যে, সাহাবাগণ নিজ থেকে কোন ধারণা বা পছন্দ-অপছন্দের আলোকে এসব মত দিতেন না; বরং কুরআন-সুন্নাহর উপর তাদের সুগভীর জ্ঞান ও রাসুলুল্লাহ সা. এর সাহচার্যের প্রভাবে কুরআন-সুন্নাহ থেকে যে কোন বিষয়ে হুকুম আহরণে তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা ব্যবহারের মাধ্যমেই তারা সম্মিলিত চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে এরূপ কোন ঐক্যমতে তথা ইজমায় পৌঁছাতেন।[২২৬]

ইজমাউস সাহাবা নামক শারি'আহ আইনের তৃতীয় মূল উৎস রূপলাভ করা ছাড়াও এ যুগে বিশাল খিলাফতের নানা সমস্যা সমাধানে কুরআন-সুন্নাহ থেকে ক্রমাগত অধিক থেকে অধিকতর বিধান আহরণের ফলে প্রথম দুটো উৎস– কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিধান আহরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান আরও বিকশিত হয় এবং পরবর্তী যুগের শারি'আহ আইনের জন্য এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রস্তুত হয়। পাশাপাশি যে সকল বিষয়ের সমাধান সরাসরি কুরআন-সুন্নাহতে পাওয়া যেত না এবং যার সমাধানে সাহাবাদের সম্মিলিত কোন সিদ্ধান্তও ছিল না, এরূপ অনেক ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবাগণ কিয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। এভাবে এ যুগে কিয়াসের ব্যবহার আরও ব্যাপকতা লাভ করে।

হযরত আবুবকর রা. এর যুগে শারি'আহ আইন : কোন বিষয়ে শারি'আহ আইনের বিধান আহরণে হযরত আবুবকর রা. যে পদ্ধতি অনুসরণ করতেন তা মাইমুন ইবন মাহরান এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আবুবকর রা. এর খিলাফাতকালে কোন সমস্যা উপস্থিত হলে তিনি কুরআন খুলে দেখতেন। যদি তাতে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানের জন্য কিছু পেতেন তবে তার ভিত্তিতে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান করতেন। যদি কুরআনে এ ব্যাপারে কোন সমাধান না পেতেন তাহলে তিনি রাসুলুল্লাহ সা. এর সুন্নাহ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মীমাংসা করতেন। যদি সুন্নাহতেও উল্লিখিত বিষয়ে কিছু না পেতেন তবে তিনি মুসলিমদের নিকট গিয়ে বলতেন, অমুক অমুক বিষয় আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। তোমাদের কারো এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সা. এর কোন ফয়সালার

২২৬ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

কথা জানা আছে কি-না। ঐ বিষয়ে যদি কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিত এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহে সক্ষম হত তখন আবুবকর রা. বলতেন, 'আল্লাহতা'আলার জন্য যাবতীয় প্রশংসা যে, তিনি আমাদের মধ্যকার কোন কোন ব্যক্তিকে রাসুল সা. এর নিকট থেকে তার শ্রুত বিষয় স্মরণ রাখার সামর্থ দিয়েছেন।

যদি তিনি রাসুল সা.-এর এরূপ কোন সুন্নাহও না পেতেন তাহলে নেতৃস্থানীয় ও উত্তম লোকদের সাথে পরামর্শ করতেন। তারা ঐকমত্যে পৌঁছালে তার ভিত্তিতে তিনি রায় দিতেন। এভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে সমাধান না পেলে তার ব্যক্তিগত বিচক্ষণতার সাহায্যে 'নাস' ব্যাখ্যা করে অথবা তার মর্মার্থ থেকে অথবা শুধু ইজতিহাদের ভিত্তিতে তার নিজস্ব মত গঠন করতেন।'[২২৭]

এর উপমা এ রকম যে, হযরত আবুবকর রা. এর সামনে যখন দাদির মিরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন যে, এ বিষয়ে কুরআনে কোন নির্দেশ নেই এবং এ বিষয়ক কোন হাদিসও তার জানা নেই, তাই এ বিষয়ে অন্যদের জিজ্ঞাসা করতে হবে। অতপর যুহরের সালাতের পর তিনি সমবেত লোকদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে মুগিরা ইবন শু'বা রা. ও মুহাম্মদ ইবন মাসলামা রা. দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে এ বিষয়ে তাদের হাদিস জানা আছে এবং তাহলো রাসুলুল্লাহ সা. দাদিকে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। অতঃপর আবুবকর রা. সে অনুযায়ীই ফয়সালা দিলেন।

এ বর্ণনা থেকে শারি'আহ আইনের ব্যাপারে আবুবকর রা. এর কর্মপন্থা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ যে কোন সমস্যা সমাধান তিনি প্রথমে কুরআন, তারপর সুন্নাহ, অতঃপর ইজমাউস সাহাবা এবং পরিশেষে কিয়াসের সাহায্য নিতেন। এ কর্মপন্থাই পরবর্তী কালের জন্য দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়ে যায়।[২২৮]

আবুবকর রা. কর্তৃক কৃত ইজতিহাদ : 'কালালাহ' শব্দের অর্থ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'কালালাহ সম্পর্কে আমি যা বললাম তা আমার নিজের রায়ের ভিত্তিতে। আমার মতামত যদি সঠিক হয় তবে তা আল্লাহর কাছ থেকে, আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার নিজের ও শয়তানের কাছ থেকে। সে ব্যক্তিই 'কালালাহ' যার পিতামাতাও বর্তমান নেই, সন্তানও নেই। তার ইজতিহাদের আরও উপমা হলো– যাকাত অস্বীকারকারী গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য বাইতুল মাল থেকে সমান বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি।

হযরত উমর রা. এর যুগে শারি'আহ আইন : হযরত উমর রা. এর যুগে শারি'আহ আইনের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। তিনি নিজে ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ফকিহ। তিনি খুব দ্রুত কোন সম্পূরক বিষয়কে মূল বিষয়ের সাথে তুলনা করতে পারতেন। ফলে তিনি তার খিলাফতকালে শারি'আহ আইনের এক বিশাল ভাণ্ডার রেখে যান। বিখ্যাত তাবিয়ি ইবরাহিম নাখয়ি যথার্থই বলেছেন যে, 'উমর রা. শহিদ হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়া থেকে ইলমের দশ ভাগের নয় ভাগ তিরোহিত হয়ে গেছে। শারি'আহ আইনের বিষয়ে হযরত উমর রা. কর্তৃক অনুসৃত রীতি-পদ্ধতির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় ছিল যে, ফয়সালা গ্রহণের জন্য তিনি সর্বোৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে

---

২২৭. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবি রহ., *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*(বৈরুত : দারুল জাইল, ২০০৫), পৃ. ৪৯

২২৮ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

সাহাবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ করতেন, বিতর্ক সভা করতেন। যখন তার সামনে কোন শারি'আহ আইন বিষয়ক সমস্যা উপস্থাপিত হতো তখন তিনি আলি, যায়িদ রা.সহ অন্যান্য সাহাবাদের ডাকতে বলতেন। তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং এভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন।'[২২৯]

মৌলিকভাবে উমর রা. এর অনুসৃত পদ্ধতি হযরত আবুবকর রা. এর নীতির প্রায় অনুরূপ ছিল। আগত সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান তিনি প্রথমে কুরআন, তারপর রাসুল সা. এর সুন্নাহর জ্ঞান ভাণ্ডারে খুজতেন। যদি সেসব থেকে সরাসরি কিছু না পেতেন এবং বাকি সাহাবাদের কাছ থেকেও তার অজানা কোন হাদিসের সন্ধান না পেতেন তখন সকলের সার্থে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতেন অথবা ইজতিহাদ করে রায় দিতেন। যেমন– হযরত উমর রা. এর নিকট গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াতের বিষয় উত্থাপিত হলো। তখন মুগিরা ইবন শু'বা রা. এ বিষয়ক একটা হাদিস জানালে উমর রা. সে অনুযায়ী ফয়সালা করেন। অনুরূপভাবে অগ্নি উপাসকদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করা সম্পর্কে তিনি আবদুর রহমান ইবন আউফ রা. বর্ণিত হাদিস থেকে অবগত হন এবং অতঃপর এর ভিত্তিতে আইন জারি করেন। তেমনিভাবে স্ত্রী স্বামীর দিয়াতের রক্তপণে অংশীদারি হবে কিনা এ সম্পর্কে তিনি দাহহাক ইবন সুফিয়ান আল-কালবি রা. বর্ণিত হাদিস থেকে অবগত হন এবং বলেন, 'যদি আমি এ হাদিস না শুনতাম, তবে ভিন্ন আদেশ দিতাম।'[২৩০]

অনেক সময় তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদিস না পেলে ইজতিহাদের মাধ্যমে রায় দিতেন। কিন্তু পরে এ সম্পর্কে কোন হাদিস জানতে পারলে পূর্ব রায় ত্যাগ করে হাদিস অনুসরণে রায় দিতেন। যেমন– হাতের আঙ্গুলের দিয়াতের ব্যাপারে তার মত ছিল, উপকারিতার পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন আঙ্গুলের দিয়াতও কমবেশি হবে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আবু মুছা আশ'আরি রা. ও আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে সকল আঙ্গুলের দিয়াত সমান হওয়া সম্পর্কিত হাদিস শুনে সে অনুযায়ী রায় দেন।

শারি'আহ আইনের ব্যাপারে তার অনুসৃত অপর একটা নীতি হচ্ছে, তার কাছে যদি হাদিসটা বিশুদ্ধ পন্থায় না পৌঁছাতো তবে তিনি তা গ্রহণ না করে বরং সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদিসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে রায় দিতেন। এ নীতি পরবর্তীতে শারি'আহ আইনের অনেক ইমাম আরও সুসংবদ্ধ করেছেন। এর উপমা হলো– তালাকের পর ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ বিষয়ক হযরত উমর রা. ফাতিমা বিনতে কায়েস রা.-এর হাদিস বর্জন করেন এবং কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী ফয়সালা প্রদান করেন।

এভাবেই উমর রা. শারি'আহ আইনের ব্যাপারে বিভিন্ন নীতিমালার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বিভিন্ন কাযি ও গভর্নরদের কাছে পত্র লিখতেন এবং তারাও তার কাছ থেকে বিভিন্ন বিধান জানতে চেয়ে পত্র লিখতেন। সেসব গভর্নরগণ নিজেরাই ছিলেন মর্যাদাবান সাহাবা ও শীর্ষস্থানীয় ফকিহ। তাই তারা নিজেরাও প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ে ইজতিহাদ করে আইন প্রদান করতেন। এভাবেই হযরত উমর রা.-এর পুরো খিলাফত জুড়েই শারি'আহ আইনের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

---

২২৯ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
২৩০. ইবনে তাইমিয়া, *রাফউল মালাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

হযরত উসমান রা.-এর যুগে শারি‘আহ আইন : হযরত উসমান রা.-কে এ শর্তে খলিফা নিযুক্ত করা হয়েছিল যে, তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী দুজন খলিফার অনুসৃত নীতি অনুসরণ করবেন। তাই তার খিলাফত কালে তিনি নিজে কদাচিৎ ইজতিহাদ করতেন; বরং অধিকাংশ বিষয়ে পূর্ববর্তী দুই খলিফার সময় নেয়া সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়নকেই প্রাধান্য দিতেন। তার নিজস্ব ইজতিহাদের উপমা হচ্ছে মিনায় সালাত সংক্ষিপ্ত না করা সংক্রান্ত তার আমল। তবে তিনি নিজে স্বাধীন ইজতিহাদ কম করলেও পূর্ববর্তী দুই যুগের ন্যায় তার যুগেও সাহাবা রা., বিভিন্ন এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত গভর্নর ও কাযিরা আগত নতুন নতুন বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে সমাধান করে শারি‘আহ আইনের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখেন।[২৩১]

হযরত আলি রা.-এর যুগে শারি‘আহ আইন : হযরত আলি রা. নিজেই ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ সাহাবা। তিনি উমর রা.-এর মতোই কুরআন-সুন্নাহর গভীর গবেষণার মাধ্যমে সাধারণ নীতিমালার আলোকে কোন বিশেষ ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতেন এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতেন। খলিফার দায়িত্ব পাওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন মদিনার শ্রেষ্ঠতম বিচারক। হযরত আয়িশা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ সম্পর্কে আলি রা. অন্য সকলের চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন।'

তিনি তার ইজতিহাদসমূহে গভীর ও সূক্ষ্ম কিয়াস প্রয়োগ করতে পারতেন যা পরবর্তী যুগে এ বিষয়ে মূলনীতি রচনায় দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। যেমন– তিনি মদ্যপানকারীর ব্যাপারে হদ্দে কাযফ অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তি প্রদানের রায় দেন– এ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যে, যে মাতাল সে যা ইচ্ছা তা-ই বলে যা মিথ্যা হওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব তার শাস্তি মিথ্যা অপবাদের শাস্তির অনুরূপ। এ রায়ের ভিত্তি হচ্ছে শারি‘আহ আইনের এই মূলনীতি যে, যা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল তার হুকুম ঘটে যাওয়া বিষয়ের অনুরূপ। যেমন– এক্ষেত্রে মাতালের মিথ্যা বলার সম্ভাবনা প্রবল এবং সে অনুযায়ী তার শাস্তি।[২৩২]

অনুরূপভাবে যৌথ হত্যা পরিকল্পনার সাথে জড়িত একদল লোককে কীভাবে শাস্তি দেয়া হবে এ বিষয়ে তার রায় ছিল তাদের সকলকে হত্যা করা। আর এটাকে তিনি চুরির ক্ষেত্রে একদল চোরের প্রত্যেকের হাত কেটে দেয়ার স্বীকৃত সিদ্ধান্ত থেকে কিয়াস করে বের করেছেন।

এভাবে আলি রা. তার যুগে বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শারি‘আহ আইনের বিধান আহরণে ব্যাপক গবেষণা ও সাদৃশ্যমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা পরবর্তী যুগে শারি‘আহ আইনের মূলনীতি প্রণয়নে বিশেষ অবদান রাখে।

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে শারি‘আহ আইনের বিকাশের মূল দিকগুলো হচ্ছে খলিফা ও সাহাবাগণ কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত শারি‘আহর বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতেন এবং পরস্পরের জানা বিষয় দ্বারা উপকৃত হতেন। তারা যখনই একত্রিত হতেন তখন কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে গবেষণা করতেন এবং কোন একটা বিষয়ের হুকুম অনুসন্ধানের সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারো কোন হাদিস শুনেছেন কিনা তার অনুসন্ধান করতেন। এ নীতির ফলে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জনের জানা প্রায় সকল হাদিসই জনসমক্ষে চলে আসে এবং অন্যরাও সেটা দ্বারা উপকৃত হওয়ার ও এর ভিত্তিতে

---

২৩১ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

২৩২ প্রাগুক্ত।

শারি'আহ আইন আহরণের সুযোগ পাওয়া যায়। সাহাবাগণের এ অনুসন্ধানী নীতির ফলে শারি'আহ আইনের অন্যতম উৎস হাদিসের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সেগুলো পরবর্তী যুগের ফকিহদের কাছেও পৌঁছে যায়। অনুরূপভাবে তাদের জ্ঞান ও গবেষণার কারণে কুরআনের আহকাম সম্পর্কিত আয়াতগুলো থেকে আহরিত হুকুম এবং আহরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনা ব্যাপকতর হয়েছে। উপরিউক্ত শারি'আহ আইনের তৃতীয় উৎস হিসেবে ইজমাউস সাহাবা অস্তিত্ব লাভ করে। ফলে, শারি'আহ আইন তার মূল উৎসগুলোর যথাযথ বিকশিত রূপসহ বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে পরবর্তী যুগের দিকে এগিয়ে যায়।

(খ) খুলাফায়ে রাশিদিন পরবর্তী সাহাবাগণের যুগ এবং এর সমান্তরাল তাবিয়িগণের যুগ : এ যুগটা হযরত মুআবিয়া রা. এর শাসনকাল তথা ৪১ হিজরি সাল থেকে প্রথম হিজরি শতকের শেষ পর্যন্ত পরিব্যপ্ত।। এ যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে–

- জীবিত সাহাবাগণ আরব ও আরবের বাইরে বিশাল খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েন।
- প্রতিটা অঞ্চলে তাদের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত তাবিয়িদের মধ্য থেকে একদল ফকিহ তৈরি হয়ে যায়, যারা নিজ নিজ অঞ্চলে শারি'আহ আইনের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।[২৩৩]
- প্রতিটা অঞ্চলে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে নতুন নতুন যেসব সমস্যা গোচরীভূত হতো উক্ত অঞ্চলের সাহাবা তার নিকট রক্ষিত কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণাদি জ্ঞান দ্বারা বা প্রমাণিত জ্ঞানের আলোকে এ সকলের জবাব দিতেন। এভাবে কোন বিষয়ে সমাধান পাওয়া না গেলে সে বিষয়ে ইজতিহাদ করে ফয়সালা দিতেন। যেহেতু একজন বা কয়েকজন সাহাবার পক্ষে সমস্ত হাদিস এবং এর জ্ঞানে পূর্ণাঙ্গ হওয়া সম্ভব ছিল না।[২৩৪] আর প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে অনেক দূরে অবস্থান করায় পূর্বের ন্যায় পারস্পরিক জিজ্ঞাসা ও পরামর্শের মাধ্যমে একে অন্যের নিকট রক্ষিত জ্ঞান বা জ্ঞানের বিশ্লেষণ দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগের সীমাবদ্ধতা ছিল। ফলে এ যুগে বিভিন্ন অঞ্চলের সাহাবাদের রায়ে উল্লেখযোগ্য মত পার্থক্যের সূচনা হতে শুরু করে। তাদের ছাত্র তাবিয়ি ফকিহবৃন্দের মাঝে গিয়ে শারি'আহ আইনের বিভিন্ন বিষয়ে এ মতপার্থক্য ব্যাপকতর হয়। মতপার্থক্যের আবির্ভাব এ যুগের শারি'আহ আইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- এ যুগে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ ও ধর্মীয় উপদল জন্মলাভ করে। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন উপদল কর্তৃক নিজ নিজ মতের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এবং আরও নানাবিধ কারণে জাল হাদিসের ব্যাপক প্রচলন ঘটে। ফলে শারি'আহ আইন জানার জন্য হাদিস আহরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কড়াকড়ি আরোপ ও বিভিন্ন মূলনীতি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়।[২৩৫]

---

২৩৩ সম্পাদনা পরিষদ, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
২৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
২৩৫ প্রাগুক্ত।

- এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এ যুগেই সংগঠিতভাবে বিগত দুই যুগের শারি'আহ আইনের সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়। এজন্য এ যুগকে শারি'আহ আইন সংকলনের ভিত্তিযুগও বলা যেতে পারে। এ যুগে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন শহরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফাতওয়া সংকলনের জন্য কতিপয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মাধ্যমে ঐ শহরের শীর্ষস্থানীয় তাবিয়ি ফকিহগণ তাদের শিক্ষক সাহাবাগণ বর্ণিত হাদিস ও শার'ই সিদ্ধান্তসমূহ গ্রন্থনার কাজ শুরু করেন। এসব কেন্দ্রের মধ্যে মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, সিরিয়া, মিশর ও ইয়ামেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় তাবিয়িগণের মধ্যে হযরত সাইদ ইবন মুসাইয়িব রহ., আতা ইবন রাবাহ রহ., হযরত ইবরাহিম নাখয়ি রহ., হযরত শা'বি রহ., হযরত হাসান বসরি রহ., হযরত মাকহুল রহ. প্রমূখ শীর্ষস্থানীয়। এদের মধ্যে মদিনার সাইদ ইবন মুসাইয়িব ও কুফার ইবরাহিম নাখয়ি ছিলেন বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তাদেরকে কেন্দ্র করে মদিনা ও কুফা উভয় শহরে বিরাট শারই' আইনি গোষ্ঠী গড়ে উঠে। অসংখ্য লোক তাদের কাছ থেকে শারি'আহ আইনের জ্ঞান লাভ করে। হাফিয ইবন কায়্যিম-এর মতে সাহাবাদের মধ্যে ফাতওয়া প্রদানকারী সাহাবার সংখ্যা একশত ত্রিশের কিছু বেশি। তাবিয়ি ফকিহগণের উপরোক্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে এ একশত ত্রিশ জন সাহাবার ফাতওয়া বা শারই' আইনি মত সংরক্ষণ এবং যেসব মূলনীতির মাধ্যমে তারা এসব সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন তার অনুধাবন সম্ভব হয়।

এভাবেই খুলাফায়ে রাশিদিন পরবর্তী তাবিয়ি যুগে শীর্ষস্থানীয় ফকিহদের মাধ্যমে রাসুল সা.-এর যুগ ও সাহাবা যুগের শারি'আহ আইন সম্পর্কিত জ্ঞান যথাযোগ্যভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়ে পরবর্তী যুগে পৌঁছে এবং শারই' আইনের পরবর্তী যুগ তথা চূড়ান্ত বিকাশপর্বের সূচনা হয়।

তিন. তাবিয়ি-তাবিইন যুগে শারি'আহ আইন : রাসুল সা. বলেন,

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

'সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ। তারপর এর পরবর্তী যুগ এবং তারপর এর পরবর্তী যুগ।[২৩৬]

শারি'আহ আইনের ইতিহাসে এই যুগ সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এ যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে শারি'আহ আইনের আকাশে এমন কিছু উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে যারা পূর্ববর্তী তিন যুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে ব্যবহার করে নিজেদের সুউচ্চ প্রতিভা ও মৌলিক চিন্তার মাধ্যমে শারি'আহ আইনকে ইসলামি জ্ঞানের একটা পূর্ণাঙ্গ শাখায় রূপদান করেন এবং এ শাস্ত্রের মূলনীতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় প্রায় সকল নীতিমালা প্রণয়ন করেন। ফলতঃ শারি'আহ আইন একটা স্বতন্ত্র, সুশৃঙ্খল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ জ্ঞানের মূলসূত্র যদিও তারা তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাদের পূর্ববর্তীদের কেউই এটাকে তাদের মতো বিস্তারিত আলোচনা করে যাননি এবং একে পৃথক একটা বিজ্ঞানের রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল নীতিমালার একত্রিত কোনো রূপ দেননি যদিও তারা নিজেরা এগুলো অনুশীলন করতেন।

---

২৩৬. মুহাম্মদ ইবন ইসা আত-তিরমিযি, *জামি' আত-তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০, হাদিস নং ২৩০৩.

এ যুগের ব্যপ্তি হিজরি দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগের প্রথমার্ধে আবির্ভাব ঘটে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ.-এর মত শারি'আহ আইনের শীর্ষস্থানীয় ইমামগণের। তদুপরি এ যুগের দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয় আর তা হলো হাদিস বিজ্ঞানের সংকলন। এ সময় ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রহ.-এর মত শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসগণের আবির্ভাব হয়। হাদিসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়নীতি তথা উসুলুল হাদিস প্রণীত হয় এবং এ সকলের ভিত্তিতে সিহাহ সিত্তাহ তথা ছয়টা বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থের সংকলন কাজ সম্পন্ন হয়। এভাবেই শারি'আহ আইন বিজ্ঞানের দুই দুটো শীর্ষ শাখার চরম বিকাশের মাধ্যমে এ যুগ এক অনন্য যুগে পরিণত হয়।

এখানে এ যুগে শারি'আহ আইনের বিকাশকে এ যুগের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব তথা প্রসিদ্ধ ইমামদের আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। কেননা এ যুগের শারি'আহ আইনের সামগ্রিক অগ্রগতি তাদেরকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। সময়ানুক্রমিকভাবে আগত ইমামগণের শার'ই আইনি চিন্তাধারা ও অবদানের বিশ্লেষণ করলেই এ যুগে শারি'আহ আইনের বিকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও শারি'আহ আইনে তার অবদান : ইমাম আযম নামে খ্যাত নুমান ইবন সাবিত আবু হানিফা রহ. প্রখ্যাত মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে সকলের আগে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তার জন্ম হিজরি ৮০ সনে কুফা নগরীতে।[২৩৭]

ইসলামি জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে কুফার খ্যাতি পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। ইমাম আবু হানিফা কুফার শীর্ষস্থানীয় তাবিয়ি ও তাবি তাবিইনগণের কাছে থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে মক্কা, মদিনা ও বসরা ভ্রমণ করেন এবং তথাকার শীর্ষস্থানীয় তাবিয়ি মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের কাছ থেকে হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম যাহাবির মতে কেবল কুফাতেই ইমাম আবু হানিফা ২৯ জন উস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন যাদের অধিকাংশই ছিলেন বড় বড় তাবিয়ি। এদের মধ্যে ইমাম শা'বি ও ইমাম হাম্মাদ রহ. অন্যতম। তিনি হযরত আনাস রা. কে দেখেছেন।[২৩৮] অন্য আরেক বর্ণনা মতে তিনি কুফায় তাবিয়ি ও তাবি-তাবিইনসহ ৯৩ জন উস্তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। আর এভাতে তাদের কাছে সংরক্ষিত পূর্ববর্তী তিন যুগের হাদিস ও ফিকহের বিশাল ভাণ্ডার তিনি সংগ্রহ করেন এবং তাঁর অসাধারণ মৌলিক প্রতিভা ও যোগ্যতার মাধ্যমে এসব থেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা নিয়ে বিভিন্ন নিয়মনীতির ভিত্তিতে শারি'আহ আইন শাস্ত্রের এক বিশাল ভাণ্ডার প্রস্তুত করেন এবং একে সুনির্দিষ্ট পন্তায় সংকলিত ও সুবিন্যস্ত। করে শারি'আহ আইনকে একটা স্বতন্ত্র ও সুবিন্যস্ত শাস্ত্রে রূপ দান করেন। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে তার কর্মপ্রচেষ্টার ফলেই সর্বপ্রথম ফিকহ একটা পৃথক ও বিস্তৃত শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করে। তাই ইমাম শাফিয়ি রহ. যথার্থই বলেন,

الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة.

'মুসলিম জাতি ফিকহে আবু হানিফার সন্তানতুল্য।'[২৩৯]

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. বলেন, 'ইমাম আবু হানিফা রহ.-ই সর্বপ্রথম এই ইলমে ফিকহ সংকলন করেন এবং তা অধ্যায় হিসেবে সুবিন্যস্ত করেন। পূর্ববর্তী ফকিহদের কেউই তাকে এ বিষয়ে পিছনে ফেলতে সক্ষম হয়নি।'[২৪০]

---

২৩৭ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

২৩৮. মুফতি সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, *তারীখে ইলমে হাদীস*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০১৩), পৃ. ৩১)

২৩৯. *আসারুল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

আবু হানিফা শারি'আহ আইন আহরণে তার অনুসৃত নীতি সম্পর্কে নিজে বলেন, 'আমরা প্রথমত কিতাবুল্লাহ দ্বারা দলিল গ্রহণ করি। তারপর রাসুলুল্লাহ সা. এর সুন্নাহ দ্বারা। তারপর সাহাবাগণের ইজমা দ্বারা। সাহাবাগণ যে বিষয়ে সর্বসম্মত আমরা এর উপর আমল করি। যদি তাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য হয়ে যায় তখন আমরা সামগ্রিক উপাদানের ভিত্তিতে এক হুকুমকে অন্য হুকুমের উপর কিয়াস করি যতক্ষণ না নসের (কুরআন-সুন্নাহ) অর্থ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।'[২৪১]

তিনি নিজে সুউচ্চ পর্যায়ের মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও কোন বিষয়ে সর্বাধিক সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য এবং একই সাথে শারি'আহ আইন চর্চাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের জন্য তার সুযোগ্য ও বিশিষ্ট সহচরদের মধ্য থেকে প্রধান চল্লিশজনকে নিয়ে 'মাজমাউল ফিকহি বা ফিকহ পরিষদ' গঠন করেন। এ চল্লিশজন তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও মুজতাহিদ ছিলেন। এ আল্লামা মুওয়াফফিক মাক্কি রহ. বলেন, 'আবু হানিফা রহ. তার ফিকহি চিন্তাধারা পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন। মজলিশে শুরার সাথে আলোচনা ব্যতীত তিনি নিজের একার মতে কিছু করতেন না। ফিকহি পরিষদের সামনে তিনি এক একটা করে মাসআলা উপস্থাপন করতেন, সদস্যদের মতামত ও প্রমাণাদি শুনতেন ও সবশেষে নিজের দলিল ও যুক্তিসমূহ পেশ করতেন। এভাবে এক একটা মাসালার উপর প্রয়োজনে মাসব্যাপী বা তার চেয়েও বেশি সময় পর্যন্ত তিনি বোর্ড সদস্যদের সাথে বিতর্ক চালিয়ে যেতেন। পরিশেষে কোন একটা অভিমতের উপর বোর্ড সদস্যগণ একমত হলে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. তা লিপিবদ্ধ করে নিতেন। এভাবে ফিকহে হানাফি লিপিবদ্ধ হয়।'[২৪২]

সকলে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি চলতে থাকতো। এক বর্ণনায় আছে, 'বোর্ড সদস্যদের মধ্য থেকে একজনও যদি ভিন্নমত পোষন করতেন তাহলে তিনদিন পর্যন্ত সে বিষয়ের উপর আলোচনা হত।' ইবন আবুল আওয়াম, ইমাম আবু হানিফার অন্যতম প্রধান ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফের বর্ণনাসূত্রে বর্ণনা করেন, 'যখন ইমাম আবু হানিফার নিকট কোন মাসআলা উপস্থিত হতো, তখন তিনি তার ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কী হাদিস ও আসার আছে তা বর্ণনা কর। তারপর যখন আমরা হাদিস ও আসার পেশ করতাম এবং সে ভিত্তিতে নিজেদের রায় দিতাম, তখন তিনি তার মতামত ব্যক্ত করতেন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে যে পক্ষের হাদিস ও আসার অধিক শক্তিশালী হতো, সেসব হাদিস ও আসারই তিনি গ্রহণ করতেন। আর যদি উভয় পক্ষের হাদিস ও আসার সমান সমান হতো, তখন তিনি চিন্তা-গবেষণা করে একটা মতকে গ্রহণ করতেন।'[২৪৩]

এ ফিকহ পরিষদের তত্ত্বাবধানে বাইশ বছর পর্যন্ত অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণার ফলে ৮৩ হাজার মাসআলা সংকলিত ও সন্নিবেশিত হয়। এরপরও মাসআলার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং এভাবে পাঁচ লক্ষে গিয়ে পৌঁছায়। আল্লামা খাওয়ারিযমি রহ. স্বীয় 'জামিউল মাসাইল' গ্রন্থে বলেন, 'ইমাম আবু হানিফা রহ. এর লিপিবদ্ধকৃত মাসাইলের সংখ্যা পাঁচ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছিল। তার ও তার ছাত্রদের গ্রন্থরাজি এর প্রমাণ বহন করে।'[২৪৪]

---

২৪০. *মানাকিবে মুওয়াফফিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
২৪১. ইমাম শারানি, *আল-মিযান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
২৪২. *মানাকিবে মুওয়াফফিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
২৪৩. এ.এম.এ. সিরাজুল ইসলাম, *ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০১৬), পৃ. ১৪৮
২৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১-২৬৩

এভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমায়ে সাহাবা, ফাতাওয়ায়ে সাহাবা ও কিয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করে বিষয় ভিত্তিকভাবে ফিকহের এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলেন এবং শারি'আহ আইনকে আলাদা এক শাস্ত্রের রূপ দান করেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বিপুল সংখ্যক মুজতাহিদ ছাত্র রেখে যান। প্রধান ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান, আশ-শাইবানি ও ইমাম যুফার অন্যতম। এই তিনজন নিজেরাই মুজতাহিদ মুতলাক ছিলেন এবং স্বতন্ত্র মাযহাব প্রবর্তনের যোগ্যতা রাখতেন। কিন্তু তারা নিজেদেরকে তাদের উস্তাদের মাযহাবের সাথেই সম্পৃক্ত রাখেন। আবু হানিফার পর তার ছাত্ররা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তার বিখ্যাত ছাত্রবৃন্দের মাধ্যমে তার ফিকহি পদ্ধতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন খলিফা, শাসকের কাযিগণ এ মাযহাবকে তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলে এটা মুসলিম জগতের সর্বত্র বিস্তৃত হয়। ইবন হাযম রহ. বলেন, 'ইসলামের প্রথম যুগে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দুটো মাযহাব সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্য অঞ্চলে হানাফি মাযহাব আর আন্দালুস-স্পেন অঞ্চলে মালিকি মাযহাব।'[২৪৫]

এভাবে মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক লোক এ মাযহাবের অনুসারী হয়ে যায়।

ইমাম মালিক ইবন আনাস রহ. ও শারি'আহ আইনে তার অবদান : ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন,

وإذا ذكر العلماء، فمالك النجم الثاقب.

'যখন আলিমগণের আলোচনা করা হয় তখন ইমাম মালিক ইবন আনাসের আলোচনা সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠে।'

আবু আবদুল্লাহ মালিক ইবন আনাস রহ. ৯৩ হিজরিতে মদিনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। মদিনার প্রখ্যাত তাবিয়ি মুজতাহিদ রবিয়াতুর রায়, প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ইমাম যুহরি নাফে রহ. এবং এরূপ আরো অনেক শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও মুহাদ্দিস তাবিইন থেকে তিনি হাদিস ও ফিকহের ইলম অর্জন করে এক সময় 'ইমাম দারুল হিজরত' ও মদিনার ইমাম' নামে চতুর্দিকে খ্যাতি অর্জন করেন।[২৪৬]

তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মুয়াত্তা' নামক হাদিস সংকলন; যেটা অনেকের মতে বুখারি, মুসলিমের সমপর্যায়ের বিশুদ্ধ হাদিস সংকলন। একই সাথে মুয়াত্তা মালিকি মাযহাবের ভিত্তিও বটে। তাই মালিকি মাযহাবের আলোচনা মুয়াত্তাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। ইমাম আওযায়ি রহ. বলেন যে ইমাম মালিক রহ. বলেছেন, 'এ গ্রন্থখানা আমি চল্লিশ বছরে সংকলন করেছি।' তিনি আরো বলেন, 'এ গ্রন্থখানা সংকলনের পর আমি মদিনার সত্তর জন ফকিহর সম্মুখে তা উপস্থাপন করলাম। তারা সকলেই আমার সাথে এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করলেন। এ কারণেই আমি গ্রন্থখানার নাম রাখলাম– মুয়াত্তা।'[২৪৭]

এ সংকলনে তিনি অনেক মুরসাল হাদিসকে স্থান দিয়েছেন। বস্তুত ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মত তিনিও মুরসাল হাদিস দ্বারা দলিল গ্রহণ করতেন। মুওয়াত্তায় সংকলিত হাদিস ও আমাদের ভিত্তিতেই মালিকি ফিকহ প্রসারিত হয়।

---

২৪৫. *ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১-২৬৩

২৪৬. ইবন হাযম আল-আন্দালুসি, *জামহারাতু আনসাবুল আরব*(বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৩), পৃ. ৪৩৫

২৪৭. মুহাম্মদ যাকারিয়া, *আউজাযুল মাসালিক ইলা মুয়াত্তা মালিক*(সাহারানপুর : আল-মাকতাবাহ আল য়াহয়ুবিয়া, ১৩৮৬ হি.), খ.১, পৃ. ২১

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের অনুরোধক্রমেই ইমাম মালিক রহ. মুওয়াত্তা সংকলনে হাত দেন। বর্ণিত আছে যে, খলিফা মানসুর যখন বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিমগণের মাঝে ফিকহি বিষয়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য লক্ষ্য করলেন তখন তিনি ইচ্ছা করলেন একক কোন হাদিস ও ফিকহ গ্রন্থের ভিত্তিতে সকলকে ঐকবদ্ধ করতে। তাই হজ উপলক্ষে মদিনায় এসে খলিফা ইমাম মালিককে বললেন, ‘আমি আপনার মুওয়াত্তার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়ে এবং সেগুলো মুসলিমদের সকল শহরে পাঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে এ নির্দেশ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এখন থেকে এটারই অনুসরণ করতে হবে এবং একে ত্যাগ করে অন্য কোন মতের অনুসরণ করা যাবে না।’ ইমাম সুয়ুতির বর্ণনায় অনুরূপ ঘটনা খলিফা হারুনুর রশিদের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে খলিফা তাকে বলেন, ‘আপনার মুয়াত্তা কাবার গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে লোকদেরকে সকল মতপার্থক্য ত্যাগ করে এর অনুসরণ করতে বাধ্য করলে কেমন হয়? জবাবে ইমাম মালিক বলেন, ‘হে আমিরুল মু’মিনিন! এমনটা করবেন না। রাসুলুল্লাহ সা.-এর সাহাবাগণের মধ্যেও খুঁটিনাটি বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল। অতপর তারা বিভিন্ন শহরে চড়িয়ে পড়ার ফলে বিভিন্ন শহরে তাদের নিজ নিজ মতের অনেক অনুসারী লোক সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে লোকদের মধ্যে যে মতপার্থক্য দেখা যাচ্ছে তা সাহাবাগণের থেকেই চলে আসছে।’ তার এ জবাব শুনে খলিফা তার ইচ্ছা পরিবর্তন করেন।

ইমাম মালিক রহ. তার শারি‘আহ আইন রচনার উৎস হিসেবে কুরআন, সুন্নাহ, মদিনার আলিমগণের আমল, কিয়াস ও ইসতিসলাহকে গ্রহণ করেন।[২৪৮] মদিনাবাসীদের সম্মিলিত আমলকে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং এর বিপরীতে খবরে ওয়াহিদ বর্জন করতেন। তার নিজের সময়কালেই তার মাযহাব মদিনার প্রধানতম মাযহাবে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে সমগ্র হিজাযেও তা বিস্তার লাভ করে। তার মদিনার ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু মারওয়ান আবদুল মালিক রহ.। অন্যান্য অঞ্চল বিশেষত মিসর ও আফ্রিকা থেকে অনেকে তার নিকট শারি‘আহ আইনের জ্ঞান শিখতে আসতেন। যাদের মাধ্যমে তার মাযহাব অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষত আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে। তার অনুসারী ছাত্ররা ছাড়াও তার যুগের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বও তার নিকট হাদিস শিখতে আসতেন যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন মুবারক, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম শাফিয়ি রহ. অন্যতম।

ইমাম শাফিয়ি রহ. ও শারি‘আহ আইনে তার অবদান : ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. বলেন, ‘কালির দোয়াত বহনকারী যে কোন হাদিস বর্ণনাকারী কোন না কোনভাবে ইমাম শাফিয়ি রহ. এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।’[২৪৯]

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইদরিস ইমাম শাফিয়ি রহ. ১৫০ হিজরিতে সিরিয়ার গাযা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। একই বছর ইমাম আবু হানিফা রহ. পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।[২৫০]

ইমাম শাফিয়ি প্রথমে মক্কায় বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ রহ. ও মুসলিম ইবন খালিদ আল যিনজি রহ. এর নিকট থেকে হাদিস ও শারি‘আহ আইন বিষয়ক জ্ঞান অর্জন

২৪৮. আবু ইসহাক ইবরাহিম আশ-শাতিবি, *আল-মুয়াফাকাত ফি উসুলিল আহকাম*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২০০

২৪৯. তাহা জাবির আল-আরওয়ানি, অনূঃ মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, *ইসলামী উসূলে ফিকহ*(ঢাকা : বিআইআইটি, ১৯৯৬), পৃ. ৫১

২৫০ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

করেন। অতপর মদিনায় মদিনায় ইমাম মালিক রহ. এর কাছ থেকে মুওয়াত্তা শিক্ষা নেন। এছাড়াও আরো ৮০ জন ফকিহ ও মুহাদ্দিস থেকে হাদিস ও ফিকহ শিখেন। অতপর ইরাকে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান রহ. এর কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। ১৯৫ হিজরিতে তিনি পুনরায় ইরাক যান এবং তার ফিকহি চিন্তাধারা পেশ করেন। তার এ সময়ের ফাতওয়াগুলো তার কওলে কাদিম বা পুরাতন অভিমত নামে পরিচিত। ১৯৮ হিজরিতে তিনি মিসরে চলে যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সময় সেখানেই অতিবাহিত করেন। মিসর গমনের পর মক্কা, মদিনা, ইরাক ও মিশরের ঐ সময়ের ফিকহি চিন্তাধারা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তার নিজস্ব ফিকহি চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং চিন্তাধারার এই পরিবর্তন তাকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি উসুলুল ফিকহ তথা ফিকহের মূলনীতি প্রণয়নের দিকে ধাবিত করে।

এ বিষয়ে জ্ঞানীদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, উসুলুল ফিকহ-এর সর্বপ্রথম প্রণেতা হচ্ছেন ইমাম শাফিয়ি এবং এ বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রণীত গ্রন্থ তার আর-রিসালাহ। দূর্বল একটা সূত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ এর ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ রহ. কর্তৃক সর্বপ্রথম উসুলুল ফিকহ বিষয়ে একটা গ্রন্থ রচনার বর্ণনা থাকলেও এর স্বপক্ষে শক্তিশালী কোন প্রমাণ নেই আর গ্রন্থটা পরবর্তীকালে পাওয়াও যায়নি। আয-যারকাশি রহ. তার আল-বাহরুল মুহিত গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইমাম শাফিয়ি রহ. প্রথম ব্যক্তি যিনি উসুলুল ফিকহ সম্পর্কে লিখেছেন। ইমাম যুয়াইনি বলেন, 'ইমাম শাফিয়ি রহ. এর পূর্বে আর কেউ উসুল সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেননি কিংবা এ বিষয়ে তার মতো এত বেশি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না।'[২৫১]

বস্তুতঃ প্রাথমিক যুগের ফকিহদের বিভিন্ন ফাতওয়া থেকে ধারণা করা যায় যে, এ বিষয়ে বিভিন্ন নীতিমালার জ্ঞান তাদের ছিল, তবে তারা কেউই এসব নীতিমালা সম্পর্কে পৃথকভাবে কোন আলোচনা করেননি বা এ বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। সর্বপ্রথম ইমাম শাফিয়ি রহ. এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেন। তার অন্য কোন অবদান যদি নাও থাকতো তাহলেও কেবল এই এক কারণেই তিনি ফিকহের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতেন।

যেসব বিষয়ে তাকে শারি'আহ আইনের মূলনীতি প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হলো–[২৫২]

১. তার পূর্ববর্তী যুগের ইমাম ও ফকিহদের নিকট প্রধানত তাদের নিজ নিজ শহরের আলিমদের সূত্রে প্রাপ্ত হাদিস ও আছারই বর্তমান ছিল, সকল শহরের বর্ণনাসমূহের কোন একক সংকলন ছিল না, ফলে বিভিন্ন শহরের ফকিহদের রায়ে ব্যাপক মতপার্থক্য এত বেশি দৃষ্টি গোচরে আসেনি। ইমাম শাফিয়ির যুগে তিনি তা সংকলিত অবস্থায় পান এবং এ সবের মাঝে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখেন। তাছাড়া পূর্ববর্তী অন্যান্য ইমামগণ প্রধানত নিজ শহরেই বাস করতেন। কিন্তু ইমাম শাফিয়ি সে সময়ের প্রধানতম চারটা কেন্দ্র মক্কা, মদিনা, কুফা ও মিসরে অবস্থান করে জ্ঞানার্জন করায় বিভিন্ন অঞ্চলে শারি'আহ আইনি চিন্তাধারার পার্থক্য তার দৃষ্টিতে আসে। তাই তিনি এমন কিছু মূলনীতি উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন যার ভিত্তিতে সকলেই একই ছক অনুসরণ করে মূল উৎস থেকে শারি'আহ আইন আহরণ করতে পারে যাতে মতপার্থক্য যথাসম্ভব হ্রাস পায়।

---

২৫১. তাহা জাবির আল-আরওয়ানি, *ইসলামী উসূলে ফিকহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

২৫২ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

২. ইমাম শাফিয়ি রহ. দেখলেন মদিনা ও কুফার ফকিহগণ মুরসাল ও মুনকাতি হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণ করছে। ফলে তাদের অনেক বক্তব্যে ত্রুটি প্রবেশ করছে। কেননা বহু মুরসাল হাদিস মুসনাদ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে। ফলে তিনি মুরসাল হাদিস গ্রহণে শর্ত নির্ধারণ করে নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

৩. ইমাম শাফিয়ি রহ. দেখলেন, দুটো মতপার্থক্যপূর্ণ প্রমাণের সামঞ্জস্য বিদানে কোনো নির্দিষ্ট বিধি অনুসরণ করছেন না, যাতে তাদের ইজতিহাদসমূহ আরো সুরক্ষিত হতে পারতো। কাজেই তিনি এ বিষয়ে মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. ইমাম শাফিয়ি রহ. দেখলেন, ইমামের কাছে কোন সুনির্দিষ্ট হাদিস না থাকায় তিনি হয়ত ঐ বিষয়ে ইজতিহাদ করে রায় দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে তার অনুসারী ফকিহদের এ বিষয়ে হাদিস নজরে আসলেও যথাযথ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তা গ্রহণে মনোনিবেশ না করে পূর্ববর্তী ইজতিহাদকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। ফলে তিনি এ বিষয়েও মূলনীতি প্রণয়ন করলেন।

৫. ইমাম শাফিয়ি রহ. এর সময়ে সাহাবা রা. এর বাণী সর্বাধিক পরিমাণে সংগৃহীত ছিল। তিনি এসব বিশ্লেষণ করে এর বিরাট অংশ সহিহ হাদিসের বিপরীত পান। কারণ সকল হাদিস এককভাবে সকল সাহাবার কাছে পৌঁছেনি। তাই তিনি এক্ষেত্রে সহিহ হাদিসের বিপরীত সাহাবাদের যে সব বক্তব্য তা গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে নীতিমালা তৈরি করেন।

৬. ইমাম শাফিয়ি রহ. আরও দেখলেন, একদল ফকিহ রায় ও কিয়াস কে মিশিয়ে ফেলছে। অথচ শারি'আহ রায়কে নিষেধ করেছে ও কিয়াসকে বৈধ ও উত্তম বলেছে। তিনি বলেন, 'আমি রায় বলতে কোন যুক্তির ধারণা বা সম্ভাবনাকে কোন বিদানের ভিত্তি বা কারণ ধরে নেয়া বুঝাচ্ছি। আর কিয়াস বলতে বুঝাচ্ছি কোন সম্পূর্ণ বিধানের কারণ খুঁজে বের করা এবং সেই কারণের ভিত্তিতে অনুরূপ বিষয়ে বিধান স্থির করা।' এভাবে তিনি কিয়াস-এর সঠিক পদ্ধতি বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করেন।

৭. ইমাম শাফিয়ি রহ. দেখলেন, মিসরের লোকেরা কোন যাচাই-বাছাই ছাড়াই কঠোরভাবে ইমাম মালিক রহ. এর ফিকহ অনুসরণ করছে। তিনি ইমাম মালিক রহ. এর শারি'আহ আইন বিষয়ক মতামতসমূহের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখলেন, 'কখনো তিনি ঘটনাবিশেষকে গুরুত্ব না দিয়ে ঘটনা বিশেষের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।' তিনি লক্ষ্য করেন, ইমাম মালিক রহ. কোন সাহাবা বা তাবিয়ি প্রদত্ত বক্তব্য বা মদিনাবাসীদের ঐক্যমতকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্য আরেকটি সহিহ হাদিসকে অগ্রাহ্য করছেন এবং যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অনেক সময় 'মাসালিহ-মুরসালাহ' প্রয়োগ করছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ব্যাপারে তার মত ছিল– 'অনেক ক্ষেত্রে তিনি ছোট-খাটো বিষয় ও বিশেষ কোন বিষয়ের ব্যাপারে তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন; কিন্তু মূলনীতির প্রতি গুরুত্ব দেননি।' তাই ইমাম শাফিয়ি রহ. উপরোক্ত বিষয়সমূহকে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে ইমাম শাফিয়ি রহ. এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হবে শারি'আহ আইন প্রণয়নের নীতিমালার সুনির্দিষ্ট করণ, সেগুলোর প্রয়োগের জন্য বুনিয়াদি নিয়ম-নীতি প্রণয়ন ও উসুলুল ফিকহের বিকাশ ঘটানোর প্রতি যাতে এসবের

সাহায্যে যথার্থ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ফিকহ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। শারি'আহ আইনকে হতে হবে উসুলুল ফিকহের বাস্তব প্রতিফলন। এ চিন্তাধারার ভিত্তিতেই তিনি তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ আর-রিসালাহ ও পরবর্তীতে কিতাবুল উম্ম রচনা করেন যার মাধ্যমে তিনি উসুলুল ফিকহ এর ভিত্তি স্থাপন করেন।[২৫৩]

ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর আর-রিসালাহতে উপস্থাপিত চিন্তাধারা সমসাময়িক ফিকহি গবেষণার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। এরপর দীর্ঘ সময় উসুলুল ফিকহের উপর যা লেখা হয়েছে তা মূলত এ গ্রন্থের টিকা-টিপ্পনী বা এর পক্ষে বা বিপক্ষে আলোচনা-সমালোচনা সম্বলিত অর্থাৎ এটা ঐ যুগের ফিকহি গবেষণার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।

তবে ইমাম শাফিয়ি রহ. তার উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে উসুলুল ফিকহের ভিত্তি স্থাপন করলেও এ দুটো উসুলুল ফিকহ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয়; বরং এ বিষয়টি পূর্ণতা লাভ করে তার পরবর্তীকালে প্রধানত তার অনুসারী মুজতাহিদগণের মাধ্যমে। এ বিষয়ে প্রাচীনদের লেখা শ্রেষ্ঠতম তিনখানা গ্রন্থ হচ্ছে– আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আল-বাসরি রচিত 'মু'তামাদ', ইমামুল হারামাইন রচিত 'আল-বুরহান' এবং ইমাম গাযালি রচিত 'আল মুসতাশফা মিন ইলমুল উসুল'। পরবর্তীতে আবুল হুসাইন আলি ইমাম সাইফুদ্দিন আল আমিদি রচিত তার 'আল ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম' নামক বিখ্যাত ও সুবৃহৎ গ্রন্থে উপরোক্ত গ্রন্থত্রয়ের সারবস্তুকে একত্রিত করেন।

ইমাম শাফিয়ি রহ. এর এ চিন্তাধারা সমকালীন অন্যান্য মাযহাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বাকিরাও তখন নিজ নিজ মাযহাবের উসুল প্রণয়নে মনোনিবেশ করে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ সমস্ত উসুলই ইমাম শাফিয়ি রহ. প্রণীত উসুলেই কিছুটা বর্ধিত বা সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন– ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর পরবর্তী হানাফি ফকিহগণ উসুলুল ফিকহ রচনায় ব্রতী হন এবং শাফিয়ি রহ. এর উসুলের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য খুবই কম। পার্থক্য শুধুমাত্র শাখা-প্রশাখা পর্যায়ে বিধান আহরণের ক্ষেত্রে। হানাফিদের রচিত উসুলুল ফিকহের গ্রন্থের মধ্যে আলি বিন মুহাম্মদ আল বাযদাভি রহ. রচিত উসুলুল বাযদাভি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মালিকিদের প্রণীত উসুলুল ফিকহও শাফিয়ির প্রায় অনুরূপ এবং প্রধান পার্থক্যের মধ্যে মদিনার আলিমদের ঐক্যমত শারি'আহর দলিল না হওয়ার বিষয়ে শাফিয়ির মতভেদ উল্লেখযোগ্য। হাম্বলিরাও এ উসুল গ্রহণ করে নিয়েছে। তবে তারা ইজমার অর্থ সম্পর্কে ইমাম শাফিয়ির সাথে মতভেদ করেছে এই বলে যে, একমাত্র গ্রহণযোগ্য ইজমা হচ্ছে ইজমাউস সাহাবা। যারা তার উসুলকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছে সে ধারাটিই শাফিয়ি মাযহাব নামে পরিচিত হয়। এভাবেই ইমাম শাফিয়ি রহ. উসুলুল ফিকহ একদিকে যেমন তার নিজস্ব মাযহাবের বুনিয়াদ স্থাপন করে, তেমনি অন্যদিকে আর সব মাযহাবের উসুল সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার উপরও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। উসুলুল ফিকহ-এর আবির্ভাবের ফলে মূল উৎস থেকে ফিকহ আহরণের একটি মানদণ্ড তৈরি হয় এবং পরবর্তীকালের সকল ফিকহ চর্চাকারীদের জন্য একটা সাধারণ পথ তৈরি হয়।[২৫৪]

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ. ও শারি'আহ আইনে তার অবদান : ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন, 'আমি বাগদাদে আহমদ ইবন হাম্বলের চেয়ে মর্যাদাশীল, অধিক জ্ঞানী, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ও অধিক মুত্তাকি আর কাউকে পাইনি।'[২৫৫]

---

২৫৩. তাহা জাবির আল-আরওয়ানি, *ইসলামী উসূলে ফিকহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫
২৫৪ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২০
২৫৫. তাহা জাবির আল-আরওয়ানি, *ইসলামী উসূলে ফিকহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবন হাম্বল রহ. ১৬৪ হিজরি মনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফের কাছে শারি'আহ আইনের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবন উয়াইনা রহ. ও শাইখ আবদুর রাজ্জাক এর কাছ থেকেও শিক্ষা নেন। পরবর্তীতে তিনি ইমাম শাফিয়ি রহ. এর কাছ থেকে শারি'আহ আইন শিক্ষা করেন। এভাবে ফিকহ ও হাদিসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তিনি ইমামুল হাদিস এর মর্যাদা লাভ করেন।[২৫৬]

হাম্বলি ফিকহ মূলত শাফিয়ি ফিকহের অনুগামী। তাদের উসুলও প্রায় শাফিয়ি উসুলই বলা চলে। তবে ইমাম আহমদ হাদিসকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। ইজমা বলতে ইজমাউস সাহাবাকে সুনির্দিষ্ট করতেন এবং কিয়াস যথাসম্ভব পরিহার করতেন। তিনি বলেন, 'কোন ব্যক্তি বিশেষের অভিমতের চেয়ে দুর্বল হাদিস আমার নিকট অধিকতর উত্তম।' এ মূলনীতির ফলে তিনি মারফু' অথবা মাওকুফ উভয় অবস্থাতেই সহিহ হাদিসকে আমলযোগ্য মনে করতেন। ফলে তার মাযহাবে একই মাসাআলায় একাধিক হুকুম পাওয়া যায়। একান্ত বাধ্য হয়ে তিনি কিয়াস করতেন এবং কোন বিষয়ে কোন সাহাবার রায় পেলে তাকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন। তার অনন্য হচ্ছে তার সংকলিত মুসনাদে ইমাম আহমদ। যাতে তিনি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হাদিস থেকে বাছাই করে চল্লিশ হাজার হাদিস সংকলন করেন। ইমাম আহমদ শারি'আহ আইন বিশারদের চেয়ে মুহাদ্দিস হিসেবেই বেশি পরিচিত। তার ছাত্রবৃন্দের মাধ্যমে তার মাযহাব বাগদাদ, বসরা প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করে।

উপরোক্ত এ চারজন ইমাম শারি'আহ আইনে তাদের গগণচুম্বী ব্যক্তিগত অবদানের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক ছাত্র তৈরি করে যান যারা পরবর্তীতে তাদের ফিকহি চিন্তাধারায় সংরক্ষণ করে এবং একে মাযহাবের রূপ দান করেন। বস্তুত পরবর্তী যুগে এমনকি আজ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী এই চার ইমামের মাযহাব টিকে থাকার প্রধান কৃতিত্ব তাদের ছাত্রদের, যারা এটাকে এক যুগ থেকে অন্য যুগে বহন করে নিয়ে গেছেন। এ চারজন ছাড়াও ঐ যুগে তাদের সমপর্যায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন আরও কিছু মুজতাহিদ ছিলেন। যাদের পৃথক মাযহাব ছিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক অনুসারীও ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধার কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচারিত না হওয়ায় এবং তাদের পর্যাপ্ত সংখ্যক ছাত্র না থাকায় তাদের মৃত্যুর পর ঐসব মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য যারা তারা হলেন–

১. সিরিয়ার আবু আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ আল আওযায়ি ও তার মাযহাব।
২. ইমাম সুফিয়ান সাওরি ও তার মাযহাব।
৩. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি ও তার মাযহাব।
৪. ইমাম আবু সুলাইমান দাউদ যাহিরি ও তার মাযহাব।

উপরোক্ত মাযহাবি চিন্তাধারা ও মূলধারার সাথে প্রধান পার্থক্য ছিলো যে এরা কিয়াসকে শারি'আহর উৎস হিসেবে অস্বীকার করত। যদিও তারা কিয়াসে জলি বলতে যা বুঝায় ভিন্ন নামে তার অনুসরণ করত। এর মধ্যে প্রথম তিনটা হিজরি প্রায় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল; অতঃপর বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর চতুর্থটা অর্থাৎ ইমাম দাউদ যাহিরির মাযহাব ইবন খালদুনের মতে

---

২৫৬ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

হিজরি অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এসব ছাড়াও আরও কিছু মাযহাব যেমন– ইমাম হাসান আল-বাসরি, ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, সুফিয়ান ইবন উয়াইনা ও নাইস ইবন সাদ রহ. প্রমূখের মাযহাবও কিছুকাল পর্যন্ত চালু ছিল। পরবর্তীতে এগুলোর অনুশীলন ও অনুসরণ বন্ধ হয়ে যায় এবং হানাফি, মালিকি, শাফিয়ি ও হাম্বলি এই চারটি ফিকহি মাযহাব অবশিষ্ট থেকে যায়।

এসবের বাইরে মূলধারা থেকে প্রায় পৃথক একটি ফিকহি চিন্তাধারা– যা মাযহাবও সে যুগে গড়ে উঠেছিল যা এখনও বিদ্যমান আছে, আর তা হলো শিয়া মাযহাব। বস্তুত এটা হলো আকিদাগত একটা মাযহাব। তারা ইমাম জাফর সাদিকের মাযহাব গ্রহণ করেছিল। যদিও তারা নিজেদের আকিদার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তার মতের সাথে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অনেক কিছু সংযোজন করে। তাদের শারি'আহ আইনের উৎসের মধ্যে কুরআন, সুন্নাহর মত তাদের বারোজন ইমামের বক্তব্যও অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তাদের বক্তব্যকে তারা কুরআন-সুন্নাহর সমপর্যায়ের আইনগত মর্যাদা দেয় এবং তাদের ইমামদের বর্ণিত হাদিস ছাড়া অন্য কোন হাদিস তারা গ্রহণ করে না। এছাড়া তারা কিয়াসকে শারি'আহর উৎস হিসেবে অস্বীকার করে। এভাবে তারা প্রধান সমস্ত মাযহাবের চিন্তাধারা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন চিন্তাধারা পোষণ করে।

উপরোক্ত প্রধান প্রধান ফিকহি মাযহাব ও তাদের প্রবক্তাদের কর্মপ্রচেষ্টার ফলে শারি'আহ আইনের বিন্যাস, উসুলুল ফিকহ প্রণয়ন, হাদিস সংকলন ইত্যাদির মাধ্যমে এ যুগে ইলমুল ফিকহ তার সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়। তাদের বিখ্যাত ছাত্রদের মাধ্যমে অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে যুগের শেষ পর্যায় তথা হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ যুগে মুজতাহিদ সাহাবা ও ইমামগণের ফিকহি বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণ : রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

'যখন হাকিম ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তখন সে দুটো সাওয়াব পায়, আর তার সিদ্ধান্ত ভুল হলে সে অন্তত একটা সাওয়াব পায়।'[২৫৭]

এটা একটা বিস্তৃত বিষয় এবং এ বিষয়ে পূর্ববর্তীগণ পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এমনকি বিষয়টা ইলমুল খিলাফ বা মতভেদ সম্পর্কিত জ্ঞান শীর্ষক শিরোনামে পৃথক একটা শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। তবে খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়ে এখানে শুধু সেই মৌলিক কারণগুলো উপস্থাপন করা হবে যেগুলোর ভিত্তিতে সাহাবা যুগ, তাবিয়ি যুগ ও তাবি-তাবিইন যুগ তথা মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে ফিকহি বিষয়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল যা এখনো বিদ্যমান। সেগুলো হলো–

১. কোন একটা প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান সম্পর্কে হয়ত একজন সাহাবার উক্ত বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সা. এর কোন বক্তব্য জানা ছিল, পক্ষান্তরে অপরজনের জানা ছিল না। ফলে বাধ্য হয়ে প্রত্যেকে স্ব স্ব জ্ঞাত বিষয়ে ইজতিহাদ করে রায় দিয়েছেন। যেমন– হযরত উমর রা. এর নিকট গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াতের বিষয় উত্থাপিত হলো। তখন মুগিরা ইবন শু'বা রা. এ বিষয়ক একটা হাদিস জানালে উমর রা. সে অনুযায়ী ফয়সালা করেন। অনুরূপভাবে অগ্নি উপাসকদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করা সম্পর্কে তিনি আবদুর

২৫৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৫১৮, হাদিস নং ৬৮৫০

রহমান ইবন আউফ রা. বর্ণিত হাদিস থেকে অবগত হন এবং অতপর এর ভিত্তিতে আইন জারি করেন। তেমনিভাবে স্ত্রী স্বামীর দিয়াতের রক্তপণে অংশীদারি হবে কিনা এ সম্পর্কে তিনি দাহহাক ইবন সুফিয়ান আল-কালবি রা. বর্ণিত থেকে অবগত হন এবং বলেন, 'যদি আমি এ হাদিস না শুনতাম, তবে ভিন্ন আদেশ দিতাম।'[২৫৮] অনুরূপ ঘটনা মুজতাহিদ ইমামগণের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। কেননা তারা যাদের কাছ থেকে হাদিস সংগ্রহ করেছেন তাদের নিকট সকল সাহাবা বর্ণিত হাদিস ছিল না। যেহেতু হাদিস সংকলনের যুগ হচ্ছে এর পরবর্তী যুগ। কাজেই এটা স্বাভাবিক ছিল যে, কোন হাদিস হয়ত একজন মক্কাবাসী ইমামের জানা ছিল না; কিন্তু কুফাবাসী ইমামের তা জানা ছিল।[২৫৯]

২. হয়ত হাদিসটি সাহাবা বা ইমামের নিকট পৌঁছেছে; কিন্তু তা তার কাছে বিভিন্ন কারণে নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়নি। যেমন– হয়ত হাদিসের রাবি ইমামের নিকট অজ্ঞাত বা কোন অভিযোগে অভিযুক্ত বা স্মৃতি শক্তিতে দুর্বল বা হাদিসটি তার কাছে মারফু অবস্থায় পৌঁছেনি বরং মুনকাতি অবস্থায় পৌঁছেছে, কিংবা হাদিসের মতন দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত ছিল না ইত্যাদি। পক্ষান্তরে হয়ত একই হাদিস অন্য ইমামের নিকট নির্ভরযোগ্য রাবি কর্তৃক মুত্তাসিল সনদে পৌঁছেছে বা অন্য কোন সনদে পৌঁছেছে বা এর স্বপক্ষীয় আরও এমন কিছু হাদিস পৌঁছেছে যার দ্বারা উক্ত হাদিস শুদ্ধ প্রমাণিত হয়। তাবিইন ও তাবি-তাবিইনদের মাঝে এরূপ ঘটনার সংখ্যা প্রচুর। এরূপ ক্ষেত্রে, যার নিকট হাদিসটি সঠিক পন্থায় পৌঁছেছে তিনি তা দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে যার নিকট দুর্বল সূত্রে পৌঁছেছে তিনি তা থেকে দলিল গ্রহণ করেননি। যেমন ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার আশংকায় হিজায, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ইমামগণ নিজের অঞ্চলে বাইরের অন্য অঞ্চলের হাদিস গ্রহণ করতেন না; যদি না তা তাদের নিজেদের অঞ্চলেও প্রচলিত না থাকত। কেননা এ বিষয়ে তারা হাদিস জাল হওয়ার আশংকা বোধ করতেন।

৩. কোন ইমাম খবরে ওয়াহিদের রাবিদের ব্যাপারে এমন কিছু শর্তারোপ করেন যা অন্যরা করেন না। ফলে উভয়ের মধ্যে উক্ত হাদিসের ভিত্তিতে দলিল গ্রহণ করা বিষয়ে মতভেদ হয়। যেমন– কেউ বলেন খবরে ওয়াহিদ কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক হতে হবে, রাবি ফকিহ হতে হবে ইত্যাদি।

৪. কিছু বিশেষ ধরনের হাদিস ব্যবহারে দলিল দেয়া কোন কোন ইমামের জন্য দোষণীয় নয়; পক্ষান্তরে অন্যদের নিকট তা দোষণীয়। ফলে তারা তা বর্জন করেন। যেমন– ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক মুরসাল হাদিস দ্বারা দলিল গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইমাম শাফিয়ি তা গ্রহণ করতেন না। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ দুর্বল হাদিস দ্বারাও দলিল গ্রহণ করতেন যা অধিকাংশ ইমাম করতেন না।

৫. মতভেদের এটাও একটা কারণ যে, হয়ত ঐ বিষয়ে কোন হাদিস ইমামের জানা ছিল; কিন্তু তিনি তা ভুলে গেছেন। ফলে তিনি তা দ্বারা দলিল গ্রহণ করেননি। যেমন– সফরে কোন ব্যক্তি নাপাক হলে এবং পানি না পাওয়া গেলে কীভাবে নিজেকে পবিত্র করবেন তা

২৫৮. ইবনে তাইমিয়া, *রাফউল মালাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

২৫৯ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

হযরত উমর রা. এর জানা ছিল; কিন্তু তিনি তা ভুলে যান। পরে হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির রা. তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেন। অনুরূপভাবে তিনি মোহরের পরিমাণ ধার্য করে দিতে চাইলে এক মহিলা তার সামনে কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করেন যা তার নিজেরও জানা ছিল। ফলে তিনি ঐ অনুযায়ী রায় দিলেন। একইভাবে সাহাবা আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. যখন বললেন, 'রাসুল সা. একটা উমরা করেছেন রজব মাসে।' তখন আয়িশা রা. বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবন উমর ব্যাপারটা ভুলে গেছেন।'[২৬০]

৬. রাসুলুল্লাহ সা.-এর কোন কাজের ধরন নির্ণয়ে পার্থক্যের কারণেও মতপার্থক্য হতে পারে; যা দ্বারা একই কাজকে কেউ মুবাহ আর কেউ সুন্নাহ মনে করতে পারে। যেমন– হজের সফরে রাসুলুল্লাহ সা. এর আবতাহ উপত্যকায় অবতরণ। একদল সাহাবা এটাকে ইবাদতের অংশ হিসেবে দেখেন আর অন্য দল বলেন যে তিনি ঘটনাক্রমে সেখানে অবতরণ করেছেন।

৭. মতপার্থক্যের আর একটা কারণ এটাও হতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট ইমাম হয়ত হাদিসটি জানেন; কিন্তু হাদিসের বক্তব্যের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করেন। যেমন– 'মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন কান্নাকাটি করলে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়।' আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. বর্ণিত এ হাদিস শুনে হযরত আয়িশা রা. এ হাদিসের প্রকৃত ব্যাপার তুলে ধরেন যা থেকে বুঝা যায় ইবন উমর হাদিসটির সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি।[২৬১]

৮. মতভেদের এটাও একটা কারণ যে, কোন হাদিস থেকে বিধান স্থির করার পিছনে কারণ কি ছিল তা নির্ধারণে কখনো কখনো মতানৈক্য হতো। যেমন– কফিন অতিক্রমকালে দাঁড়ানো সম্পর্কিত হাদিসে দাঁড়ানোর কারণ বর্ণনায় সাহাবাদের একাধিক ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়।

৯. কোন ইমাম কর্তৃক কোন কোন হাদিসের উপর আমল না করার এটাও একটা প্রসিদ্ধ কারণ যে, তার দৃষ্টিতে উক্ত হাদিস আলোচ্য সমস্যার সমাধানে কোন ইঙ্গিত বহন করে না বা এ আয়াত হাদিস থেকে সৃস্পষ্টভাবে এ বিদান আসে না। এ কারণের অধীনে আরো অনেকগুলো কারণ আছে যার সাথে আরবি ব্যাকরণের অনেক নিয়ম-কানুনও সংযুক্ত। আম ও খাস নির্ধারণ, কোন বস্তু থেকে বিপরীত বোধগম্য বিষয়কে দলিলরূপে গ্রহণ করা, কোন কারণভিত্তিক আম ঐ কারণের উপর সীমিত থাকা, কেবল আমর বা আদেশসূচক হলেই তা দ্বারা ওয়াজিব প্রতিষ্ঠা হওয়া বা না হওয়া ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত যা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। উসুলুল ফিকহের বিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোর প্রায় অর্ধেক এ শ্রেণির আওতাভুক্ত।[২৬২]

১০. এটাও মতপার্থক্যের অন্যতম কারণ যে, হয়ত কোন ইমাম কোন হাদিসের উপর আমল বর্জন করেন যেহেতু ঐ মাসাআলায় তার কাছে এর বিপক্ষে অন্য হাদিসের দলিল আছে। এক্ষেত্রে উক্ত বিরোধপূর্ণ হাদিসদ্বয়ের ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধানগত মতপার্থক্য তৈরি হয়। কেউ হয়ত একটাকে মূল ধরে আরেকটাকে তাবিল করেন। আবার কেউ হয়ত একটাকে

---

২৬০. *জামউল ফাওয়ায়িদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

২৬১ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

২৬২ প্রাগুক্ত।

মানসুখ আর অপরটাকে নাসিখ হিসেবে দেখেন ইত্যাদি। ফলে মতপার্থক্য অনিবার্য হয়ে পড়ে। মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে ইবন আব্বাস রা. এর মত বাকিদের বিপরীত হওয়ার কারণ এ শ্রেণিতে পড়ে। অনুরূপভাবে সালাতে রফউল ইয়াদাইন বিষয়ে হানাফি ও শাফিয়িদের মতপার্থক্যও এ বিষয়ের অধীন।[২৬৩]

১১. মুজতাহিদ ইমামগণের মতপার্থক্যের এটাও একটা অন্যতম কারণ যে, ইমাম তার প্রণীত উসুলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছান। এমতাবস্থায় উসুলের যৎসামান্য ভিন্নতায় বিদান আহরণের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা দেয়। যেমন– ইমাম মালিক মদিনাবাসীদের সম্মিলিত আমলকে হুজ্জাত হিসেবে গ্রহণ করায় এর বিপরীত অনেক সহিহ হাদিস তিনি বর্জন করেন। কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ ঐ বিষয়কে হুজ্জাত হিসেবে গ্রহণ না করায় তারা এ সমস্ত হাদিসের ভিত্তিতে দলিল গ্রহণ করেন।

এভাবে বিভিন্ন কারণে মুজতাহিদ ইমামদের ফিকহি সিদ্ধান্তে মতপার্থক্য সূচিত হয় যদিও এর প্রায় সবই হচ্ছে শারি'আহ আইনের শাখা-প্রশাখায়; মূল বিষয়গুলোতে নয়। এখানে যেটা সবেচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হলো, এসব মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকের ইজতিহাদকৃত বিষয়ই শারি'আহ আইনের মত। কেননা তারা প্রমাণিত ইসলামি পদ্ধতি ব্যবহার করেই এসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ বিষয়ে তাদের সঠিক হওয়া বা ভুল হওয়া নিচের হাদিসের অধীন–

'যখন হাকিম ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তখন সে দুটো সাওয়াব পায়, আর তার সিদ্ধান্ত ভুল হলে সে অন্তত একটা সাওয়াব পায়।'[২৬৪]

শারি'আহ আইনের স্থবির যুগ : হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শারি'আহ আইন চর্চায় এক ধরনের স্থবিরতার জন্ম নেয়। এ যুগে ব্যাপকভাবে ইজতিহাদ করা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং উলামা ও সাধারণ মানুষ সকলেই বিশিষ্ট ইমামদের ফিকহি চিন্তার অনুসরণ করার মাঝে নিজেদের প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। এ সময়ের ফিকহি আলোচনা নতুন কোন দিক-নির্দেশনা মূলক না হয়ে বরং পূর্ববর্তীদের রচিত গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও তাতে টিকা-টিপ্পনী সংযোজন এবং পূর্ববর্তী ইমামগণ কর্তৃক মাসআলা-মাসায়িলের বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও নিজি নিজ মাযহাবের সমর্থনে ও পক্ষে-বিপক্ষে মুনাযারা ও বাহাস-বিতর্কের মাঝেই আবর্তিত হতে থাকে। এ যুগে ফকিহগণ কদাচিৎ কোন সমস্যায় সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর দ্বারস্থ হতেন এবং স্বীয় মাযহাবের মধ্যেই উপস্থিত সমস্যার সমাধান খুঁজতেন। এ সময় তারা কুরআন-সুন্নাহর অধ্যয়নকে স্বীয় মাযহাবের পক্ষ সমর্থনকারী আয়াত-হাদিস অনুসন্ধানের মাঝে সীমিত করেন। ফলে আগত নতুন সমস্যার সমাধান মূল দুটো উৎস থেকে খোঁজার ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের যে শিক্ষা তা চাড়া পড়ে যায়। এভাবে এ যুগে ফিকহের মূল প্রাণশক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং কেবল অনুসরণ ও অনুসৃত বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পর্যবসিত হয়। তাই এ যুগে শারি'আহ আইনের স্থবিরতার যুগ। বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যক্তিত্ব ও তাদের কিছু অবদান ছাড়া এ যুগে শারি'আহ আইনের বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয়ে হিজরি সপ্তম শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত চলে এ যুগ।

---

২৬৩ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

২৬৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৫১৮, হাদিস নং ৬৮৫০

শারি‘আহ আইনের পতন যুগ : রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

‘শেষ যুগে আল্লাহতা‘আলা মানুষের কাছ থেকে এক টানে ইলম উঠিয়ে নিবেন না, বরং আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে যখন তিনি কোন আলিমই অবশিষ্ট রাখবেন না তখন লোকেরা অজ্ঞ জাহিলদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করবে।’[২৬৫]

স্থবিরতার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই শারি‘আহ আইন তার পতন যুগের দিকে এগিয়ে যায়। হিজরি সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এ যুগের সূচনা হয়। স্থবির যুগের প্রভাবে এ যুগে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা সম্পন্ন প্রজন্মই গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে এ যুগে এসে ইজতিহাদ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি মাসাআলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যে অনুশীলন তাও হারিয়ে যায়। শুরু হয় পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া খালিস তাকলিদের যুগ। এ যুগে বিভিন্ন মাসাআলায় পূর্ববর্তীদের ব্যবহৃত দলিল-প্রমাণ উল্লেখ না করেই সরাসরি সে সব মাসআলা লিপিবদ্ধ করার প্রচলন শুরু হয় এবং জনসাধারণের মাঝে তা প্রচারিত হয়। ফলে মূল উৎস থেকে শারি‘আহ আইন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইলমুল ফিকহ পরিণত হয় শুষ্ক আইনগ্রন্থে এবং এ সবের শিক্ষার মাধ্যমে এমন এক পঙ্গু প্রজন্ম তৈরি হয় যারা ফিকহের বিকাশে ছিল সম্পূর্ণ অক্ষম।

এ যুগের একদম প্রথমদিকে যদিও বিভিন্ন মাযহাবে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যাদের অনেকেই ছিলেন স্বাধীন ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন; কিন্তু স্থবিরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তা ভাঙ্গার জন্য এই গুটিকয়েক ব্যক্তিত্বের সাময়িক আবির্ভাব যথেষ্ট ছিল না। এদের মধ্যে হানাফি মাযহাবের কামাল ইবন হুমাম, জামালুদ্দিন যাইলায়ি; শাফিয়ি মাযহাবের ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম, তাকিউদ্দিন সুযুকি, জালালুদ্দিন সুয়ুতি; মালিকি মাযহাবের আল্লামা দাকিকুল ইদ ও হাম্বলি মাযহাবের আল্লামা ইমাম ইবন তাইমিয়া ও হাফিয ইবন কায়্যিম রহ. উল্লেখযোগ্য। তাদের প্রচেষ্টায় কিছুকালের জন্য ফিকহের প্রাণবন্ত চর্চা চলে। কিন্তু এর পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ থেকে পতন চলতেই থাকে। তথাপি এ পতন ইসলামের সীমারেখার মধ্যেই ছিল অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত ফিকহের অনুশীলনে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটেনি। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ থেকে পতন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, শারি‘আহ আইনকে অনৈসলামি আইনের সাথে মিশিয়ে ফেলা শুরু হয় এবং যৌথ অনুসরণ চলতে থাকে। এর যাত্রা শুরু হয় ১২৭৪ হিজরিতে যখন উসমানি খিলাফতের অধীনে হুদুদ আইনগুলো পরিবর্তন করে তৎপরিবর্তে উসমানি পেনাল কোর্ড ইস্যু করা হয়। অতঃপর ১২৭৬ হিজরিতে অধিকার ও বাণিজ্য সম্পর্কিত আইন পাশ করা হয়। এভাবে ইসলামি উৎস ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে আইন গ্রহণ করা চলতে থাকে যার মধ্য দিয়ে ফিকহের তথা শারি‘আহ আইনশাস্ত্রের চরম অধঃপতন সূচিত হয়।

শারি‘আহ আইনের সাথে অনৈসলামি উৎস থেকে আগত এসব আইনের মিশ্রণ চলতে থাকে উসমানি খিলাফতের শেষ তথা ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। অবশেষে ১৯২৪ সালে ইসমানি খিলাফত ব্যবস্থার পতনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আবির্ভাবের ফলে শারি‘আহ আইন পুরোপুরি রাষ্ট্র ও

২৬৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ১৮৫, হাদিস নং ৬৫৫২

সমাজ থেকে আলাদ হয়ে যায় এবং মুসলিম ভূমিগুলো অনৈসলামি আইনের ভিত্তিতে শাসিত হতে শুরু করে– যার মাধ্যমে শারি'আহ আইনের চূড়ান্ত অধঃপতন সম্পূর্ণ হয়। সেই অধঃপতনের ধারাবাহিকতা পরবর্তী সময়ে আরও প্রকট রূপ ধারণ করে চলে আসছে আজ পর্যন্ত।

শারি'আহ আইন পুনরুজ্জীবিত করার উপায় : রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

تفقهوا قبل أن تسودوا.

'তোমরা নেতৃত্ব লাভ করার পূর্বেই ফিকহি জ্ঞান অর্জন করে নাও।'[২৬৬]

যেহেতু ফিকহ হচ্ছে বাস্তব জীবন পরিচালনার আইন-কানুন সম্পর্কিত জ্ঞান। অতএব জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে কখনোই এর পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়; বরং এই বিচ্ছিন্নতাই ফিকহের বর্তমান দুরবস্থার কারণ। বাস্তব জীবন পরিচালনায় যতবেশি শারি'আহ আইন অনুশীলিত হবে ততই প্রয়োজনের তাগিদে এর বিকাশ ঘটতে থাকবে। তাই জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রে শারি'আহ আইনের প্রয়োগই শারি'আহ আইনকে পুনরুজ্জীবিত করার একমাত্র পথ। বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র শারি'আহ আইন দিয়ে পরিচালিত না হওয়ায় উম্মাহর মাঝে ফিকহ জানার কোন চাহিদা নেই। কেননা এই সম্পর্কিত কোন জ্ঞান ছাড়াই বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে তার সকল প্রয়োজন মেটাতে পারে। কিন্তু শারি'আহ আইন দ্বারা পরিচালিত একটা সমাজে জনগণ স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদেই ফিকহ চর্চায় বাধ্য হবে, যুগের নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে মূল উৎসগুলোর দ্বারস্থ হবে, ইজতিহাদের চাকাকে সচল রাখবে আর এভাবেই শারি'আহ আবার জীবন্ত হয়ে উঠবে।

এজন্য প্রথমে প্রয়োজন এমন একটা দল যারা বিশুদ্ধ চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, যাদের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতি ফিকহের সঠিক চর্চার মাধ্যমে গৃহীত, যারা নিজ দলের অভ্যন্তরে এই সম্পর্কে সঠিক চিন্তার শিক্ষা দেয় এবং উম্মাহর মাঝেও এই চিন্তাকে ছড়িয়ে দেয়। একই সাথে এ দলটি উম্মাহকে এমনই একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে আহ্বান জানায় যেখানে সবকিছু পরিচালিত হবে শারি'আহ আইন তথা ফিকহ চর্চার মাধ্যমে– যাতে করে উম্মাহ ফিকহের বাস্তব উপযোগিতা বুঝতে পারে। এ আহ্বান এবং এর ভিত্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে যখন সে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তখন নতুন যুগে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমুখী চাহিদা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করার প্রয়োজনে ফিকহ চর্চায় আবারও গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা হবে।

বিস্তারিত আলোচনার পর এ কথা বলা যায় যে, শারি'আহ আইনের উৎপত্তির প্রথম যুগ হল, রাসুলুল্লাহ সা.-এর মুবারক যুগ। এ যুগের পরিব্যাপ্তি হল তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে দশম হিজরি সন পর্যন্ত। দ্বিতীয় যুগ হল, কিবারে সাহাবায়ে কিরামের যুগ। এ যুগ খুলাফায়ে রাশিদিনের সমাপ্তি লগ্নে এসে শেষ হয়েছে। তৃতীয় যুগ হল, সিগারে সাহাবা ও তাবি'ইনে কিরামের যুগ। এ যুগ খুলাফায়ে রাশিদিনের সমাপ্তিকালের পর থেকে শুরু হয়ে হিজরি প্রথম শতকের শেষ সময় পর্যন্ত অথবা দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। চতুর্থ যুগ হল, শারি'আহ আইন সংকলন, সম্পাদন ও ইজতিহাদের যুগ এবং ইলমে ফিকাহ স্বতন্ত্র এক বিজ্ঞান রূপ পরিগ্রহ করার যুগ। এ যুগ হিজরি তৃতীয় শতকের শেষ লগ্ন অথবা চতুর্থ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। পঞ্চম যুগ হল,

---

২৬৬. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫৮, হাদিস নং ৭১-৭২

শারি‘আহ আইন সংকলনের ও সম্পাদনের পূর্ণাঙ্গতার ও তাকলিদের যুগ এবং ইলমে ফিকাহ মুনাযারার বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ। এ যুগ আব্বাসীয় খিলাফতের যবনিকাপাত হওয়া এবং বাগদাদে তাতারিদের লোমহর্ষক আক্রমণ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এ যুগের বিস্তৃতি। ষষ্ঠ যুগ হল, খালিস তাকলিদের যুগ। সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এ যুগের সূচনা হয় এবং মূলত এ যুগে ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া স্থিমিত হয়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট লোক সকলেরই ইমামগণের তাকলিদ করতে হয়। এ অবস্থা বর্তমানেও অব্যাহত আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যবসা-বাণিজ্যে শারি‘আহ-এর নীতিমালা

ব্যবসা-বাণিজ্য সমাজের সকল মানুষেরই নিকট অতি পরিচিত একটি বিনিময় প্রক্রিয়া। নিজের পণ্যদ্রব্যকে অপরের পণ্যদ্রব্যের সাথে পারস্পরিক সদিচ্ছা ও আগ্রহের ভিত্তিতে বিনিময় করে নেয়াই হলো ব্যবসা। দ্রব্য বিনিময় প্রথা হিসেবে প্রাচীনকালে একটি পণ্যের বিনিময়ে আরেকটি পণ্য গ্রহণ করা হত। আধুনিক কালে মুদ্রা প্রবর্তিত হওয়ায় মুদ্রার বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। সুতরাং লাভের আশায় লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে মুদ্রার বিনিময়ে মাল ক্রয়-বিক্রয় করাকেই ব্যবসা বলে।

ইংরেজিতে যাকে বলা হয়, ‘Business is the exchange of goods, services, or money for mutual benefit of profit.’[২৬৭]

কেউ কেউ এভাবেও বলেছেন, ‘Business is any enterprise, which distributes or provides any article or service which other members of the community need and are able and willing to pay for it. In essence, therefore, business concerns with producing and selling for profit.’[২৬৮]

ইসলামি মূলনীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি থাকতে হবে এবং উভয় পক্ষের সম্মতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পাদিত হতে হবে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণে ব্যবসা-বাণিজ্য : মানুষ তার জীবন যাপন, জীবন নির্বাহ, জীবনের উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন এবং সমাজ পরিচালনা ও মানবকল্যাণের জন্য যা কিছু করে, যদি তা আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধান মত করে তাহলে তা সবই ইবাদত। একইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উপার্জনও ইবাদত, যদি তা পরিচালিত হয় শারি‘আহর নীতিমালা অনুযায়ী। ব্যবসা-বাণিজ্য ইবাদত হওয়ার শর্ত হলো–

(ক) অর্থ-সম্পদের মূল মালিক মানতে হবে আল্লাহকে, নিজেকে মনে করতে হবে রক্ষক ও আমানতদার। সুতরাং আয় ও ব্যয় করতে হবে মালিকের ইচ্ছা মুতাবিক।

(খ) ইবাদতের তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

(গ) আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা. কর্তৃক নিষেধ করা পণ্যের ব্যবসা করা যাবে না।

(ঘ) আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা. কর্তৃক নিষেধ করা নিয়ম-পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবে না।

(ঙ) সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার, বিশ্বস্ততা ও মানবকল্যাণ হতে হবে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদর্শ।[২৬৯]

---

২৬৭ Wayne L. McNaughton, *Introduction to Business Enterprise*(San Francisco : John Wiley & Sons Inc; ed. 2, April 1970), p. 10

২৬৮ Lyndall F. Urwick, *The Elements of Administration*(New York : Harper & Brothers, 1943), p. 35

২৬৯ আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনূঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. ৩৩০

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য : মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি-বাকরি ও শ্রমের মাধ্যমে যে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে সেটাকে আল্লাহতা'আলা পবিত্র কুরআনে আল্লাহর অনুগ্রহ বলে অভিহিত করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝাতে কুরআনে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। এক পরিসংখ্যন মতে শব্দটি ৩৭০ বার এসেছে ২০টি ধরনে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা এসেছে−

১. '(এভাবে তোমার প্রতিপালক জানেন) কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।'[২৭০]

২. 'সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[২৭১]

৩. 'সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না।'[২৭২]

৪. 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।'[২৭৩]

হাদিসের দৃষ্টিকোণে ব্যবসা-বাণিজ্য : মহানবী সা. ব্যবসায় ও শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করা এবং উপার্জনকারীদের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি নিজেও একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। তার ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। ব্যবসায়িক সাফল্য ও সুনামের মাধ্যমে তার আদর্শ ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক নেতৃত্ব বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তিনি কেবল সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীই ছিলেন না; বরং সে সাথে তিনি ছিলেন সুদক্ষ ব্যবসায়ী। তিনি বলেন,

১. 'সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দিক ও শহিদদের সাথে থাকবে।'[২৭৪]

২. 'মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো তার হাতের উপার্জন।'[২৭৫]

৩. 'বিশ্বস্ত সত্যাশ্রয়ী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথী হবে।'[২৭৬]

৪. 'সর্বোত্তম উপার্জন হলো আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় ব্যবসা করা এবং গায়ে খেটে উপার্জন করা।'[২৭৭]

ব্যবসা-বাণিজ্যে শারি'আহর নীতিমালা : ব্যবসা-বাণিজ্যে কুরআন ও সুন্নাহতে সেসব নীতিমালা ঘোষিত হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ−

১. আল্লাহতা'আলা কুরআনে সর্বপ্রকার সুদভিত্তিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করেছেন।[২৭৮]

---

২৭০. আল-কুরআন, ৭৩ : ২০

২৭১. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

২৭২. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৭

২৭৩. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

২৭৪. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৪৯৬, হাদিস নং ১২১২

২৭৫. ইমাম আবু আবদির রহমান আন-নাসাই, অনূঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, *সুনানু নাসাঈ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০৮), খ.৪, পৃ. ২৮১, হাদিস নং ৪৪৫০

২৭৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*(ঢাকা : ইফাবা, জুলাই ২০১৪), খ. ২, পৃ. ২৭৮, হাদিস নং ২১৩৯

২৭৭. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৭, হাদিস নং ২১৩৭

২. বিনিময় ও সমঝোতা ছাড়া কারো মাল হস্তগত করা যাবে না। যেমন আল্লাহতা'আলা বলেন– 'হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজি হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ।'[২৭৯]

৩. ওজন ও পরিমাপে কম-বেশি করা নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহতা'আলা বলেছেন– 'দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহাদিবসে?'[২৮০]

৪. যে কোন প্রকার অশ্লীলতা প্রসারকারী ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ। অর্থাৎ সে সব উপায়ে উপার্জন করা নিষিদ্ধ, যেগুলো সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছড়ায়। যেমন আল্লাহর বাণী– 'যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মান্তুদ শাস্তি।'[২৮১]

৫. মাদক ও মাদক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ।[২৮২]

৬. চাঁদাবাজি, দূর্নীতি, লুণ্ঠন, আত্মসাৎ ও জবরদখল নিষিদ্ধ। আল্লাহতা'আলা বলেন– 'কেহ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে তাহা নিয়ে আসবে।'[২৮৩]

৭. ভেজাল ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ। আল্লাহতা'আলা বলেন– 'লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না।'[২৮৪]

৮. ঘুষের আদান-প্রদান শারি'আহতে নিষিদ্ধ।

৯. ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার করা অবৈধ।

১০. অপচয় করা যাবে না। কেননা, কুরআন মাজিদে অপচয়কারীদের শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। আল্লাহতা'আলা বলেন– 'যারা অপব্যয় করে তারা তো শয়তানের ভাই।'[২৮৫]

১১. যে কোন অবৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ অবৈধ।

১২. মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া যাবে না– এটা অন্যায়।[২৮৬]

১৩. প্রতারণামূলক দালালির মাধ্যমে উচ্চ মূল্যে দ্রব্য বিক্রি ইসলামে নিষিদ্ধ।[২৮৭]

১৪. মিথ্যা-প্রতারণামূরক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক ফায়দা হাসিল নিষিদ্ধ।[২৮৮]

১৫. মিথ্যা শপথের মাধ্যমে বিক্রয় করা অবৈধ।

---

২৭৮. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫
২৭৯. আল-কুরআন, ৪ : ২৯
২৮০. আল-কুরআন, ৮৩ : ১-৫
২৮১. আল-কুরআন, ২৪ : ১৯
২৮২. আল-কুরআন, ৫ : ৯০
২৮৩. আল-কুরআন, ৩ : ১৬১
২৮৪. আল-কুরআন, ২৬ : ১৮৩
২৮৫. আল-কুরআন, ১৭ : ২৭
২৮৬ আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১
২৮৭ প্রাগুক্ত।
২৮৮. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫১২, হাদিস নং ১২৩৩

১৬. বিক্রিত মালামালের দোষ-ক্রুটি গোপন করা অনৈতিক কাজ।[২৮৯]

১৭. বিভিন্ন কৌশলে ভ্যাট ও রাজস্ব ফাঁকি দেয়া অবৈধ।

১৮. ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি লিখিত ও সাক্ষ্যযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।[২৯০]

১৯. কারো সম্পদে যুলুম করা যাবে না।[২৯১]

২০. হারাম জিনিসের ব্যবসা নিষিদ্ধ। মহানবী সা. বলেন– 'আল্লাহ যখন কোন জিনিসকে হারাম করেন তখন তার ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম করেন।'[২৯২]

২১. মজুদদারির মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়ানো ইসলামে নিষিদ্ধ।[২৯৩]

২২. ধোঁকা-প্রতারণা নিষিদ্ধ। মহানবী সা. বলেন– 'কেউ যখন কোন মাল বিক্রয় করবে তখন সে যেন মালের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ দেয়। মালের কোন ক্রুটি গোপন রাখা তার জন্য বৈধ নয়।' তিনি আরো বলেন– 'যে প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।'[২৯৪]

২৩. চোরাই মাল ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

২৪. ব্যবসায়ের শর্ত ও চুক্তি ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ।

২৫. অনিশ্চিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

২৬. যৌথ কারবারে অবিশ্বস্ততা ও খিয়ানত জঘন্য অপরাধ।[২৯৫]

২৭. পণ্য হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ।[২৯৬]

বস্তুত ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যার রয়েছে স্বতন্ত্র শারি'আহ আইন। আর ইসলাম হচ্ছে আল্লাহতা'আলার মনোনীত দীন, যার বিভিন্ন বিধান রাসুলুল্লাহ সা. এর উপর বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। সেখানে রয়েছে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিমালা। অতএব ব্যবসা-বাণিজ্যেও শারি'আহ-এর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে শারি'আহর উপরোক্ত নীতিমালা সম্পর্কে সকল ব্যবসায়ী ও ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সকল জনগোষ্ঠীর অবগত হওয়া ও অনুসরণে আন্তরিক প্রয়াসী হওয়া বাঞ্চনীয়।

---

২৮৯. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫৮৪, হাদিস নং ১৩১৮

২৯০. আল-কুরআন, ২ : ২৮২-২৮৩

২৯১. আল-কুরআন, ৪ : ১০

২৯২. ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান, অনূঃ ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবু দাঊদ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৪), খ.৪, পৃ. ৪০৯, হাদিস নং ৩৪৫২

২৯৩. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫৪৬, হাদিস নং ১২৭০

২৯৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৪৩, হাদিস নং ১৮৫

২৯৫. ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান, *আবু দাঊদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৬৮-৩৬৯, হাদিস নং ৩৩৫০

২৯৬. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০৭, হাদিস নং ২২২৬, ২২২৭

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ নীতিমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	রিবা-এর শারই‘ দৃষ্টিকোণ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	আমানত সংগ্রহ ও মুনাফা বণ্টনে শারি‘আহ-এর নীতিমালা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বিনিয়োগ পদ্ধতিতে শারি‘আহ-এর নীতিমালা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	শারি‘আহ নীতিমালা তদারকি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

পঞ্চম অধ্যায়
ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ নীতিমালা
প্রথম পরিচ্ছেদ
রিবা-এর শারঈ‘ দৃষ্টিকোণ

প্রতিটি মানুষই কোন না কোন উৎপাদনের উপকরণের মালিক। যেমন– শ্রমিক শ্রমশক্তির মালিক, পুঁজিপতি পুঁজির মালিক, ভূস্বামী ভূমির মালিক ইত্যাদি। মানুষ তার মালিকানাধীন উপকরণ বিক্রি করে যে অর্থ পায় তা-ই তার আয়। যেমন– শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে মজুরি পায়, ভূস্বামী ভূমি ভাড়া দিয়ে খাজনা পায়, পুঁজিপতি তার পুঁজি বিনিয়োগ করে, ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জন করে অথবা তার পুঁজি ধার দিয়ে গতানুগতিক অর্থনীতিতে সুদ পায়, তেমনি উদ্যোক্তার আয় হচ্ছে মুনাফা।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যেসব উপকরণের ব্যবহার হয় তার মধ্যে কতকগুলো স্থির এবং কতকগুলো পরিবর্তনশীল। সনাতন গতানুগতিক অর্থনীতিতে উপকরণগুলোকে মোট চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন– ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। শেষোক্ত উপাদানটিকে অধুনা উদ্যোগ হিসাবেও আখ্যায়িত করা হচ্ছে। উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা থেকে প্রত্যেকটি উপকরণ তাদের প্রাপ্য অংশ পেয়ে থাকে।

ইসলামি অর্থনীতিতে এরূপ শ্রেণীবিভাগ হুবহু গ্রহণ করা হয় না। এর পিছনে যে কারণটা কাজ করে তাহলো মূলধনের প্রাপ্য, সনাতন অর্থনীতিতে সুদ নামে পরিচিত। এ সুদ বা রিবা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, পুরোপুরি অবৈধ; হারাম। সুদ মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু। সুদ শোষণ ও যুলুমের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা অন্যায় ও অমানবিক ব্যবস্থা। পুঁজিগঠন, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের গতিকে শ্লথ করে দিয়ে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের হাতিয়ার হয়ে সুদ সমাজের ভিতরে ও বাইরে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। সুদ প্রথার উপরই পুঁজিবাদ দন্ডায়মান। এ জন্যই ইসলাম সুদ বা রিবা হারাম করে পুঁজিবাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। বলাবাহুল্য রিবা বন্ধ করা বিশ্বসভ্যতায় পবিত্র কুরআনের এক মহান অবদান।[১] রিবামুক্ত অর্থনীতি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের পূর্বশর্ত। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক সুদ সন্দেহাতীতভাবে হারাম। ইসলামি শারি'আতে হারাম ঘোষিত কাজের মধ্যে সুদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সবচেয়ে বেশি কঠোর। রিবার ব্যাপারে ইসলামের এ অবস্থান একটা স্বতন্ত্র আর্থ-সামাজিক দর্শনের নির্দেশক।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন রিবা-এর কোন সংজ্ঞা প্রদান করেনি। এটা শুধু এ কারণে যে, আল-কুরআন যাদের সম্বোধন করেছে তারা সুদের সাথে অতি পরিচিত ছিল। তারা সকলেই জানত সুদ কি। শুকরের মাংস, মদ, জুয়া, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা ছাড়াই এসব হারাম করা হয়েছে; কারণ এসব পরিভাষা সকলের নিকট সুপরিচিত ছিল এবং কোনটি দ্বারা কোন জিনিস বা কাজ বুঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা ছিল না। রিবার ব্যাপারেও একই অবস্থা ছিল। ‘রিবা’ পরিভাষা আরববাসীর নিকট মোটেই অপরিচিত ছিল না। তারা পারস্পরিক লেনদেনের

---

১. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*(ঢাকা : ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৬৯), পৃ. ২০

ক্ষেত্রে সর্বদাই এ শব্দ ব্যবহার করত। শুধু আরববাসী নয়; বরং পূর্ববর্তী সকল সমাজেই মানুষ তাদের আর্থিক লেনদেনে রিবা নিত এবং দিত। রিবার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে কারও মধ্যেই কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তি ছিল না।

রিবার আভিধানিক অর্থ

'রিবা' আরবি শব্দ; সুদের আরবি পরিভাষা হচ্ছে রিবা (ربا)। আরবি রিবা শব্দকে উর্দু ও ফারসিতে সুদ বলে। বাংলা ভাষায় সুদ শব্দটি রিবার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সুদকে ব্যবহারিক অর্থে বাংলায় কুসিদও বলা হয়। ইংরেজিতে যাকে Interest বা Usury বলা হয় রিবার অর্থও ঠিক তাই। পবিত্র কুরআনেও রিবা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। Interest শব্দের উৎপত্তি মধ্যযুগীয় ল্যাটিন শব্দ Interesse থেকে। এর অর্থ ঋণ দিয়ে আসলের উপর বেশি গ্রহণ করা। Usury ল্যাটিন শব্দ; Usura থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।[২] Usura অর্থ হচ্ছে প্রদত্ত ঋণ থেকে অর্জিত উপভোগ; ক্যানন ল'তে এর মানে হচ্ছে অর্থ ধার দিয়ে তার বিনিময়ে আসল পাওনার উপর অতিরিক্ত গ্রহণ করা।[৩] অর্থাৎ ঋণ দিয়ে আসলের বেশি নেয়া। Encyclopedia of Religions and Ethics-এ বলা হয়েছে Usury ও Interest শব্দ দুটো এক ও অভিন্ন অর্থে অতীতে ব্যবহৃত হত।[৪]

কুরআন ও সুন্নাহ'য় ব্যবহৃত রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রবৃদ্ধি (Growth), পরিবৃদ্ধি, পরিবর্ধন, পরিবর্ধক, সম্প্রসারণ (Expansion), স্ফীতি, আধিক্য, উদ্বৃত্ত (Surplus), বৃদ্ধি (Increase), বিকাশ, অতিরিক্ত (Excess) বা বেশি হওয়া (Additional), মূল থেকে বেড়ে যাওয়া, উঁচু হওয়া, ফুলে উঠা, লাভ (gain), বহুগুণ হওয়া, ছাড়িয়ে যাওয়া, পাওনার চেয়ে বেশি নেয়া, বিকাশ ঘটা ইত্যাদি।[৫] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. লিখেছেন, কুরআন মাজিদে সুদের প্রতিশব্দ হিসেবে 'রিবা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূলে আছে আরবি ভাষায় (ر ب و) তিনটি হরফ। এর অর্থের মধ্যে বেশি, বৃদ্ধি, বিকাশ; চড়া প্রভৃতি ভাব নিহিত।[৬] সুপরিচিত আরবি অভিধান লিসানুল আরব রিবার শাব্দিক অর্থ লিখেছে, 'বৃদ্ধি, বাড়তি, অতিরিক্ত, সম্প্রসারণ বা প্রবৃদ্ধি।[৭] আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানি লিখেছেন, রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রবৃদ্ধি, বেশি, স্ফীত, ক্রমশ: বড় হওয়া, কয়েকগুণ বেশি হওয়া, আসলের বাড়তি ও বৃদ্ধি হওয়া, বিনিময় ছাড়া বৃদ্ধি ইত্যাদি।[৮] তাফসিরকার ও ফিকাহবিদগণ রিবার অর্থ করেছেন অতিরিক্ত, বৃদ্ধি (excess), বিনিময়হীন বৃদ্ধি (excess without counter value), অপরদিকে বৃদ্ধি ছাড়াই একদিকে বৃদ্ধি ইত্যাদি। বিশিষ্ট কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেছেন, প্রতিমূল্য

---

২. ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশি, *ইসলাম এন্ড দি থিওরি অব ইন্টারেস্ট*(লাহোর : আশরাফ পাবলিকেশন্স, ১৯৯১), পৃ. ২

৩. H. Harvey Cohn, *Usury : Encyclopedia Judaica*(Jerusalem : Keter Publishing, 2000), p. 17; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কোরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৪. Board of Editors, *Riba, Usury and Interest-Historical and Quranic concept*, (Karachi : The International Association of Islamic Bank, Journal of Islamic Banking and Finance, Oct-Dec, 1993), p. 44

৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনু. আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, *সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৮৪

৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৭. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.১৯ পৃ. ১৭; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯

৮. আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানি, *আল মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

(counter value) নেই এমন প্রতিটি বৃদ্ধিই হচ্ছে রিবা।[৯] ড. এম. উমর চাপরা লিখেছেন, 'রিবার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি (Increase), অতিরিক্ত (Addition), সম্প্রসারণ (Expansion) বা প্রবৃদ্ধি (Growth)।[১০] আল্লামা মুহাম্মাদ আসাদের মতে, 'ভাষাগত দিক থেকে রিবা শব্দ দ্বারা কোন জিনিসের মূল আয়তন বা পরিমাপের উপরে বেশি হওয়া (Addition) বা বৃদ্ধিকে (Increase) বুঝায়।[১১] ড. এম.এ. মান্নান লিখেছেন, রিবার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া বা প্রবৃদ্ধি।[১২] কিন্তু কুরআনে যেকোনো প্রবৃদ্ধিকে রিবা বলা হয়নি। এর দ্বারা সুনির্দিষ্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকে বুঝানো হয়েছে। রিবা শব্দটি আল (ال) প্রত্যয়যোগে এমন এক লেনদেনকে বুঝানো হয়েছে যা কুরআন নাযিলের সময় আরব ও অন্যান্য জাতির কাছে সুপরিচিত ছিল। তাই কুরআনে রিবা শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে 'আল' প্রত্যয় ব্যবহার করে। এ লেনদেন করা হত দুভাবে– (১) ঋণের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এ শর্তে, বিদ্যমান অথবা বকেয়া পড়েছে এমন ঋণ পরিপক্কতার নতুন সময় নির্ধারণ বা ঋণ ফেরত বিলম্বিতকরণ; (২) কোন ঋণ নির্ধারিত সময়ের পর বৃদ্ধিসহ ফেরত প্রদান।[১৩]

অন্য কথায় ইসলামে সকল বৃদ্ধিকেই 'রিবা' বলা হয়নি। এক বিশেষ অর্থে ইসলামে 'রিবা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামে ঐ বৃদ্ধিকে 'রিবা ' বলা হয় যা প্রদত্ত ঋণের উপর ঋণের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত কিছু আকারে বা কোন সুবিধা ধার্য করে আদায় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বা ঋণের বিনিময়ে পূর্ব নির্ধারিত হারে বা নির্ধারিত না থাকলেও প্রদত্ত ঋণের অধিক অর্থ বা সুবিধা আদায় করলে এবং সামগ্রীর ক্ষেত্রে সমজাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশি পরিমাণ নেয়া হলে অর্থ বা পণ্যের ঐ অতিরিক্ত অংশকে রিবা (ربو) বা সুদ (سود) বলা হয়। সুদের ফলে ঋণের আসল পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সময়ের অনুপাতে আসল বৃদ্ধির পরিমাণ বা হার নির্ধারিত হয়। সুতরাং রিবা, সুদ, ইন্টারেস্ট, ইউজারি ইত্যাদি সকল শব্দের অর্থ এক ও অভিন্ন। আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন। সুদ মানবতার জন্য এক চরম অভিশাপ, অর্থনৈতিক শোষণের এক জঘন্য হাতিয়ার। সুদি ব্যবস্থা অর্থনীতিকে ভারসাম্যহীন করে। মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করে। এ জন্যই সকল মানুষের স্রষ্টা মহান রব্বুল আলামিন সুদকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছেন। সকল নবী-রাসুলই সুদি ব্যবস্থার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং এর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন।

রিবার পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইসলামি পরিভাষায় সুদকে রিবা বলা হয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন 'রিবা'র কোন সংজ্ঞা দেয়নি। এটা শুধু এ কারণে যে, কুরআন যাদের সম্বোধন করে নাযিল হয়েছে তারা রিবা বা সুদের সাথে ছিল অতি পরিচিত। সুদ কি তা তারা সকলেই জানত। তাদের কাছে সুদের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল। রিবা পরিভাষাটি আরববাসীর কাছে মোটেই অপরিচিত ছিল না। তাদের পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদের প্রচলন

---

৯. আল সারাখসি, *আল মাবসুত*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১০৯

১০. ড. এম. উমর চাপরা, *Towards a Just Monetary System*(Leicester : The Islamic Foundationb, 1995), p. 56; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১১. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১২. ড. এম.এ. মান্নান, অনূঃ আলী আহমেদ রুশদী, *ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*(ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩), ৯৭

১৩. ড. মনজের কাহফ, অনূঃ মাসুম বিল্লাহ, *মাকাসিদে শরী'আহ : আধুনিক ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থায় প্রয়োগ*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, ইসলামী ব্যাংকিং, সেপ্টেম্বর ২০১৫), পৃ, ৯

ছিল এবং তারা সর্বদাই এ শব্দ ব্যবহার করত। তদানীন্তন আরববাসীদের মধ্যে রিবা পরিভাষা নিয়ে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি ছিল না। শুধু আরববাসী নয়; পূর্ববর্তী সকল সমাজেই মানুষ তাদের আর্থিক লেনদেনে রিবা গ্রহণ করত এবং প্রদান করত। রিবার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে কারও মধ্যেই কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তি ছিল না।[১৪]

পারিভাষিক অর্থে আরবরা রিবা বলত এমন বর্ধিত অংকের আদায়কে, যা ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে একটি ধার্যকৃত হারে মূল অর্থের বা পুঁজির অতিরিক্ত হিসেবে আদায় করত।

প্রচলিত অর্থনীতিতে সুদকে বলা হয়েছে ‘পুজির মূল্য’। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অবদানের জন্য পুঁজিকে দেয় পারিতোষিক। রিবার পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে ঋণ দিয়ে আসলের উপর বেশি নেওয়া। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পরে যদি ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উপরে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয় তবে আদায়কৃত ঐ অতিরিক্ত অর্থকে সুদ বলা হয়।

সুদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ঋণ দেয়া মূল অর্থ যা-ই উৎপন্ন করুক না কেন তার বিচার না করে ঐ ঋণের উপর পূর্ব নির্ধারিত পরিশোধিতব্য অর্থই হল সুদ। অন্যকথায় ঋণের উপর ঋণের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত কিছু লেনদেন করা হলে সে অতিরিক্তকে বলা হয় রিবা বা সুদ।

রিবার সংজ্ঞায় ‘আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (স.) বলেছেন,

كل قرض جر منفعة فهو ربا

‘যে ঋণ কোন মুনাফা টানে তাই রিবা (সুদ)।[১৫]

আলি রা. আরও বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী সা. বলেছেন ‘লাভ (অতিরিক্ত) বহনকারী প্রত্যেক ঋণই রিবা। হারিস ইবন আবি উসামাহ তার মুসনাদে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[১৬]

উসামা ইবন যায়িদ রা. থেকে বর্ণিত মহানবী সা. বলেছেন, ‘প্রতীক্ষাতেই রিবা রয়েছে ...।[১৭] সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিমযে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ আদান-প্রদান করলে তা সমান সমান ও হাতে হাতে হতে হবে। অর্থাৎ নগদ হতে হবে। বেশ-কম করলে, তা সুদি লেনদেন বলে গণ্য হবে। এতে দাতা-গ্রহীতা সমান অপরাধী হবে।[১৮]

‘আল্লামা ইবনুল আরাবির মতে, ‘রিবার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি। কুরআন মাজিদে ঐ বৃদ্ধিকে রিবা বলা হয়েছে; যার বিপরীতে কোন বিনিময় নেই।[১৯] প্রখ্যাত তাফসিরকারক ইমাম ফখরুদ্দিন আল রাযির মতে, ‘জাহিলেয়াতের যুগে আরববাসী সকলেরই রিবা সম্বন্ধে জানা ছিল এবং তাদের মধ্যে এটা বহুল প্রচলিত ছিল। সে যুগেও তারা প্রথাসিদ্ধভাবে ঋণ দিত এবং শর্ত অনুসারে তার উপর মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করত; কিন্তু আসলের পরিমাণ থাকত অপরিবর্তিত। যখন ঋণের

১৪. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৩

১৫. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৫), পৃ. ৭০

১৬. জালাল উদ্দিন আল সুয়ুতি, *জামে আল সগির*(মদিনা মুনাওয়ারা : শারিকাতু আলফা, ২০০৮), খ.২, পৃ. ৯৪

১৭. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৯৯-১০০; হাদিস নং ৩৯৪৩

১৮. প্রাগুক্ত।

১৯. الربا في اللغة الزيادة والمراد في الآية كل زيادة لا يقابلها عوض দ্র. আল্লামা ইবনুল আরাবি, *আহকামুল কুরআন*(কায়রো : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৩), পৃ. ২৪২

মেয়াদ শেষ হত এবং ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হত তখন সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে পরিশোধের সময়ও বাড়িয়ে দেয়া হত।[২০]

'আল্লামা আবু বাকর আল যাসসাস-এর মতে, 'একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদেয় ঋণের পূর্বশর্ত অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আসলের অতিরিক্ত যে অর্থ আদায় করা হয় তা-ই হচ্ছে সুদ।'[২১]

'আল মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা' গ্রন্থে সুদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'শারি'আহ সম্মত বিনিময় ব্যতীত চুক্তির শর্তানুযায়ী যে অতিরিক্ত মাল আদায় করা হয় তাকে সুদ বলে।'[২২]

হানাফি মাযহাবে রিবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'রিবা হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিমূল্যের উপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত যার কোন প্রতিমূল্য নেই।'[২৩]

হানাফি মাযহাবের প্রখ্যাত ফকিহ ইমাম সারাখসি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'শারি'আতে রিবা হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ে দু'টি প্রতিমূল্যের কোন একটার উপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত যার কোন বিনিময় মূল্য নেই।'[২৪]

'আল্লামা ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানির মতে, 'রিবার পরিভাষিক অর্থ হচ্ছে একদিক দিয়ে বৃদ্ধি পাওয়া; অন্যদিক দিয়ে নয়। ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণের শর্ত হিসেবে বা ফেরতের মেয়াদ বৃদ্ধির বিনিময়ে মূল পরিমাণের অতিরিক্ত যা-ই গ্রহণ করা হয় তাই রিবা।'[২৫]

সানাউল্লাহ পানপথির মতে, প্রদত্ত ঋণের মূলের চেয়ে বেশি গ্রহণ করাই রিবা।[২৬]

সাইয়িদ আমিমুল ইহসানের মতে, চুক্তিবদ্ধ দু'পক্ষের যে কোন এক পক্ষ কর্তৃক পারস্পরিক লেনদেনে শারি'আহ সম্মত বিনিময় ব্যতীত শর্ত মুতাবিক যে অতিরিক্ত আদায় করা হয় তাকে সুদ বলা হয়।[২৭]

ফাতওয়ায়ে আলমগিরিতে সুদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'ইসলামি শারি'আহতে ঐ মালকে সুদ বলা হয় যা মালের পরিবর্তে মালের লেনদেনকালে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে প্রদান করা হয়, যার কোন বিনিময় নেই।'[২৮]

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ আবু ইসহাক আর খাজ্জাগের মতে, 'কাউকে ঋণ দিয়ে আসলের অতিরিক্ত কিছু নেয়া হলে তাই সুদ।'[২৯] সহিহ আল-বুখারির প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানির মতে, 'অর্থ বা পণ্যের বিনিময়ে নেয়া অতিরিক্ত অর্থ বা পণ্যই হচ্ছে রিবা।[৩০]

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ-এর মতে, 'কোন ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থ বা পণ্য-সামগ্রীর উপর সুদ হিসেবে ধার্যকৃত অবৈধ অতিরিক্তই হচ্ছে রিবা।'[৩১]

---

২০. ফখরুদ্দিন আল-রাযি, *তাফসির কাবির*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮১), খ.২, পৃ. ৩৫১
২১. আল্লামা আবুবকর আল-যাসসাস, *আহকামুল কুরআন*(ইস্তাম্বুল : ১৩৩৫ হি.), পৃ. ৪৬৯
২২. সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
২৩. আল সারাখসি, *আল মাবসুত*, প্রাগুক্ত, খ.১২, পৃ. ১০০
২৪. প্রাগুক্ত, খ.১২, পৃ. ১০৯
২৫. আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানি, *আল মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২৬. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
২৭. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
২৯. সায়্যিদ মুহাম্মাদ মুরতজা আল-হুসাইনি আল-যাবিদি, *তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরুল কামুস*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১১৫
৩০. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৩১. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

এম.এ.খান বলেছেন, 'রিবা হচ্ছে দেনার উপর এমন অতিরিক্ত যাকে ঋণদাতার অধিকার হিসেবে বলা হয়েছে, কিন্তু এর বিনিময়ে ঋণদাতা দেনাদারকে কিছুই দেয় না।'[৩২]

শাইখ এম. মুস্তাফা শিবলির মতে, 'রিবা হচ্ছে ঋনের আসল পরিমাপের উপর যে কোন অতিরিক্ত, এ অতিরিক্ত প্রথমে পরিশোধ করা হোক বা শেষে দেয়া হোক।'[৩৩]

ড. আলি আল-সালুসি বলেছেন, 'ঋণের উপর শর্ত হিসেবে সময়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেয় যে কোন অতিরিক্তই হচ্ছে রিবা।'[৩৪]

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী-এর মতে, 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে মূলধনের উপর যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়তি অর্থ গ্রহণ করা হয় তাকেই সুদ বলে।'[৩৫]

ড. এম. উমর চাপরার মতে, 'শারি'আহতে রিবা বলতে ঐ অতিরিক্তকে বুঝায় যা ঋণের শর্ত হিসেবে অথবা ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির দরুণ ঋণগ্রহীতা অবশ্যই মূল অর্থসহ ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য।'[৩৬]

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইনের মতে, 'ঋণের উপর ঋণের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত কিছু লেনদেন করা হলে সে অতিরিক্তকে বলা হয় রিবা বা সুদ। তিনি আরো বলেন, ধারকৃত মূলধনের উপর সময়ের অনুপাতে প্রদত্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত দেয়াই হচ্ছে 'রিবা বা সুদ।'[৩৭] ক্রয়-বিক্রয়ে দাম নির্ধারণের বিধান লংঘন করে কোন এক পক্ষের দেয় প্রতিমূল্যের উপর অতিরিক্ত ধার্য করা হলে এবং সেই অতিরিক্ত অংশের বিনিময় দেয়া না হলে তাই হয় রিবা।

ইমরান এন. হোসাইনের মতে, 'অন্যদের ক্ষতির বিনিময়ে, অবৈধ এবং ভ্রান্ত উপায়ে মূলধনের বৃদ্ধি হচ্ছে সুদ।'[৩৮]

বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানীর মতে, 'ঋণের চুক্তিতে মূলধনের উপর অতিরিক্ত ধার্য করাকে রিবা বলে যা আল কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'[৩৯] এ সংজ্ঞাটি পবিত্র কুরআনের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়।[৪০]

ড. ইউসুফ আর-কারযাভির মতে, 'শুধুমাত্র সময়ের বিনিময়ে মূলধনের উপর শর্তানুযায়ী অতিরিক্ত যা কিছু আরোপ করা হয় তাই হচ্ছে সুদ।'[৪১]

---

৩২. এম.এ.খান, *Glossary of Islamic Economics*(London : Mansell Publishers, 1989), পৃ. ; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৩৩. ড. এম.আলী, অনূঃ আত্তিকুজ্জাফর, *ব্যাংক কা সুদ*(ইসলামাবাদ : ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ, ১৯৯৬), পৃ. ৬৯-৭০

৩৪. প্রাগুক্ত।

৩৫. সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, অক্টোবর ১৯৯৭), পৃ. ১৭৮

৩৬. ড. এম. উমর চাপরা, *Towards a Just Monetary System*(Leicester : The Islamic Foundationb, UK, 1995), pp. 56-57

৩৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৩৮. এম.এন হোসাইন, অনূঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, *ইসলামে রিবা নিষেধ করার গুরুত্ব*(শিকাগো : ইলিনয়, ২০০১), পৃ. ২০

৩৯. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী, *ইসলামিক ফাইন্যান্স*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০০৪), পৃ. ১১

৪০. এম. শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, ২০১৫), পৃ. ৩

যাকি আল-দিন বাদাবির মতে, 'রিবা হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের অতিরিক্ত।'[৪২] প্রখ্যাত ইসলামি অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার এম. আযীযুল হক লিখেছেন, ঋণ দেওয়া মূল অর্থ যাই উৎপন্ন করুক না কেন তার বিচার না করে ঐ ঋণের উপর পূর্ব নির্ধারিত পরিশোধিতব্য অর্থই হল সুদ।'[৪৩] প্রখ্যাত ইসলামি ব্যাংকার এ.কে.এম ফজলুল হকের মতে, 'ঋণের লেন-দেনে ঋণের আসলের উপর যদি 'অতিরিক্ত কিছু' ধার্য করা হয় তবে ঐ 'অতিরিক্ত কিছু'কে রিবা বলে। সে অতিরিক্ত কিছু অর্থও হতে পারে, দ্রব্যও হতে পারে, সেবাও হতে পারে। ঋণের উপর অতিরিক্ত যাই নেয়া হোক না কেন তাই রিবা।'[৪৪]

ড. মনজের কাহফ-এর মতে, 'ঋণ দেয়া বা বিদ্যমান ঋণ ফেরত দানের সময়সীমা বাড়াতে ঋণ গ্রহীতা ঋণদাতাকে যে বাড়তি পরিশোধ করেন তাই রিবা।'[৪৫]

মাওলানা মো. ফজলুর রহমান আশরাফী বলেন, 'পরিভাষাগত দিক দিয়ে রিবা হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিপরীতে পূর্ব নির্ধারিত হারে যে অধিক পরিমাণে অর্থ আদায় করা হয় এবং একই শ্রেণিভুক্ত মালের পারস্পরিক লেন-দেন কালে চুক্তি মুতাবিক অতিরিক্ত যা গ্রহণ করা হয় তাকে সুদ বলা হয়।'[৪৬]

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞার মতে, 'ঋণের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত কিছু লেন-দেন করাকেই রিবা বা সুদ বলে।'[৪৭]

নওয়াজেশ আলি জায়েদির মতে, 'যে কোন ধরনের ঋণের উপর ধার্যকৃত অতিরিক্তই রিবা।'[৪৮]

উপরের সংজ্ঞাসমূহে বর্ণিত রিবাকে আল্লাহ হারাম করেছেন। আল্লাহ সব ধরনের রিবাই হারাম করেছেন। ভোগ্য ঋণের সুদ, ব্যাংকিং সুদ বা বিনিয়োগের সুদ বা ব্যবসার জন্য গৃহীত ঋণের সুদ এ সবই হারাম। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।[৪৯] বিনিময় হীনতাই সুদ বা রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ। তাই সুদ বর্জন করতে হবে। আর সুদ বর্জনের পর আয়ের বিকল্প হালাল উৎস দরকার। এ জন্যই আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যবসায়কে হালাল ঘোষণা করেছেন। আর এ ব্যবসায়লব্ধ মুনাফা তাই সম্পূর্ণ হালাল।

সুদ সম্পর্কে আল্লাহতা'আলার বাণী : সুদ ও সুদি লেনদেনের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে পাঁচ দফায় আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন–

সুদ সম্পর্কে প্রথম দফায় অবতীর্ণ আয়াত :

---

৪১. এম. শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৪২. যাকি আল-দিন বাদাবি, *আল-রিবা আল-মুহাররম*(কায়রো : দারুন নাওয়াদির, ১৯৬৪), পৃ. ৩৪

৪৩. এম. আযীযুল হক, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, ২০১৪), পৃ. ৩৩-৩৫

৪৪. এ. কে. এম. ফজলুল হক, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগ ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা*(ঢাকা : দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের একুশ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই ২০০৪), পৃ. ৩৪৩

৪৫. ড. মনজের কাহফ, অনূ. মাসুম বিল্লাহ, *মাকাসিদে শরী'আহ : আধুনিক ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থায় প্রয়োগ*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, ইসলামী ব্যাংকিং, সেপ্টেম্বর ২০১৫), পৃ, ৯-১০

৪৬. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা*(ঢাকা : আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০১), পৃ. ১৪৫

৪৭. ড. মুহাম্মাদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং : কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৪৮. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী, *Federal Shariat Court Judgement on interest*(Lahore : P.L.D. Publishers, 1992), Vol. XLIV, p. 136

৪৯. আল কুরআন, ২ : ২৭৫

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللهِ ج وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

'মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তা-ই বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধশালী।'[৫০] উক্ত আয়াতটি হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে নাযিল হয়।

সুদ সম্পর্কে দ্বিতীয় দফায় অবতীর্ণ আয়াত :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا. وَّأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ط وَأَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا. لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط أُولٰئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ أَجْرًا عَظِيْمًا.

'ভাল ভাল যা ইয়াহুদিদের জন্য বৈধ ছিল আমি তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি তাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেয়ার জন্য এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা ও মু'মিনগণ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও ইমান আনে এবং যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ইমান রাখে, আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।'[৫১] উক্ত আয়াত তিনটি হিজরতের পর রাসুলুল্লাহ সা. এর মাদানি জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়।

সুদ সম্পর্কে তৃতীয় দফায় অবতীর্ণ আয়াত :

يٰأَيُّهَا اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبٰوا أَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ. وَأَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. وَسَارِعُوْا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ لا أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ. وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ قف وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللّٰهُ ص قف وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ. أُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ.

'হে মু'মিনগণ! তোমরা ক্রমবর্ধমান সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। এবং তোমরা সে অগ্নিকে ভয় কর যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার। তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমিনের ন্যায়, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন; এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না।'[৫২] উক্ত আয়াত সাতটি ৩য় হিজরি সনে উহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়।

---

৫০. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯

৫১. আল-কুরআন, ৪ : ১৬০-১৬২

৫২. আল-কুরআন, ৩ : ১৩০-১৩৬

চতুর্থ দফায় অবতীর্ণ আয়াত :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا م وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّه فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُه إِلَى اللّٰهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ. إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَأَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

'যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই।' অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই জাহান্নামি, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।'[৫৩] উক্ত আয়াত তিনটি ৩য় হিজরি সনে উহুদ যুদ্ধের পর সুরা আলে ইমরানের উপরোক্ত আয়াতগুলোর পর পরই নাযিল হয়।

পঞ্চম দফায় অবতীর্ণ আয়াত :

يٰأَيُّهَا اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه ج وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ ج لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ. وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ قف ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ.

'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া যা আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না। যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যানীত হবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পুরাপুরি প্রদান করা হবে, আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না।'[৫৪] উক্ত আয়াত চারটি বিদায় হজের পূর্বে নাযিল হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন– এটিই শেষ আয়াত যা রাসুলুল্লাহ সা. এর উপর নাযিল হয়েছে।[৫৫]

উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সুদি কারবার একটি ফৌজদারি অপরাধে পরিণত হয়। সুদখোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রে সুদখোরদের এ জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়ে থাকে এবং তওবা করতে বাধ্য করা হয়। সুদি কারবারে জড়িতরা যদি তওবা করে অর্থাৎ সুদি কারবার ছেড়ে দেয় তাহলে আসল ফেরত নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার যে আসলের অতিরিক্ত কিছু নেয়া যাবে না। সুদ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনার আলোকে এটি সুস্পষ্ট যে লেনদেনে প্রচলিত সকল প্রকার সুদ হারাম, সুদের কোন প্রকারই আর জায়িয নেই, নানা বাহানায় সুদ নেয়ার আর কোন পন্থা অবশিষ্ট নেই।

---

৫৩. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫-২৭৭

৫৪. আল-কুরআন, ২ : ২৭৮-২৮১

৫৫. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২২

সুদ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সা.-এর হাদিস : সুদ ও সুদি লেনদেনের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সা. প্রসিদ্ধ হাদিসসমূহ নিম্নরূপ–

عن جابر رضـ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.

'হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. সুদ গ্রহীতার উপর, সুদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও তার সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন এবং বলেছেন এরা সকলেই সামন অপরাধী।'[৫৬]

عن عبد الله بن مسعود رضـ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. সুদখোর, সুদ দাতা, সুদের স্বাক্ষীদ্বয় ও এতদ্বিষয়ে লেখককে লা'নত করেছেন।'[৫৭]

عن أبي هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه.

'হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, সুদ হল সত্তর প্রকারের পাপের সমষ্টি। তার মধ্যে সবচেয়ে সহজটি হল আপন মায়ের সাথে ব্যভিচার করা।'[৫৮]

عن أبي هريرة رضـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها، مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه.

'হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। মহানবী সা. বলেছেন, আল্লাহ তাঁর অধিকার হিসেবে চার শ্রেণির ব্যক্তিকে আল্লাহতা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না এবং তার নি'আমতের স্বাদও আস্বাদন করাবেন না। যথা– মদ পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, সুদখোর ব্যক্তি, ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী ও পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি।'[৫৯]

عن عبد الله بن هنزلة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زينة.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবন হানযালা রা. থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, জেনে বুঝে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ।'[৬০]

عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضـ قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور.

'হযরত আউন ইবন আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি এক গোলাম ক্রয় করেন, যে শিঙ্গা লাগানোর কাজ করত। তিনি তার শিঙ্গার যন্ত্রপাতি সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তা ভেঙ্গে ফেলা হলো। আমি এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, মহানবী সা. কুকুরের মূল্য এবং রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, আর দেহে দাগ দেয়া ও নেয়া থেকে নিষেধ করেছেন। সুদ খাওয়া ও খাওয়ানো নিষেধ করেছেন। আর ছবি অঙ্কনকারীর উপর লা'নত করেছেন।'[৬১]

عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زينة.

---

৫৬. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১০১, হাদিস নং ৩৯৪৮

৫৭. ইমাম আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা আত-তিরমিযি, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৪৯৪, হাদিস নং ১২০৯

৫৮. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩২৩, হাদিস নং ২২৭৪

৫৯. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাইন*(বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০২), খ.২, পৃ. ৪৩, হাদিস নং ২২৬০

৬০. আবুল কাসিম সুলাইমান ইবন আহমাদ আত-তাবারানি, *আল-মু'জামুল কাবির*(কায়রো : মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়া, ২০০৯), খ.১০, পৃ. ২৫৮

৬১. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২২, হাদিস নং ১৯৫৬

'হযরত আবদুল্লাহ ইবন হানযালা গাসিলুল মালাইকা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, জেনে বুঝে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশবার ব্যভিচার করার সমতুল্য।'[৬২]

عن عبد الله بن مسعود رضـ ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ও সুদের প্রচলন ব্যাপক হয়ে যায়, তখন তাদের উপর আল্লাহতা'আলার শাস্তি আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে।'[৬৩]

عن أبي هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة إسرى بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء آكل الربا.

'হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, মিরাজের রাতে আমি এমন এক জাতির পাশ দিয়ে গমন করি, যাদের পেট ছিল ঘরের মত, যার মধ্যে বিভিন্ন রকমের সাপ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বলেন– এরা সুদখোর।'[৬৪]

عن علي رضـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربوا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح.

'হযরত আলি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুলুল্লাহ সা. থেকে শুনেছেন যে, সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদের লেখক এবং ওয়াজিব সদকা প্রদানে বাধাদানকারীর উপর রাসুলুল্লাহ সা. অভিশাপ করেছেন। আর তিনি উচ্চস্বরে বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন।'[৬৫]

عن البراء بن عازب رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا إثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.

'হযরত বারা ইবন আযিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, সুদের মধ্যে বাহাত্তরটি স্তর রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তর হল, নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করা এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তর হল, তার ভাইয়ের সম্মানে আঘাত করা।'[৬৬]

عن عبد الله بن مسعود رضـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدى الساعة يظهر الربا والزنا والخمر.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মহানবী সা. থেকে বর্ণনা করেন, কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে সুদ, ব্যভিচার ও মদের প্রচলন বৃদ্ধি পাবে।'[৬৭]

عن عبد الله بن عباس رضـ قال لا تشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا قيل ولم قال لأنهم يربون الربا لا يحل.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, তোমরা ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নি উপাসকদের সাথে অংশীদারি ব্যবসা করো না। লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেন, কেননা তারা সুদের কারবার করে অথচ সুদ হালাল নয়।'[৬৮]

---

৬২. ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*(কায়রো : দারুল হাদিস, ১৯৯৫), খ.১৩, পৃ. ৪৩৪, হাদিস নং ১৭৫৪১

৬৩. আবু ইয়ালা আল-মাওছালি, *মুসনাদ আবু ইয়ালা*(বৈরুত : দারুল মামুন লিত্তুরাস, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৯), খ.৮, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭, হাদিস নং ৪৯৮১

৬৪. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৩, হাদিস নং ২২৭৩

৬৫. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১০১, হাদিস নং ৩৯৪৭

৬৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাইন*(বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০২), খ. ২, পৃ. ৪৩, হাদিস নং ২২৫৯

৬৭. আবুল কাসিম সুলাইমান ইবন আহমাদ আত-তাবারানি, *আল-মু'জামুল কাবির*(কায়রো : মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়া, ২০০৯), খ.১১, পৃ. ৩৬৫

عن أبي هريرة رض۔ عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الْموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأمل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف الْمحصنات الغافلات الْمؤمنات.

'হযরত আবু হুরাইরা রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সা.! সেগুলো কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরিক করা, যাদু, যথার্থ কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, সাধ্বী বিশ্বাসী সরলমনা রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।'[৬৯]

عن عبد الله بن مسعود رض۔ قال آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتباه إذا علموا به والواشمة والْمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والْمرتد إعرابية بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জানা অবস্থায় সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী ও সুদের লেখক, সৌন্দর্যের জন্য নিজ শরীরে উল্কি গ্রহণ ও অংকনকারী, যাকাত প্রদানে গড়িমসিকারী এবং হিজরতের পর বাড়িতে ফিরে আসা ব্যক্তিরা মুহাম্মাদ সা.-এর ভাষায় অভিশম্পাতকৃত।'[৭০]

عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والْملح بالْملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد.

'উবাদা ইবনুস সামিত রা. থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ হলে সমপরিমাণ হতে হবে, রূপার বিনিময়ে রূপা হলে সমপরিমাণ হতে হবে, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর হলে সমপরিমাণ হতে হবে, গমের বিনিময়ে গম হলে সমপরিমাণ হতে হবে, লবণের বিনিময়ে লবণ হলে সমপরিমাণ হতে হবে, যবের বিনিময়ে যব হলে সমপরিমাণ হতে হবে। এসব ক্ষেত্রে কেউ অতিরিক্ত দিলে বা অতিরিক্ত দাবি করলে তা হবে সুদ। তোমরা রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ যেভাবে ইচ্ছা নগদে বিক্রয় করতে পার; খেজুরের বিনিময়ে গম যেভাবে ইচ্ছা নগদে বিক্রয় করতে পার; খেজুরের বিনিময়ে যব যেভাবে ইচ্ছা নগদে বিক্রয় করতে পার ।'[৭১]

عن أبي سعيد الخدري رض۔ قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه، عين الربا عين الربا. لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره.

'হযরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল রা. কিছু উন্নতমানের খেজুর নিয়ে মহানবী সা.-এর কাছে আসেন। মহানবী সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কোথায় পেলে? বিলাল রা. বললেন, আমাদের কাছে কিছু নিকৃষ্ট মানের খেজুর ছিল। মহানবী সা.-কে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তা দুই সা'র বিনিময়ে এক সা' পরিমাণ কিনেছি। এ কথা শুনে মহানবী সা. বললেন, হায়! হায়! এটাতো একেবারে সুদ! এটাতো একেবারে সুদ! এরূপ কর না। যখন তুমি উৎকৃষ্ট খেজুর কিনতে চাও, তখন নিকৃষ্ট খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রয় করে দাও। তারপর সে মূল্যের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে নাও।'[৭২]

---

৬৮. আবদুর রাজ্জাক ইবন হুমাম, *আল-মুসান্নাফ*(জোহান্সবার্গ : আল-মাজলিসুল ইলমি, ১৯৮৩), খ.৮, পৃ. ২১, হাদিস নং১৪১৪০

৬৯. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ২৫০, হাদিস নং ৬৩৯৩

৭০. ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১৩, পৃ. ৪৩৫, হাদিস নং ১৭৫৪৪

৭১. ইমাম আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা আত-তিরমিযি, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫২১-৫২২, হাদিস নং ১২৪৩

৭২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১৫৭, হাদিস নং ২১৬২

عن الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران وهم نصارى أن من باع منكم بالربا فلا ذمة له.

'হযরত শা'বি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. খ্রিস্টান নাজরান গোত্রের নিকট একটি পত্র লিখলেন, তোমাদের মধ্যে যে সুদি কারবার করবে সে আমাদের নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত নয়।'[৭৩]

عن علي رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بقوم هلاكا فشى فيهم الربا.

'হযরত আলি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহতা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে চান, তখন তাদের মধ্যে সুদের ব্যাপক প্রচলন হয়।'[৭৪]

عن أبي هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع أولهن الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم وفرار يوم الزحف وقذف المحصنات والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته.

'হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, কবিরা গুনাহ সাতটি। যথা– আল্লাহর সাথে শরিক করা, অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা, কোন পবিত্র রমনীকে অপবাদ দেয়া ও হিজরতের পর বাড়িতে ফিরে আসা।'[৭৫]

عن أبي هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يتقي منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غبارة.

'হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, অচিরেই মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে, যখন তাদের মাঝে সুদ খাওয়া ছাড়া কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। আর যে সুদ খাবে না, সুদের মলিনতা তাকেও স্পর্শ করবে।'[৭৬]

عن عبد الله بن عباس رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان ظالِما بباطن ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أكل درهما من ربا فهو مثل ثلاثة وثلاثين زينة ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি হকদারদের হক বিনষ্ট করার জন্য কোন জালিমকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করবে সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি এক দিরহাম সমপরিমাণ সুদ গ্রহণ করল, সে তেত্রিশবার ব্যভিচার করলো এবং যে ব্যক্তির হারাম উপার্জন দ্বারা শরীরের গোশত প্রস্তুত হল, তার জন্য জাহান্নাম উপযুক্ত হয়ে গেল।'[৭৭]

عن عبد الله بن مسعود رضـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. সূত্রে মহানবী সা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বেশি সুদ খাবে, পরিণামে তার সম্পদ কম হয়ে যাবে।'[৭৮]

রিবার শ্রেণি বিভাগ

কুরআন ও সুন্নাহতে দু'প্রকার রিবা বা সুদের উল্লেখ রয়েছে। তা হচ্ছে,

এক. রিবা আন-নাসিয়া (ربا النسيئة)

দুই. রিবা আল-ফাদল (ربا الفضل)

---

৭৩. আলউদ্দিন আলি আল-মুত্তাকি, *কানযুল উম্মাল*(বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫), খ.৪, পৃ. ১০৫

৭৪. আবু শুজা আদ-দাইলামি, *মুসনাদে ফিরদাউস*(বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬), পৃ. ৯৩৯

৭৫. *কানযুল উম্মাল*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১০৪

৭৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩২৪, হাদিস নং ২২৭৮

৭৭. প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩২৪, হাদিস নং ২২৭৯

৭৮. আবু বকর আল-বাইহাকি, *সুনানুল কুবরা*(বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৩), খ.৭, পৃ. ৫৮

রিবা আল নাসিয়া

কুরআন মাজিদে উল্লিখিত রিবাই রিবা নাসিয়া। এটাকে রিবা আল-কুরআনও বলা হয়। নাসিয়া শব্দের মূল হচ্ছে 'নাসায়া' যার আভিধানিক বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে স্থগিত, বিলম্বিত, প্রতীক্ষা, মেয়াদ, সময় নেয়া, বাকি দেয়া বা দেরি করা। এ হিসেবে রিবা নাসিয়ার অর্থ হচ্ছে মেয়াদি ঋণের সুদ। পারিভাষিক অর্থে ঋণের সে মেয়াদকালকে নাসায়া বলা হয় যা ঋণদাতা আসল ঋণের উপর নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে ঋণগ্রহীতাকে নির্ধারণ করে দেয়। সুতরাং রিবা নাসিয়া হচ্ছে ঋণের উপর সময়ের প্রেক্ষিতে ধার্যকৃত অতিরিক্ত অংশ। এ অতিরিক্ত অংশ সময়ের সাথে বৃদ্ধি পায়। ঋণ পরিশোধের জন্য প্রদত্ত সময় রিবা নয়; বরং ঋণ পরিশোধের জন্য সময় থাকা প্রকৃতি সম্মত, স্বাভাবিক ও অপরিহার্য। তবে ঋণের আসলের উপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত হচ্ছে রিবা নাসিয়া। কেবল ঋণের ক্ষেত্রেই রিবা নাসিয়ার উদ্ভব ঘটে। সে ঋণ নগদ অর্থে হোক বা পণ্য আকারে হোক, তার উপর ধার্যকৃত রিবা হচ্ছে রিবা নাসিয়া। ইমাম ফখরুদ্দিন আল-রাযি রিবা নাসিয়া সম্পর্কে বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে রিবা আন-নাসিয়া ছিল সুপরিচিত ও স্বীকৃত। সে সময় তারা অর্থ ঋণ দিত এবং মাসিক ভিত্তিতে একটা অতিরিক্ত পরিমাণ আদায় করত; কিন্তু আসল ঠিক থাকত। অতঃপর মেয়াদ শেষে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছে ঋণের আসল অর্থ ফেরত চাইত। ঋণ গ্রহীতা আসল পরিমাণ ফেরত দিতে না পারলে ঋণদাতা আসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দিত এবং মেয়াদ বাড়িয়ে দিত।[৭৯] অধ্যাপক মুহাম্মদ আকরাম খানের মতে, 'কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট থেকে কোন জিনিস নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ফেরত দেয়ার শর্তে গ্রহণ করার পর, মেয়াদ শেষে চুক্তি মুতাবিক উক্ত জিনিসের সাথে যে অতিরিক্ত পরিমাণ তাকে প্রদান করে সে অতিরিক্ত পরিমাণকে 'রিবা নাসিয়া' বলে।'[৮০]

হানাফি ফকিহগণ রিবা নাসিয়া-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'রিবা আন-নাসিয়া হচ্ছে, মেয়াদ বা সময়গত বৃদ্ধি যা তাৎক্ষণিক বিনিময়ের চেয়ে বাকিতে বিনিময়ে প্রদত্ত বর্ধিত সময় বা মেয়াদ এবং ঋণের পরিমাণের বৃদ্ধি, যখন ভিন্ন ভিন্ন জাতের ওজন বা পরিমাপযোগ্য পণ্য, অথবা কখনও কখনও পরিমাপ করা হয় না এমন সমজাতের পণ্য বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় এবং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।'[৮১]

রিবা নাসিয়া-এর উদাহরণ

'আবদুর রহিম' একজন ঋণদাতা এবং 'আবদুল করিম' একজন ঋণগ্রহীতা। 'আবদুর রহিম' যদি 'আবদুল করিমকে ১০০ টাকা এক বছরের জন্য এ শর্তে ঋণ দেয় যে, এক বছর পর আবদুল করিম উক্ত ১০০ টাকার সাথে অতিরিক্ত আরও ২০ টাকা ফেরত দিবে, তাহলে এ অতিরিক্ত ২০ টাকাই হবে 'রিবা নাসিয়া'। এভাবে ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতাকে ১ কেজি লবণ এ শর্তে ঋণ দেয় যে, একমাস পর ঋণগ্রহীতা দেড় কেজি ফেরত দিবে। তাহলে এ অতিরিক্ত আধা কেজি লবণ হবে 'রিবা নাসিয়া'। রিবা নাসিয়া, রিবা জাহিলিয়্যা, রিবা জলি, রিবা দুয়ুন, রিবা করদ, রিবা আল-কুরআন ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে ঋণের বিনিময়ে সুদের আদান-প্রদান ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ড.

---

৭৯. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৮০. মুহাম্মাদ আকরাম খান, অনূঃ নূর হোসেন মজিদী, *রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০৯), ২০২-২০৬

৮১. আল-কাসানি, *বাদায়ে' আস-সানায়ে'* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬), খ.৫, পৃ. ২৫৮

ইউসূফ আল-কারদাভির মতে, ঋণের বিনিময়ে সুদ বা কুরআনে উল্লিখিত সুদই বর্তমান যুগের ইস্যু। আধুনিক অর্থনীতিতে রিবা নাসিয়ার প্রচন্ড দাপট। মানুষের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে বিষধর সাপের মত পেচিয়ে রয়েছে এ রিবা নাসিয়া। রিবা নাসিয়ার অক্টোপাসে আটকা পড়ে আছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। আল্লামা মুহাম্মদ তকি ওসমানীর মতে, 'ঋণ বা দেনার আসলের উপর চুক্তি অনুসারে ধার্যকৃত যে কোন অতিরিক্ত হচ্ছে রিবা নাসিয়া। মহাগ্রন্থ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ রিবাকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।[৮২] তিনি আরও লিখেছেন, ভোগ বা উৎপাদন যে উদ্দেশ্যেই হোক, নির্বিশেষে সকল ঋণ বা দেনার চুক্তিতে আসলের উপর ধার্যকৃত, কম হোক বেশি হোক, যে কোন অতিরিক্তই হচ্ছে কুরআনে ঘোষিত হারাম 'রিবা'।[৮৩]

রিবা আল ফাদল

রিবা আল ফাদলের উদ্ভব হয় হাতে হাতে বিনিময়ের থেকে। রিবা ফাদল হচ্ছে সাদৃশ্যপূর্ণ দু'টি জিনিসের হাতে হাতে তাৎক্ষণিক বিনিময়ে বাড়তি নেয়া, যেমন, স্বর্ণের বিনিময়ে বেশি স্বর্ণ, দিরহামের বিনিময়ে বেশি দিরহাম। এভাবে একই জিনিসের বিনিময়ে একই জিনিস বেশি নেয়া। যেহেতু একই জিনিস সে জিনিসের অতিরিক্ত জন্ম দিল, তাই এখানে সুদি লেনদেনের মনোবৃত্তি কাজ করেছে।[৮৪] অন্যকথায়, পণ্য বিনিময় কালেও সুদ হতে পারে। একই জাতীয় পণ্যের নগদ হাতে হাতে উপস্থিত বিনিময়ে কমবেশি করা হলে বেশিটা রিবা ফাদল। অধ্যাপক মুহাম্মদ আকরাম খানের মতে, সমজাতীয় পণ্যদ্রব্য ও মুদ্রার লেন-দেন কালে এক পক্ষ চুক্তি মুতাবিক অপর পক্ষকে শারি'আহসম্মত বিনিময় ব্যতীত যে অতিরিক্ত মাল প্রদান করে তাকে রিবা আল ফাদল বলে।[৮৫] হাফিয ইবন হাজার আসকালানি বলেছেন, 'পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হচ্ছে রিবা। যেমন, এক দিনারের বিনিময়ে দুই দিনার।[৮৬] এখানে বিনিময় বলতে তিনি হাতে হাতে বিনিময়কে বুঝিয়েছেন। এছাড়া এক জাতের মুদ্রা অর্থাৎ দিনারের সাথে দিনারের বিনিময়ের কথা বলেছেন। সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী রহ. লিখেছেন, 'একই জাতিভুক্ত দু'টি জিনিসের হাতে হাতে লেন-দেনের ক্ষেত্রে যে বৃদ্ধি হয় তাকে বলা হয় রিবা আল ফাদল।[৮৭] মহানবী সা. রিবা আল ফাদলকে হারাম ঘোষণা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ এক কিলোগ্রাম উন্নতমানের খেজুরের সাথে দুই কিলোগ্রাম নিম্নমানের খেজুর বিনিময় করা হলে, নিম্নমানের খেজুরের ঐ অতিরিক্ত এক কিলোগ্রামই হবে রিবা ফাদল। আবু সা'ঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, একদা বিলাল রা. মহানবী সা.-এর নিকট কিছু উন্নতমানের খেজুর নিয়ে আসলেন। কোথা থেকে এ খেজুর আনলেন তার জবাবে বিলাল রা. বললেন, তাদের খেজুর নিম্নমানের ছিল, তাই তিনি দুই সা' খেজুর বদলিয়ে নিয়েছেন। মহানবী সা. এ কথা শুনে বললেন; এতো হচ্ছে খাঁটি নির্জলা রিবা বা সুদ। তিনি এরূপ করতে নিষেধ করেছেন এবং এরূপ কেনার প্রয়োজন হলে অন্য আরেক জনের কাছে বিক্রি করে, তারপর সে পয়সা দিয়ে খরিদ করতে বলেছেন।[৮৮] আবু হুরাইরা রা.

---

৮২. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৮৪. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*(ঢাকা : আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ২০০১), খ.৪, পৃ. ৪৬৯-৪৭২

৮৫. মুহাম্মাদ আকরাম খান, *রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০২

৮৬. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *থটস অন ইকনমিকস*(ঢাকা : ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ভলিউম ১৯, সংখ্যা ২, এপ্রিল-জুন ২০০৯), পৃ. ৯২

৮৭. সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৮৮. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১৫৭, হাদিস নং ২১৬২

ও আবু সা'ইদ খুদরি রা. থেকে আর একটি বর্ণনায় এসেছে, মহানবী সা. বনু আদি আল আনসারি গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়ের জন্য খাইবারে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দান করেছিলেন। তিনি মহানবী সা.-এর নিকট ভাল মানের খেজুর নিয়ে আসলেন। তখন মহানবী সা. বললেন, খাইবারের সমস্ত খেজুর কি এ রকম? তিনি বললেন না, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা এ মানের এক সা' খেজুর সংগ্রহ করি সাধারণ মানের দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে এবং দুই সা' সংগ্রহ করি তিন সা'র বিনিময়ে। তখন মহানবী সা. বললেন, এ রকম কর না। প্রথমে সবগুলো অর্থাৎ তোমাদের নিকট যে মানের খেজুর রয়েছে তা দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করবে, অতঃপর প্রাপ্ত দিরহাম দিয়ে উন্নতমানের খেজুর ক্রয় করবে।[৮৯] এক্ষেত্রে সাধারণভাবে মনে হতে পারে দুই কেজি নিম্নমানের খেজুর দিয়ে এক কেজি উন্নতমানের খেজুর বিনিময়ে দোষের কিছু নেই। কারণ গুণগত মান ভাল হওয়ায় এরূপ বিনিময় হতেই পারে। কিন্তু লেনদেনটি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। কেননা গুণগত মান একটি অতি সূক্ষ্ম জিনিস। স্বাদ, গন্ধ, দেখার সৌন্দর্য ইত্যাদি অনেক বিষয় এর সাথে সম্পৃক্ত। সমজাতীয় পণ্য বিনিময় করে এর গুণগতমান পরিমাপ করা কঠিন। এছাড়াও পণ্যের গুণগতমান সম্পর্কে সকলের অভিজ্ঞতা থাকে না বিধায় ঠকার আশংকা থাকে।

অধিকন্তু পণ্য বিনিময় করে এর গুণগতমান পরিমাপ করা কঠিন। পণ্য বিনিময় করার সময় গুণ অনুমান করা যায় আর নিশ্চিত হওয়া যায় কেবল ভোগ ব্যবহারের পরেই। এ কারণেই মহানবী সা. বলেছেন, পণ্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ধোকা দেয়ার কারণে অতিরিক্ত গ্রহণ করা যা রিবা (সুদ)। সমজাতীয় পণ্য বিনিময় না করে তা প্রচলিত বাজার দরে নিম্নমানের পণ্যটি বিক্রি করে প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে প্রচলিত বাজার মূল্যে উন্নতমানের সমজাতীয় পণ্য খরিদ করলে ঠকার আশংকা থাকে না। তাই পণ্যের বিনিময়কালে প্রচলিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত গ্রহণ বা প্রদান করার ফাঁক-ফোকর বন্ধ করার জন্য মহানবী সা. সমজাতীয় পণ্য বিনিময়কালে কমবেশি করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রিবা ফাদলকে রিবা আল খাফি বা সুপ্ত সুদ বা অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন সুদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সমজাতীয় পণ্য বিনিময়কালে কমবেশি সকল ইসলামি অর্থনীতিবিদ 'রিবা ফাদল' বলেছেন। প্রাসঙ্গিক হাদিসসমূহ বিশ্লেষণ করে ড. এম উমর চাপড়া রিবা ফাদলের চমৎকার সুন্দর এক সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন, "Anything that is unjustifiably received as an extra by one of the two counter parties in a transaction of trading is Riba al Fadl."[৯০] হানাফি ফকিহগণ রিবা ফাদলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, রিবা ফাদল হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ে কোন এক দিকের সম্পদের ভিত্তিতে আইনত গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড তথা ওজন ও পরিমাপের ভিত্তিতে আরোপিত অতিরিক্ত।[৯১]

এছাড়া নবী কারিম সা. আরও কতিপয় লেনদেনকে রিবা আখ্যায়িত করেছেন যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. অর্থের বিনিময়ে অর্থ লেনদেনে উভয় পক্ষের অর্থ যদি একই জাত ও শ্রেণিভুক্ত হয় এবং উভয় পক্ষ যদি সমান সমান পরিমাণের অর্থ লেনদেন না করে, তাহলে বিনিময় তাৎক্ষণিক হাতে হাতে নগদে হোক, সে লেনদেন হবে 'রিবা'।
২. বার্টার বা পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলো যদি ওজন বা পরিমাপযোগ্য হয় এবং একই জাত ও শ্রেণিভুক্ত হয় এবং যদি উভয় পক্ষের পণ্যের পরিমাণ অসমান হয় অথবা কোন

---

৮৯. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১৫৭, হাদিস নং ২১৬২

৯০. Dr. M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*(London : The Islamic Foundation, 1985), p. 59

৯১. আল-কাসানি, *বাদায়ে' আস-সানায়ে'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

পক্ষ যদি তার পণ্য প্রদান ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত বা বাকি রাখে তাহলে এরূপ লেনদেন ‘রিবা’ লেনদেনে পর্যবসিত হবে।

৩. বার্টার বা পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময়ে পণ্য যদি ভিন্ন ভিন্ন জাত ও শ্রেণিভুক্ত হয় এবং সেগুলো যদি ওজন বা পরিমাপযোগ্য হয় আর কোন পক্ষ যদি তার পণ্য প্রদান স্থগিত বা বাকি রাখে তাহলে তা ‘রিবা’ লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইসলামি আইন শাস্ত্রে উল্লিখিত এ তিন ধরনের লেনদেনকে বলা হয়েছে ‘রিবা আস-সুন্নাহ’; কারণ এরূপ লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবী কারিম সা.-এর হাদিস বা সুন্নাহ দ্বারা।[৯২]

শাফি‘ই আইনবেত্তাদের মতে, ‘ক্রয়-বিক্রয়ে দু‘টি পণ্যের কোন একটির পরিমাপ অপরটির চেয়ে বেশি করে ক্রয়-বিক্রয় করাই হচ্ছে রিবা ফাদল।’[৯৩]

হাম্বলি মাযহাবের ফকিহদের মতে, ‘রিবা ফাদল একই জাতের পরিমাণ ও ওজনযোগ্য পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে কোন একটি পণ্যের পরিমাপ বেশি করা” ।[৯৪]

বর্তমান যুগে সীমিতভাবে রিবা ফাদলের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ছেঁড়া-ফাটা-পুরাতন টাকা ও নতুন টাকা বিনিময়কালে কমবেশি করা, লেনদেনের ক্ষেত্রে অন্যকে প্রতারিত করে অন্যায় ও অনৈতিক উপার্জন ইত্যাদি। রিবা আল ফাদল অন্যান্য নামেও আখ্যায়িত হয়ে থাকে। যেমন, রিবা আস-সুন্নাহ, রিবা আল বুয়ু‘, রিবা গাইরুল মুবাশশির, রিবা আল খাফি ইত্যাদি।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহ. বলেন, রিবা দুই প্রকার। যেমন, (১) রিবা হাকিকি বা প্রকৃত রিবা, (২) রিবা আল ফাদল প্রকৃত বা হাকিকি রিবা কেবল ঋণের উপরই হয়।[৯৫]

রিবা আন নাসিয়া ও রিবা আল ফাদলের মধ্যে পার্থক্য : রিবা আন নাসিয়া ও রিবা আল ফাদলের মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ :

পার্থক্যের বিষয়	রিবা আন নাসিয়া	রিবা আল ফাদল
উৎস	কুরআনে উল্লেখিত রিবাই হচ্ছে রিবা আন নাসিয়া	রিবা আল ফাদল হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে
উৎপত্তির ক্ষেত্র	কেবল ঋণের ক্ষেত্রেই রিবা আন নাসিয়ার উদ্ভব ঘটে। সে ঋণ নগদ অর্থে হোক বা পণ্য আকারে হোক।	হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে রিবা আল ফাদল উদগত হয়।
সংজ্ঞা	নাসিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে অবকাশ। ঋণ পরিশোধ করার জন্য যে সময় বা অবকাশ দেয়া হয় তাকে বলা হয় নাসায়া; আর এ অবকাশের জন্য যে বাড়তি ধার্য করা হয় তাই হচ্ছে রিবা আন নাসিয়া।	ফাদল শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত। একই জাতীয় জিনিসের অসম বিনিময়ের মধ্যে আল ফাদল নিহিত। একই জাতীয় দ্রব্য বা মুদ্রার লেনদেনকালে এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষের কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাকে রিবা আল বলে।
লেনদেনের ধরন	নগদ অর্থ ও পণ্যসামগ্রী	শুধু পণ্যসামগ্রী।
বেড়ে যাওয়ার ধরন	বেড়ে যাওয়া বা বৃদ্ধির ধরন সরল সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ উভয় ধরনেরই হতে পারে।	চক্রবৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই।

---

৯২. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-১২৮

৯৩. মুহাম্মাদ আকরাম খান, *রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২০২

৯৪. আল্লামা কুরতুবি, *আল-জামি লি আহকামিল কুরআন*(রিয়াদ : দারু আলামিল কুতুব, ১৯৫২), খ. ৩, পৃ. ৩৫৭

৯৫. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৭৪-২৭৫

পার্থক্যের বিষয়	রিবা আন নাসিয়া	রিবা আল ফাদল
বিবেচনা	ঋণ সময়ের প্রেক্ষিতে যে অর্থ বা পণ্য জন্ম দেয় তাই হচ্ছে 'রিবা আন নাসিয়া'	একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমানের সাথে বেশি পরিমাণ হাতে হাতে বিনিময় করা হলে পণ্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয় রিবা আল ফাদল
নিষিদ্ধ হওয়া	কুরআন কর্তৃক নিষিদ্ধ	হাদিস কর্তৃক নিষিদ্ধ
স্পটে লেনদেন	স্পটে লেনদেনের প্রয়োজন নেই	স্পটে লেনদেন প্রয়োজনীয়
প্রভাব	আধুনিক অর্থনীতিতে রিবা নাসিয়ার প্রচণ্ড দাপট। মানুষের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে বিষধর সাপের মত পেচিয়ে রয়েছে রিবা নাসিয়া। রিবা নাসিয়ার অক্টোপাসে আটকা পড়ে আছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।	আধুনিক মনিটরি ইকোনমিতে রিবা আল ফাদলের তেমন প্রচলন নেই।
নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তি	এ ধরনের সুদের বহুবিধ অপকারিতা, শোষণ নিষ্ঠুরতা ও অনিষ্টকারিতার জন্য তা নিষিদ্ধ।	অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে।

বস্তুত সুদি অর্থায়নের ফলে একটি মেকি অর্থনীত জন্ম নেয় যা অস্থিরতা, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব এবং ধারাবাহিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে আকারেই সুদ খাওয়া হোক সুদখোররা আল্লাহর অপছন্দের মধ্যে পড়বেই। পৃথিবীর সুদখোরির ইতিহাস এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে। সুদ উচ্ছেদে সচেষ্ট হওয়া নিঃসন্দেহে সৎকাজ। আল্লাহতা'আলা ঘোষিত হারাম বর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে। এ জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে মু'মিনদের প্রস্তুত থাকা কাম্য। তবে সুদের ভয়াবহ জুলুম-শোষণ থেকে মানবতা মুক্তি পাক এটাই প্রত্যাশা। সুদের মত একটি মারাত্মক অভিশাপ ও জঘন্য পাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য অর্থনীতির সকল পর্যায় থেকে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং যাকাত-উশরসহ ইসলামের সকল সম্পদ ট্রান্সফার ম্যাকানিজম চালু করা বাঞ্ছনীয়। সর্বোপরি জনপ্রিয় ও সকলের জন্য কল্যাণকর ইসলামি অর্থনীতির প্রচলন করার জন্য সকল বিবেকবান নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে। সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলে ইহকালীন কল্যাণের পাশাপাশি পরকালের সাফল্যও নিশ্চিত হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমানত সংগ্রহ ও মুনাফা বণ্টনে শারি‘আহ-এর নীতিমালা

ইসলামি ব্যাংকিং হচ্ছে ইসলামি শারি‘আহ মুতাবিক পরিচালিত আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থা। কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামি ফিকাহ দ্বারা নির্দেশিত নীতিমালা অনুসারে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করাই হচ্ছে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার আদর্শগত মূলভিত্তি। অনেকেই এ ধারণা করে থাকে যে, ইসলামের নিজস্ব কোন অর্থনৈতিক নীতিমালা নেই; ধারণাটি সঠিক নয়। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কি হবে তা ইসলামি শারি‘আয় সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। যেমন সুদভিত্তিক আর্থিক লেনদেন ইসলাম অনুমোদন করে না। আর্থিক লেনদেনে অসচ্ছতা ও জুয়ার সংমিশ্রণ ঘটলে আর্থিক লেনদেন বৈধ হয় না। আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের বিধান অবশ্যই মেনে চলা জরুরি। এ কারণে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহশাস্ত্রে যে সব বিষয়কে বৈধতা দেয়া হয়নি তার কোনটাই ব্যাংক ব্যবস্থায় বহাল থাকলে তাকে ইসলামি ব্যাংক বলা যায় না। ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থায় সম্পদের মালিকের কাছ থেকে যেমন শারি‘আহর নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসারে সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়; তেমনি বিনিয়োগ করা হয় শারি‘আহ অনুমোদিত নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক।

ব্যাংকব্যবস্থায় শারি‘আহর নীতিমালা

ইসলামি ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য, মূলনীতি এবং কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামি শারি‘আহর নীতিমালা মেনে চলে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে। তাই ইসলামি ব্যাংক কার সঞ্চয় গ্রহণ ও বিনিয়োগ কার্যক্রম এবং অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ডে শারি‘আহর নীতিমাল অনুসরণ করে। এ ব্যাংক সুদ গ্রহণ কিংবা প্রদান করে না। সুদের উচ্ছেদ এবং প্রকৃত ব্যবসায়ের প্রচলন এ ব্যাংকের অন্যতম মূলনীতি। এ ব্যাংক শ্রমকে আয়ের উৎসরূপে বিবেচনা করে। ইসলামি ব্যাংক শারি‘আহর দুষ্টিতে হালাল লেনদেনেই শুধু অংশগ্রহণ করে। মুনাফা নয়, সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্নটিকে বিনিয়োগ কার্যক্রমে অগ্রাধিকার দেয়। আর্থিকভাবে লাভজনক কোন ব্যবসা সামাজিক বিবেচনায় অকল্যাণকর মনে হলে ইসলামি ব্যাংক তাতে অংশ নেয় না। শারি‘আহর দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ কোন খাতে লেনদেন থেকে এ ব্যাংক বিরত থাকে। ইসলামি ব্যাংক টাকার ব্যবসা করে না; পণ্যের কারবারে নিয়োজিত থাকে।[৯৬]

আমানাত সংগ্রহ ও মুনাফা বণ্টনে শারি‘আহর নীতিমালা :

ইসলামি ব্যাংকসমূহ দু’টি নীতিমালার আলোকে আমানত সংগ্রহ করে থাকে। নীতি দু’টি হচ্ছে আল-ওয়াদিয়াহ এবং মুদারাবা। শারি‘আহর আল-ওয়াদিয়াহ নীতির ভিত্তিতে চলতি হিসাব পরিচালিত হয় এবং লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বমূলক সঞ্চয়ী হিসাবসমূহ পরিচালিত হয় শারি‘আহর মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে।[৯৭]

আমানত গ্রহণের নীতি

১. ইসলামি ব্যাংক জনসাধারণের সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ যোগায়। শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট জমাকারিদের সম্পদকে জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়োজিত করা।

---

৯৬. Board of Editors, Text Book on Islamic Banking, Ibid, pp. 36

৯৭. Ibid, pp. 36-41

২. ইসলামি ব্যাংক সকলের কাছে সঞ্চয়ের এ চিত্র তুলে ধরে যে, সঞ্চয়ের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে পারেন এবং একই সাথে তিনি সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে পারেন।

৩. সঞ্চয়ী গ্রাহক ও ব্যাংকের সম্পর্ক মুদারাবা পদ্ধতির অংশিদারি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে গ্রাহক 'সাহিবুল মাল' এবং ব্যাংক 'মুদারিব' হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

৪. ইসলামি ব্যাংক জনগণের সঞ্চয়কে শারি'আহ অনুমোদিত খাতে শারি'আহসম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে হালাল মুনাফা অর্জনে সহযোগিতা করে।

৫. ইসলামি ব্যাংক শারি'আহ্‌র 'আল ওয়াদিয়া' নীতির ভিত্তিতে 'আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব' পরিচালনা করে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক হলেন 'মুয়াদ্দি'। আর ব্যাংক 'মুয়াদ্দা ইলাইহি'। এ হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যবহারের ব্যাপারে গ্রাহক (মুয়াদ্দি) ব্যাংক (মুয়াদ্দা ইলাইহি)-কে অনুমতি দেয়। ব্যাংক গ্রাহককে তার অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করে।

আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব

'আল ওয়াদিয়া' শব্দটি আরবি 'ওয়াদিয়ুন' থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ– সংরক্ষণ করা, জমা করা, বাদ দেয়া, পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। আল ওয়াদিয়া চুক্তিতে দু'টি পক্ষ থাকে। জমাগ্রহণকারি পক্ষকে বলা হয় 'মুয়াদ্দা ইলাইহি'। জমাকারি পক্ষকে বলা হয় 'মুয়াদ্দি'। যে বস্তু জমা রাখা হয়, তা হলো 'মুয়াদ্দা'।[৯৮]

ইসলামি ব্যাংক সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবের বিকল্প 'আল ওয়াদিয়া' পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক বা মুয়াদ্দা ইলাইহি জমাকারির (মুয়াদ্দি) অর্থ (মুয়াদ্দা) জমা নেয়। জমাকারি (মুয়াদ্দি) ব্যাংককে এ অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেয়। ব্যাংক জমাকারির সম্মতির ভিত্তিতে সে অর্থ ব্যবহার করে। ব্যাংক জমাকারিকে তার অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।[৯৯]

'আল ওয়াদিয়া' হল অর্থে নিরাপত্তা বিধানের চুক্তি। এর দ্বারা জমাকারি ব্যাংকের সাথে কোন ব্যবসায়ে অংশ নেয় না। ব্যাংকের ব্যবসায়ের কোনরূপ ঝুঁকিও বহন করেন না। তিনি তার জমা টাকা যে কোন সময় ফেরত নেয়ার অধিকার রাখেন। এ পদ্ধতিতে জমাকারি ব্যাংকের কাছ থেকে কোন মুনাফা পান না। জমাকৃত অর্থের নিরাপদ হিফাজত করা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক জমাকারির নিকট থেকে সার্ভিস চার্জ নিতে পারে।

ইসলামি ব্যাংকের আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব ও সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবের মধ্যে পার্থক্য

সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবের সাথে ইসলামি ব্যাংকের চলতি হিসাবের পার্থক্য ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক ও গভীর। যেমন,

১. ইসলামি ব্যাংকের চলতি হিসাব শারি'আহ্‌র আল ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাব পরিচালনায় শারি'আহর কোন নীতি, পদ্ধতি বা বিধান অনুসরণের প্রয়োজন অনুভব করা হয় না। এদিক থেকে দুই ব্যাংকের চলতি হিসাবের মধ্যে পার্থক্য নীতি ও নিয়তের।

---

৯৮. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ২২৫-২২৬

৯৯. প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ২২৭

২. আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে জমাকারির কাছ থেকে তার অর্থ ব্যবহারের পূর্ব অনুমতি নেয়া হয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমাকারির কাছ থেকে তার অর্থ ব্যবহারের অনুমতি নেয়ার শারই‘ বাধ্যবাধকতা অনুভব করা হয় না।

৩. আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে জমা অর্থ শারি‘আহ পরিপন্থী কোন পদ্ধতিতে বা কোন হারাম খাতে ব্যবহার করা হয় না। ব্যাংক এ ব্যাপারে জমাকারিকে নিশ্চিত করে। অন্যদিকে সুদভিত্তিক ব্যাংক চলতি হিসাবে জমা অর্থ সুদের ভিত্তিতে হালাল-হারাম নির্বিশেষে যেকোন খাতে ব্যবহার করতে পারে।

‘আল ওয়াদিয়া’ ও ‘আল আমানাহ’র পার্থক্য

শারি‘আহর নীতি অনুযায়ী কারো কাছে কোন কিছু গচ্ছিত রাখার একটি চালু পদ্ধতি ‘আল আমানাহ’।[১০০] ‘আল ওয়াদিয়া’ ও ‘আল আমানাহ’র মধ্যে পার্থক্য খুবই সরল ও স্পষ্ট। আল আমানাহ পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণকারী তার কাছে গচ্ছিত আমানাতকারির অর্থ বা বস্তু ব্যবহার করতে পারে না। ঐ সম্পদে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা সংযোজন-বিয়োজন করতে পারেন না। কিন্তু আল ওয়াদিয়া চুক্তি অনুযায়ী জমা গ্রহণকারি (মুয়াদ্দা ইলাইহি) জমাকারির (মুয়াদ্দি) অনুমতি নিয়ে জমা অর্থ বা বস্তু (মুয়াদ্দা) ব্যবহার করতে পারেন।

ব্যাংকিং সেবায় ইসলামি ব্যাংকের চলতি হিসাব ‘আল ওয়াদিয়া’ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে ইসলামি ব্যাংকের লকার সার্ভিস পরিচালিত হয় ‘আল আমানাহ’ নীতির ভিত্তিতে। ইসলামি ব্যাংক আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাবের টাকা ওয়াদিয়া চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যবহার করে এবং চাহিবামাত্র ফেরত দেয়। কিন্তু লকারে গচ্ছিত সম্পদ যে অবস্থায় রাখা হয় সে অবস্থায় হিফাজত করা হয়।

মুদারাবা হিসাব

‘মুদারাবা’ (مضاربة)[১০১] পরিভাষাটি আরবি দারব (ضرب) শব্দমূল হতে উদ্ভূত باب مفاعلة এর মাসদার। আরবি ভাষায় শব্দটি প্রহার করা, অন্বেষণ করা, দৃষ্টান্ত দেয়া, পরিভ্রমণ করা, সফর করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ‘মুদারাবা’ বলতে বুঝায় ব্যবসার জন্য সফর করা; আল্লাহ্‌র রহমতের তালাশে সফর করা। আল কুরআনুল কারিমে শব্দটি পরিভ্রমণ করা অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহতা‘আলা ইরশাদ করেন,

‘অন্যরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে যমিনে ভ্রমণ করে।’[১০২]

ইসলামি শারি‘আহর পরিভাষায়, মুদারাবা এমন ধরনের অংশীদারি কারবার যেখানে দু’টি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপরপক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে তা বহন করতে হয়। মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে বলা হয় ‘সাহিবুল মাল (صاحب الْمال) আর ব্যবসায় পরিচালনাকারী পক্ষকে বলা হয় মুদারিব (مضارب)।[১০৩]

---

১০০. এ.এ.এম হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

১০১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু‘জামুল ওয়াফী]*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

১০২. وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْأَرْض يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ. দ্র. আল কুরআন, ৭৩:২০

১০৩. মুদারাবা পরিভাষাটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবদের অনুসারীরা ব্যবহার করে থাকেন। পক্ষান্তরে শাফিঈ ও মালিকি মাযহাবের অনুসারীগণ মুদারাবার স্থলে ক্বিরাদ পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। দ্র. আততামওয়ীল বিল মুদারাবা

'মুদারাবা' হল অংশীদারি কারবারের একটি পদ্ধতি। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসা পরিচালনার জন্য দু'টি পক্ষ মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হন। একপক্ষ (পুঁজির মালিক) মূলধন সরবরাহ করে। তাকে 'সহিবুল মাল' বলা হয়। অন্যপক্ষ তার মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সামর্থ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার উদ্যোগ নেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সাহিবুল মালের মূলধন ব্যবহার করেন। এ উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপক পক্ষকে 'মুদারিব' বলা হয়।

মুদারাবা চুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'সাহিবুল মালের' দায়িত্ব অর্থ যোগানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যবসা পরিচালনায় তিনি অংশ নেন না। 'মুদারিব' ব্যবসায়ের একজন ট্রাস্টি ও প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করেন।

ব্যবসা পরিচালনায় মুদারিবকে সততা ও দক্ষতার পাশাপাশি সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ইচ্ছাকৃত অবহেলা, প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনার কারণে ব্যবসায় ক্ষতি হলে সেক্ষেত্রে মুদারিব দায়ি হবেন।

মুদারাবা হিসাবের ব্যাপারে শারি'আহর নীতি

শারি'আহর নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংক মুদারাবা তহবিল সংগ্রহ করে। ব্যাংক তার বিভিন্ন মেয়াদি বিনিয়োগের পরিকল্পনা ও চাহিদা বিবেচনায় রেখে নানা ধরনের জমাকারীকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে মুদারাবা পদ্ধতিতে বিভিন্ন মেয়াদের এবং বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার ব্যবস্থা রাখতে পারে। সেসব হিসাব সঞ্চয়ী, স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। গ্রাহকদের আগ্রহ ও চাহিদা এবং অন্য কোন কল্যাণমূলক লক্ষ্য সামনে রেখে বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমেও জমা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বেশি মেয়াদে অর্থ জমা করে জমাকারি ব্যাংকের ব্যবসায়ে বেশি ঝুঁকি বহন করেন। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি জমা বিনিয়োগ করা ব্যাংকের জন্য বেশি সুবিধাজনক। এ কারণে সাধারণত জমার মেয়াদের উপর ভিত্তি করে অর্থের গুরুত্ব বা 'ওয়েটেজ' নির্ধারণ করা হয়। অন্যকোন দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাংক কোন বিশেষ জমা প্রকল্পকে অধিক গুরুত্ব বা ওয়েটেজ দিতে পারে।

ইসলামি ব্যাংকে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন সঞ্চয়ী হিসাবসমূহ[১০৪]

১. আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব (AWCA)
২. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (MSA)
৩. মুদারাবা মেয়াদি জমা হিসাব (১ মাস, ৩ মাস, ৬ মাস, ১২ মাস, ২৪ মাস ও ৩৬ মাস মেয়াদী) (MTDRA)
৪. মুদারাবা বিশেষ নোটিশ সঞ্চয়ী হিসাব (MSNDA)
৫. মুদারাবা হাজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব (১ থেকে ২৫ বছর মেয়াদি) (MHSA)

(التمويل بالْمضاربة), মারকাযুল ইকতিসাদ আল ইসলামী, আলমাছরিফুল ইসলামী আদদুয়ালী লিল ইসতিসমারি ওয়াত্ তানমিয়াহ, ইদারাতুল বুহুছ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ৭; দ্র. মুহাম্মদ শামসুল হুদা, ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহ্র নীতিমালা*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১১), পৃ. ১২৬

১০৪. ডায়েরী ২০১৭, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত।

৬. মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী (পেনশন) হিসাব (৫ ও ১০ বছর মেয়াদি) (MSSA)
৭. মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড স্কিম (৫ ও ৮ বছর মেয়াদি) (MSB)
৮. মুদারাবা মাসিক মুনাফা সঞ্চয়ী হিসাব (৩ ও ৫ বছর মেয়াদি) (MMPDA)
৯. মুদারাবা মোহর সঞ্চয়ী হিসাব (৫ ও ১০ বছর মেয়াদি) (MMSA)
১০. মুদারাবা ওয়াকফ ক্যাশ ডিপোজিট হিসাব (MWCDA)
১১. মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ী হিসাব (MFCDA)
১২. মুদারাবা এনআরবি সঞ্চয়ী বন্ড (MNRBSB)
১৩. স্টুডেন্ট মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (SMSA)
১৪. মুদারাবা ফার্মার্স সঞ্চয়ী হিসাব (MFDA)
১৫. মুদারাবা উপহার সঞ্চয়ী হিসাব প্রকল্প (MUDS)

উক্ত মুদারাবা তহবিল থেকে অর্জিত আয় ব্যাংক ও জমাকারির মধ্যে পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন করা হয়। যেমন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও তার মুদারাবা জমাকারিদের মধ্যে লাভ বণ্টনের বর্তমান অনুপাত হলো জমাকারি ৬৫ : ব্যাংক ৩৫।[১০৫] ব্যবসায়ে লোকসান হলে 'সাহিবুল মাল' আর্থিক ক্ষতি বহন করেন। এ ক্ষেত্রে মুদারিবের সময়, শ্রম ও মেধার লোকসান হয়।

মুদারাবা নীতিতে ব্যাংকের মুনাফা বণ্টন

মুদারাবা হিসাবে মুনাফা বণ্টনের সাধারণ নীতিমালা হলো–

১. মুদারাবা তহবিলের আয় মুদারিব ও সাহিবুল মালের মধ্যে চুক্তির শর্ত অনুসারে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা করা।
২. মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ ছাড়াও ব্যাংক তার বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে কমিশন, এক্সচেঞ্জ, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি আয় করেন। এসব আয়ে জমাকারিদের অংশ থাকে না।
৩. মুদারাবা জমাকারিগণ মুদারাবা তহবিলের বিনিয়োগ আয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হন।
৪. মুদারাবা জমাকারিগণ মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ আয়ের একটি পূর্বনির্ধারিত অংশ (বর্তমানে কমপক্ষে ৬৫ ভাগ) পান।
৫. মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগের বাকি অংশ (বর্তমানে ৩৫ ভাগ) ব্যাংক তার আয় হিসাবে পায়।

ইসলামি ব্যাংক তার বিনিয়োগ কার্যক্রমে শারি'আহর মুদারাবা, মুশারাকা, বায়' মুরাবাহা, বায়' মুআজ্জাল, বায়' সালাম, বায়' ইসতিসনা, শিরকাতুল মিলক প্রভৃতি নীতিমালা অনুসরণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সুদভিত্তিক অন্যান্য ব্যাংকের সাথে এমনকি আন্তর্জাতিক সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সাথে লেনেদেনেও ইসলামি ব্যাংক সুদ পরিহার করে। জনগণকে ব্যাংকিং লেনদেনে ইসলামি ব্যাংক শারি'আহর নীতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ ও সাহায্য করে।

ইসলামি ব্যাংকের কার্যক্রম শারি'আহর নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা তদারকি করার জন্য রয়েছে বলিষ্ঠ শারি'আহ কাউন্সিল। প্রখ্যাত আলিম, ফকিহ, অর্থনীতিবিদ ও আইনজীবীগণের সমন্বয়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এ শারি'আহ কাউন্সিল গঠন করা হয়। বিশ্বের প্রতিটি ইসলামি ব্যাংক শারি'আহ কাউন্সিলের তদারকির অধীন।

---

১০৫. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০

ব্যাংকের সকল প্রকার চুক্তি সম্পাদন ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে শারি'আহ কাউন্সিলের অনুমোদন নিতে হয়। শারি'আহ কাউন্সিল ব্যাংকের সকল কার্যক্রমে ইসলামি শারি'আহ সংক্রান্ত যথার্থতা তদারক করে এবং এ ব্যাপারে নিয়মিত পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামি ব্যাংক শারি'আহর নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য শারি'আহ কাউন্সিল সরাসরিভাবে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোতে প্রথমত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অডিট টিম নিরীক্ষা পরিচালনা করে। দ্বিতীয়ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অডিট টিমের মাধ্যমে নিরীক্ষা করে। এ দুই ধরনের অডিটের অতিরিক্ত ইসলামি ব্যাংকের কার্যক্রমে সুদ ও অন্য কোন হারাম উপাদান যুক্ত হয়েছে কি না, অথবা ব্যাংকের লাভের সাথে কোন না কোনভাবে সুদ বা সন্দেহজনক আয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে কি না, শারি'আহ কাউন্সিল তীক্ষ্ণভাবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। শারি'আহ কাউন্সিলের প্রত্যয়নপত্র ছাড়া ইসলামি ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে পারে না। ব্যাংকের সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনের পাশাপাশি তাদের প্রত্যয়নপত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

শারি'আহর মূলনীতিসমূহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উৎসারিত। ফলে এ ব্যবস্থা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক চাহিদার সাথে পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ এবং মানুষের পারস্পরিক আর্থ-সামাজিক আচরণের ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা বিধানে পূর্ণরূপে সক্ষম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্যদিকে সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার জন্ম ও বিকাশ ঘটেছে মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তার ভিত্তিতে; যেখানে একদল কর্তৃক আরেক গোষ্ঠীকে শোষণের ফন্দি উদ্ভাবনই কাজ করছে মূল চেতনারূপে।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এ কথা যারা স্বীকার করেন, তাদের পক্ষে এটা বুঝা সহজ যে ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসলামি নীতিমালা তথা শারি'আহর বিধি-বিধান প্রয়োগ করা জরুরি। শারি'আহ অনুমোদন করে না এমন কোন বিষয় যদি ব্যাংকব্যবস্থায় থাকে তবে তা ইসলামি হতে পারে না। ইসলামি শারি'আহর মূল উৎস আল-কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআনের বিধানসমূহ এবং মহানবী সা.-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করা মুসলিমদের জন্য অবশ্য পালনীয়। কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে মহান আল্লাহর বিধান ও মহানবী সা.-এর সুন্নাহ মানুষের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর। এ চেতনাকে ধারণ করেই ইসলামি ব্যাংকের নীতিমালা প্রবর্তিত হয়েছে।

মূলত ইসলামি ব্যাংক শারি'আহ মুতাবিক পরিচালিত কল্যাণমুখী একটা ব্যাংক ব্যবস্থা। লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে এ ব্যাংক সুদ পরিহার করে চলতে বদ্ধপরিকর। সামগ্রিকভাবে জনকল্যাণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শারি'আহ নীতিমালার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিনিয়োগ পদ্ধতিতে শারি‘আহর নীতিমালা

ইসলামে হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন যেমন নিষিদ্ধ করেছে, তেমনি অর্থ উপার্জনের হালাল নীতিমালা ও পন্থারও দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামি শারি‘আহর উৎস কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান, মাসালিহে মুরসালাহ ইত্যাদি। এসবের আলোকে ইসলামি শারি‘আহ বিশেষজ্ঞগণ ইসলামি ফিকহের গ্রন্থাবলীতে হালাল পন্থায় অর্থ বিনিয়োগের পদ্ধতিসমূহ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। কুরআন, সুন্নাহ ও সমৃদ্ধ ইসলামি ফিকাহ গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ পদ্ধতিতে শারি‘আহর যেসব নীতিমালা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো নিম্নরূপ–

বিনিয়োগ পদ্ধতিতে শারি‘আহর নীতিমালা :

প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম, ফকিহ, ইসলামি চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও ইসলামি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ব্যাংকারদের সমন্বিত গবেষণায় ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় যেসব বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুশীলনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে বায়‘ মুরাবাহা লিল আমিরি বিশশিরা, বায়‘ মুআজ্জাল, বায়‘ সালাম, ইসতিসনা‘, মুদারাবা, মুশারাকা ও ইজারা উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি বিনিয়োগ পদ্ধতির রয়েছে পৃথক পৃথক নীতিমালা। সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো–

বায়‘ মুরাবাহা লিল আমিরি বিশশিরার শারি‘আহ নীতিমালা :

১. বিনিয়োগ গ্রাহকের অর্ডারকৃত মালামাল ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় করার ক্ষেত্রে সংগৃহীত কোটেশন ব্যাংকের বরাবর হতে হবে। কেননা, ব্যাংক হচ্ছে প্রথম ক্রেতা।

২. ব্যাংকের পরিবর্তে বিনিয়োগ গ্রাহক ও সরবরাহকারীর মধ্যে ইজাব-কবুল হয়ে গেলে তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাবে এবং মালামাল গ্রাহকের মালিকানাধীন হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ব্যাংক কর্তৃক উক্ত মালের মূল্য পরিশোধপূর্বক মুরাবাহা বিনিয়োগ সম্পন্ন করা বৈধ হবে না। কেননা, গ্রাহক মালামাল ক্রয় করে বিক্রেতার কাছে ঋণী হয়েছেন আর ব্যাংক তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকে ঋণ দিয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের মধ্যে ‘ক্রেতা-বিক্রেতা’ সম্পর্ক না হয়ে ‘ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতা’ সম্পর্ক হবে।

৩. বিনিয়োগ গ্রাহক ও সরবরাহকারী একই ব্যক্তি হওয়া বৈধ নয়। কেননা, তা বায়‘উল ইনা হয়ে যাবে। মালামাল সরবরাহকারী বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকটাত্মীয় এমনকি স্বামী কিংবা স্ত্রী হলেও সমস্যা নেই। তবে প্রত্যেকের পৃথক আইনগত সত্তা থাকতে হবে। কোনক্রমেই যেন পাতানো ক্রয়-বিক্রয় না হয়।

৪. চুক্তি করার ব্যয় ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়পক্ষের বহন করাতে শারি‘আহর দৃষ্টিতে কোন বাধা নেই। আর একপক্ষের বহন করার শর্ত থাকলে তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

৫. পণ্য স্থানান্তরের ঝুঁকি কেবল গ্রাহকের বহন করা বৈধ নয়। কেননা, পণ্য যখন যার মালিকানায় থাকবে ঝুঁকি তাকেই বহন করতে হবে।

৬. সরবরাহকারীকে সরাসরি ব্যাংক কর্তৃক মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এতে লেনদেনটি সুদের আদান-প্রদানে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকবে।

৭. পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় আসার পূর্বে বিক্রয় করা বৈধ নয়। তাই বিক্রয়ের পূর্বে ব্যাংক কর্তৃক মালামালের উপর মালিকানা অর্জন আবশ্যক।

৮. গ্রাহকের কাছে বিক্রয়ের পূর্বে মালামাল ব্যাংকের দখলে আসা আবশ্যক। ব্যাংকের দখলে থাকা অবস্থায় মালামাল নষ্ট হলে তার দায়-দায়িত্ব ব্যাংককেই বহন করতে হবে।[১০৬]

৯. স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রার ক্ষেত্রে বাকিতে মুরাবাহা করা যাবে না। কেননা, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এগুলো নগদে নগদে ও হাতে হাতে হওয়া এবং বাকিতে না হওয়াকে শর্ত করা হয়েছে। মুদ্রার হুকুমও স্বর্ণ-রৌপ্যের মত। আন্তর্জাতিক ইসলামি ফিকহ কমিটি এ রায় দিয়েছে।[১০৭]

১০. ব্যাংক তার প্রয়োজনে বিনিয়োগ গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাউকে উকিল নিয়োগের বিষয়টি অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

১১. বিনিয়োগ গ্রাহককে উকিল নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে তার দু'টি দায়িত্বের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা থাকা আবশ্যক। উকিল হিসেবে প্রাপ্ত দায়িত্ব এবং বিনয়োগ গ্রাহক বা ক্রেতা হিসেবে দায়িত্বের মধ্যে কোনভাবেই যেন সংমিশ্রণ না ঘটে।

১২. মুরাবাহার ক্ষেত্রে কবদে হুকমি বা পরোক্ষ দখলই যথেষ্ট। পণ্য তার প্রকৃতি অনুযায়ী কবদ করা যাবে। কেননা, শারি'আহ কবদ করার জন্য কোন বিশেষ একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করেনি; বরং এটাকে প্রচলিত প্রথা বা উরফ-এর উপর ছেড়ে দিয়েছে। কবদ করার উদ্দেশ্য হল ব্যয়-ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করা। সুতরাং যেভাবে সে ক্ষমতা অর্জিত হবে, সেভাবেই তা কবদ করতে হবে।

১৩. বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের চুক্তি পৃথক হতে হবে।

১৪. ক্রয় সংক্রান্ত দলিলপত্র ব্যাংকের নামে হতে হবে। কেননা, ব্যাংকের স্বার্থেই ক্রয় সংঘটিত হচ্ছে।

১৫. দ্বিতীয় ক্রেতা বা বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয়মূল্য জানাতে হবে; তা অজ্ঞাত রাখা যাবে না।

১৬. লাভ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কেননা, লাভ বিক্রয়মূল্যের অংশ। আর বিক্রয়মূল্য ঠিক করা ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত।

১৭. বিক্রীত দ্রব্য সমজাতীয় না হওয়া। কেননা, সমজাতীয় দ্রব্য বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দেয়া বা নেয়া সুদ বলে গণ্য হবে।

১৮. প্রথম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হতে হবে, কেননা প্রথম চুক্তি শুদ্ধ না হলে বিক্রয়ও শুদ্ধ হবে না।

১৯. মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রিতব্য দ্রব্যের কোন ত্রুটি থাকলে বিক্রেতার উচিত উক্ত ত্রুটি ক্রেতাকে জানানো।

মুরাবাহাতে ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হওয়া না হওয়ার শার'ই নীতিমালা :

মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ইজাব-কবুল সম্পাদিত হওয়ার পর কখন পণ্যের উপর ক্রেতার এবং মূল্যের উপর বিক্রেতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তা নির্ধারণের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম বা ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হওয়া না হওয়ার বিষয়টি জানা আবশ্যক। কার্যকর হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়কে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. **বায়' লাযিম :** কোন প্রকার খিয়ার (গ্রহণ করা বা না করার স্বাধীনতা) ব্যতীত যে ক্রয়-বিক্রয় তাৎক্ষণিকভাবে সম্পাদিত হয়, তাকেই বায়' লাযিম বা কার্যকরী ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়।

---

১০৬. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), শারি'আহ স্ট্যান্ডার্ড নং-৮, মে ২০০২, পৃ. ১৩৫

১০৭. AAOIFI, শারি'আহ স্ট্যান্ডার্ড নং-৮, মে ২০০২, পৃ. ১৩৩

যেমন– ক্রেতা বলল, আমি আপনার কাছে এ কাপড়টি ৫০০ টাকায় বিক্রি করলাম এবং ক্রেতা বলল, আমি ক্রয় করলাম। এরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গেই বায়' সংঘটিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে পণ্যের উপর ক্রেতার মালিকানা এবং মূল্যের উপর বিক্রেতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট পণ্যটি ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়া বিক্রেতার এবং মূল্য পরিশোধ করা ক্রেতার দায়িত্ব হয়ে পড়ে।

২. **বায়' গায়রি লাযিম :** যে ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতার কোন প্রকার খিয়ার (গ্রহণ করা বা না করার স্বাধীনতা) থাকে তাকে বায়' গায়রি লাযিম বলে। যেমন– বিক্রেতা বলল, আমি আপনার কাছে এ কাপড়টি ৫০০ টাকায় বিক্রি করলাম এবং ক্রেতা বলল, আমি এটা তিন দিনের খিয়ারের শর্তে গ্রহণ করলাম। ক্রেতা সম্মত হলে এক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে। তবে ক্রেতা তার সম্মতি জানাতে তিন দিন সময় পাবেন। তিন দিনের মধ্যে বিক্রেতা কাপড়টি অন্য কারো কাছে বিক্রি করতে পারবেন না। এ সময়ের মধ্যে যে কোন মুহূর্তে ক্রেতা তার সম্মতি জানালে ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হবে এবং পণ্যের উপর ক্রেতার ও মূল্যের উপর বিক্রেতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. **বায়' মাওকুফ :** কেউ অপর কারো কোন বস্তু তার অনুমতি ছাড়া বিক্রি করলে উক্ত বিক্রীত বস্তুর উপর ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে বায়' মাওকুফ বলা হয়। এমন ক্রয়-বিক্রয় গুণগত দিক থেকে বৈধ, কিন্তু আপাতত স্থগিত থাকবে। এক্ষেত্রে পণ্যের মালিক অনুমোদন করলে ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হবে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে বায়' ফুদুলিও বলা হয়।

৪. **বায়' সহিহ আন-নাফিয আল-লাযিম :** যে ক্রয়-বিক্রয় কোন প্রকার খিয়ার ও অন্যের অধিকার জড়িত থাকা ব্যতীত সকল প্রকার গুণাগুণসহ সম্পাদিত হয়, তাকে বায়' সহিহ আন-নাফিয আল-লাযিম– সংক্ষেপে বায়' সহিহ বলা হয়। এটা হচ্ছে শুদ্ধ ও কার্যকর ক্রয়-বিক্রয়।

৫. **বায়' বাতিল :** যে ক্রয়-বিক্রয় মূলগত ও গুণগত উভয় দিক থেকে শুদ্ধ নয়, তাকে বায়' বাতিল বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, বিক্রীত বস্তুটি যদি ইসলামি শারি'আহর দৃষ্টিতে মূল্যমানসম্পন্ন না হয়, তাহলে তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন– মদ, শুকর, মৃতজন্তু ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়।

অনুরূপভাবে পাগলের ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ নয়। যদি কেউ এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করে, তা হলে বিক্রীত বস্তুর উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হবে না। বিক্রীত বস্তুটি ক্রেতার কাছে হস্তান্তর হয়ে থাকলে তা 'আমানত' হিসেবে গণ্য হবে এবং তা তার অবহেলা ও ত্রুটি ব্যতীত নষ্ট হয়ে গেলে তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন না। এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বিক্রেতার জন্য মূল্য ও ক্রেতার জন্য পণ্যের ব্যয়-ব্যবহার করা হালাল হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতা'আলা বলেছেন,

'হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজি হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ।'[১০৮]

বায়' বাতিল কয়েক প্রকারে হতে পারে। যেমন–

---

১০৮. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

(ক) অস্তিত্বহীন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় : যে বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই তা বিক্রয় করা বৈধ নয়। যেমন– উটের গর্ভজাত বাচ্চার বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় করা।[১০৯]

(খ) হস্তান্তর অযোগ্য বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় : যে পণ্য হস্তান্তর করা যায় না তার বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন– উড়ন্ত পাখি, পানির মাছ, ছিনতাইকৃত মাল ও দখলহীন সম্পত্তি বিক্রয় করা জায়িয নয়।

(গ) প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় : বস্তুর গুণাগুণ গোপন করে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে কোন বস্তু বিক্রয় করা বৈধ নয়।

(ঘ) অপবিত্র বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় : অপবিত্র বস্তু শারি‘আহর দৃষ্টিতে যার কোন মূল্য নেই তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন– মদ, শুকর, রক্ত ইত্যাদি হারাম বস্তু হওয়ার কারণে এগুলো ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। এছাড়া ক্ষতিকর জন্তু ও পাখি যেমন– বাঘ, সিংহ, কাক, পেঁচা ইত্যাদি বিক্রয়ও সাধারণভাবে অবৈধ।

(ঙ) বায়নার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় : বায়‘ উরবুন হল এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যেখানে ক্রেতা কোন পণ্য ক্রয়ের জন্য বিক্রেতাকে বায়না (অগ্রিম মূল্য) প্রদান করে এ শর্তে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে বাকি মূল্য দিয়ে উক্ত মাল ক্রয় করে নিবে। যদি ক্রেতা উক্ত মাল ক্রয় না করে তা হলে তার দেয়া বায়না (অগ্রিম মূল্য) আর ফেরত পাবে না এবং তা বিক্রেতার কাছে দান হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে অধিকাংশ ফকিহ বাতিল বলে অভিহিত করেছেন।

(চ) পানি বিক্রয় করা : সাধারণত পানি বিক্রয় করা বায়‘ বাতিলের অন্তর্ভুক্ত। নদ-নদী ও সমুদ্রের পানি সর্বসম্মতিক্রমে বিক্রয় করা নাজায়িয। কিন্তু বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা পানি যেমন– ওয়াসার পানি, মিনারেল ওয়াটার ইত্যাদি বিক্রয় করা যাবে। তবে প্রাণ রক্ষার জন্য এ ধরনের পানিও অন্যকে বিনা মূল্যে প্রদান করা ওয়াজিব।

৬. **বায়‘ ফাসিদ :** যে ক্রয়-বিক্রয় মূলগত শারি‘আহসম্মত কিন্তু গুণগত দিক দিয়ে শারি‘আহসম্মত নয়, তাকে বায়‘ ফাসিদ বলে। যেমন, অনেক গাড়ি থেকে নির্দিষ্ট না করে কোন একটি গাড়ি বিক্রয় অথবা অনেক ঘর থেকে একটি ঘর বিক্রয় করা। অনেক গাড়ি হতে একটি গাড়ি বিক্রয় করা হলে কাঙ্খিত গাড়িটি নির্ধারণে উভয়ের মধ্যে কোন বিবাদ দেখা দিলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। বায়‘ ফাসিদে মালামাল ক্রেতার হস্তগত হলে তিনি তার মালিক হবেন এবং ক্রয়-বিক্রয় বৈধ ও কার্যকর হবে। বায়‘ ফাসিদের অধীনে ক্রেতার হস্তগত অবস্থায় মালামাল ধ্বংস কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।[১১০]

বায়‘ বাতিল কয়েক প্রকারে হতে পারে। যেমন–

(ক) অজ্ঞাত বস্তু বিক্রয় করা : পণ্য অথবা মূল্যের কোন একটি অজ্ঞাত থাকলে তা ক্রয়-বিক্রয় করা বায়‘ ফাসিদ হবে। কেননা, এ ধরনের অজ্ঞতা পণ্যটি সমর্পণ ও মূল্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

---

১০৯. *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী‘আহর নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

(খ) শর্তযুক্ত বিক্রয় : শর্তসাপেক্ষে কোন পণ্য বিক্রয় করা বায়‘ ফাসিদ। যেমন– কোন ক্রেতা বিক্রেতাকে প্রস্তাব করলেন, আমি আপনার কাছে এ বাড়িটি এ মূল্যে বিক্রয় করলাম, যদি অমুক ব্যক্তি তার বাড়িটি আমার কাছে বিক্রয় করে। অনুরূপভাবে ভবিষ্যত সময়ের সাথে শর্তযুক্ত করে বিক্রয় করাও বায়‘ ফাসিদ। যেমন– কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে বললেন, আমি আগামী মাসে আপনার কাছে এ গাড়িটি এত মূল্যে বিক্রয় করলাম।

(গ) অদৃশ্য বস্তু বিক্রয় : অদৃশ্য বস্তু ক্রয়-বিক্রয় বায়‘ ফাসিদ। কেউ কোন অদৃশ্য বস্তু বিক্রয় করলে ক্রেতা কর্তৃক তা দেখার পর ক্রয়-বিক্রয় সংঘটনের ব্যাপারে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। কেননা, মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি না দেখে কোন বস্তু ক্রয় করলে দেখার পর তা ক্রয় করা বা না করার ব্যাপারে তার ইখতিয়ার থাকবে। তবে মোড়কে আবৃত খাদ্য-দ্রব্য, ঔষধ ইত্যাদি না দেখেই ক্রয় করা বৈধ। কেননা, এতে প্রতারণার আশঙ্কা কম।

(ঘ) বায়‘ ইনা : কোন ব্যক্তি তার পণ্যটি অন্যের কাছে বাকিতে বিক্রয় করার পর আবার ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে তা নগদে ক্রয় করে নেয়াকে বায়‘ ইনা বা বায়‘ ব্যাক বলে। এটি বায়‘ ফাসিদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে দশ হাজার টাকায় একশ’ ছাতা এক বছর পর মূল্য গ্রহণের শর্তে বিক্রয় করলেন। অতঃপর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে আট হাজার টাকা নগদ মূল্যে উক্ত ছাতা ক্রয় করে নিলেন। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে বায়‘-এর সকল উপাদান পাওয়া গেলেও কৌশলে সুদ গ্রহণের আশঙ্কা থাকায় বৈধ নয়।

(ঙ) এক বিক্রয়ের ভিতরে দুই বিক্রয় অথবা দু‘টি শর্ত আরোপ করে ক্রয়-বিক্রয় করা : এক বিক্রয়ের ভিতরে দুই বিক্রয় অথবা এক বিক্রয়ে দু‘টি শর্ত আরোপ করে ক্রয়-বিক্রয় করা বায়‘ ফাসিদের অন্তর্ভূক্ত। যেমন– কোন বিক্রেতা বললেন, আমি এ জিনিসটি আপনার কাছে নগদে এক হাজার টাকায় এবং বাকিতে দুই হাজার টাকা বিক্রয় করতে রাযি। এ দু‘টির মধ্যে আপনি যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। অথবা এভাবে শর্তযুক্ত করল, আমি আপনার কাছে আমার ঘরটি এ শর্তে বিক্রয় করলাম যে আপনি আপনার ঘরটি আমার কাছে আবার বিক্রয় করবেন।

(চ) ফল বা শস্য উৎপাদনের পূর্বে বিক্রয় : কোন নির্দিষ্ট গাছে ফল ধরার পূর্বে অথবা কোন নির্দিষ্ট জমিনে ফসল উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা সর্বসম্মতভাবে অবৈধ। কেননা, মহানবী সা. অস্থিত্বহীন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

বায়‘ মুআজ্জালের শারি‘আহ নীতিমালা :

বায়‘ মুআজ্জাল মূলত বায়‘ বা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি। এ কারণে বায়‘ তথা ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত শারি‘আহর সকল নীতিমালা এ পদ্ধতিতে পরিপালন করতে হবে। মুরাবাহা অধ্যায়ে বর্ণিত ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন, শর্তাবলী, বায়‘ বাতিল ও ফাসিদ, বিক্রয়ের পূর্বে পণ্যের মালিকানা ও দখল লাভ ইত্যাদি যাবতীয় শার‘ই নীতিমালা বায়‘ মুআজ্জালের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

বায়‘ সালামের শারি‘আহ নীতিমালা :

বায়‘ সালামের ক্ষেত্রে মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা নিম্নরূপ–[১১১]

---

১১১. AAOIFI, শারি‘আহ স্ট্যান্ডার্ড নং-১০, মে ২০০২, পৃ. ১৭০-১৭১

১. বায়' সালামে পণ্য অথবা সেবাকে মূল্য হিসেবে গণ্য করা বৈধ। পণ্য– যেমন, গম ও অনুরূপ দানাদার শস্য অথবা পশু-পাখিকে বায়' সালামে মূল্য হিসেবে প্রদান করা যাবে। অনুরূপভাবে নির্ধারিত সময়ের জন্য ভাড়াযোগ্য বাসা ব্যবহার কিংবা বিমান বা জাহাজ ভ্রমণ ইত্যাদি সেবাও বায়' সালামের ক্ষেত্রে মূল্য হতে পারে।

২. বায়' সালামে ঋণকে পণ্যের মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা বৈধ হবে না। সে ঋণ নগদ অর্থেই হোক কিংবা লেনদেনের কারণে সৃষ্ট হোক।

৩. পরিমাণযোগ্য, ওজনযোগ্য, গণনাযোগ্য, পরিমাপযোগ্য ইত্যাদি পণ্যের ক্ষেত্রে বায়' সালাম করা বৈধ।

৪. বায়' সালামে বিক্রির জন্যে কারো মালিকানাধীন কোন পণ্যকে নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। যেমন, বিক্রেতা কারো মালিকানাধীন কোন গাড়ি দেখিয়ে বললেন যে, এ গাড়ি বায়' সালামে বিক্রয় করা হবে। এরূপ নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। তবে গাড়িতে বায়' সালাম করার ক্ষেত্রে গাড়ির ধরন, বিবরণ, ব্রান্ডের নাম ইত্যাদি উল্লেখ করা বৈধ এবং তা জরুরিও।

৫. কোন নির্দিষ্ট গাছের ফল বা ভূমির ফসলকে বায়' সালামের জন্য নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। বায়' সালামে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পণ্য ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়াই বিক্রেতার দায়িত্ব। বিক্রেতা সে পণ্য তার নিজের শস্যক্ষেত বা শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন আবার অন্য কারো ভূমি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন।

৬. বায়' সালামে পণ্যটি নগদ অর্থ, স্বর্ণ অথবা রৌপ্য হওয়া বৈধ নয় যদি মূল্য অনুরূপ নগদ অর্থ, স্বর্ণ অথবা রৌপ্য হয়।

৭. বায়' সালামে পণ্য পাওয়ার নিশ্চয়তাস্বরূপ বিক্রেতার নিকট থেকে বন্ধক, গ্যারান্টি অথবা এ জাতীয় যে কোন বৈধ দলিল গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮. বায়' সালামে বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্য ক্রেতার কবদ বা দখলে আসার পূর্বে ক্রেতা তা অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারবেন না।

৯. বায়' সালামে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে বিক্রেতা চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্যের পরিবর্তে বিকল্প পণ্য সরবরাহ করতে পারবেন।

১০. ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে সম্পূর্ণ মূল্য ফেরতসাপেক্ষে বিক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে অর্থাৎ চুক্তিটি বাতিল করা যাবে। অনুরূপভাবে মূল্য আংশিক ফেরতসাপেক্ষে আংশিক পণ্য সরবরাহ থেকেও তাকে অব্যাহতি দেয়া যাবে।

১১. চুক্তিতে উল্লিখিত বর্ণনা ও পরিমাণ অনুযায়ী মেয়াদান্তে ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ করা বিক্রেতার কর্তব্য। অনুরূপভাবে চুক্তিতে উল্লিখিত বর্ণনা মুতাবিক হলে পণ্য গ্রহণ করাও ক্রেতার কর্তব্য। এক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে।[১১২]

১২. বিক্রেতা চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্যের মানের চেয়ে ভাল মানের পণ্য সরবরাহ করলে তা গ্রহণ করা ক্রেতার জন্য আবশ্যক। তবে এক্ষেত্রে বিক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য দাবি করতে পারবেন

---

১১২. *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

না। এটাকে উত্তমভাবে পরিশোধ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। তবে চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্যের নির্দিষ্ট মানই ক্রেতার লক্ষ্য না হলেই এটা করা যাবে।

১৩. বর্ণনা ও পরিমাণ অনুযায়ী হলে নিধারিত মেয়াদের আগে পণ্য সরবরাহ করা বৈধ। তবে তা গ্রহণ করতে ক্রেতার আপত্তি থাকলে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

১৪. অসচ্ছলতার কারণে বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে।

১৫. গ্রাহক চুক্তি মুতাবিক নির্দিষ্ট সময়ে বায়‘ সালামের মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে, যেদিন থেকে গ্রাহক উক্ত মালামালের অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করেছেন সেদিন হতে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হলে তা বৈধ আয় হিসাবে গণ্য হবে না। তবে মালামাল নির্দিষ্ট তারিখে নির্ধারিত স্থানে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে সরবরাহের তারিখ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যেতে পারে।

১৬. বাজারে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পণ্য পাওয়া না যাওয়ার কারণে বিক্রেতা নির্দিষ্ট পণ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম না হলে নিম্নের যে কোন একটি পন্থা বেছে নেয়ার ইখতিয়ার ক্রেতার থাকবে :

(ক) বিক্রেতা কর্তৃক বাজারে পণ্য পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

(খ) চুক্তি ভঙ্গ করা ও মূল্য ফেরত নেয়া।

(গ) অথবা চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্য বদল করে অন্য পণ্য গ্রহণ করা।

১৭. বায়‘ সালামের প্রথম চুক্তিতে যে পণ্য সরবরাহের কথা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী পণ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে সমান্তরাল সালাম চুক্তি করা বিক্রেতার জন্য বৈধ, যাতে বিক্রেতা প্রথম চুক্তির দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রথম বায়‘ সালাম চুক্তির বিক্রেতা অনুরূপ দ্বিতীয় চুক্তিতে ক্রেতা গণ্য হবেন।

১৮. প্রথম চুক্তিতে যে পণ্য ক্রয়ের কথা বলা হয়েছে সে পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে সমান্তরাল বায়‘ সালাম ক্রেতার জন্যও বৈধ, যাতে তিনি পণ্যটি বিক্রয় করতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রথম বায়‘ সালাম চুক্তির ক্রেতা দ্বিতীয় চুক্তিতে অনুরূপ বিক্রেতা গণ্য হবেন।

১৯. উপরিউক্ত উভয় ক্ষেত্রে একটি বায়‘ সালাম চুক্তিকে আরেকটি বায়‘ সালাম চুক্তির সাথে যুক্ত করা বৈধ নয়; বরং উভয় চুক্তিতেই পক্ষদ্বয়ের অধিকার ও কর্তব্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। সুতরাং প্রথম বায়‘ সালাম চুক্তির ক্ষেত্রে কোন একপক্ষ চুক্তির শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে অপরপক্ষ শর্ত পালনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ তা সামন্তরাল সালাম চুক্তির পক্ষের উপর চাপিয়ে দিতে পারবেন না।

২০. বায়‘ সালামের অন্যান্য বিধান সমান্তরাল বায়‘ সালামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

২১. বিনিময়যোগ্য সালাম বন্ড ইস্যু করা বৈধ হবে না। কেননা, তাতে বায়‘ সালামের পণ্য কবদ করার তথা দখলে আসার আগেই তা বিক্রি করার পর্যায়ে পড়ে।[১১৩]

ইজারা বিল বায়‘ তাহতা শিরকাতুল মিলক-এর শারি‘আহ নীতিমালা :

ইজারা বিল বায়‘ তাহতা শিলকাতুল মিলককে ব্যাংকিং পরিভাষায় এইচপিএসএম পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতির শারি‘আহ নীতিমালা নিম্নরূপ–

---

১১৩. *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী‘আহ্‌র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

এইচপিএসএম পদ্ধতিতে চুক্তিসংক্রান্ত শারি'আহ নীতিমালা :

১. চুক্তি এবং সম্পদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে উভয়পক্ষের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।
২. চুক্তিটি সম্পাদন কিংবা সম্পদ ব্যবহারের দিন থেকে কার্যকর হবে।
৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভাড়াকৃত সম্পত্তি নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেলে ভাড়াদাতা যদি তার পরিবর্তে একই মানসম্পন্ন অপর একটি সম্পত্তি তাকে প্রদান করেন তাহলে ভাড়াচুক্তি বাতিল হবে না।
৪. ভাড়াগ্রহীতা এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবেন যে, তিনি ভাড়াদাতার কাছ থেকে এককালীন অথবা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করে ভাড়াকৃত সম্পদ ক্রয় করে নিবেন।
৫. এইচপিএসএম-এর ক্ষেত্রে ভাড়াচুক্তি ও ক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণ আলাদা হবে। ফলে ভাড়া কোনক্রমেই পণ্যের মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবে না।
৬. এ চুক্তির কোন ধারা বা উপধারা শারি'আহ বিরোধী হতে পারবে না।
৭. কোন কারণে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা সম্পদে গ্রাহকের পূর্ণ মালিকানা অর্জিত হওয়ার পূর্বে চুক্তিটি বাতিল করতে হলে উক্ত সম্পদে উভয় পক্ষের অংশীদারিত্ব থাকবে।
৮. ব্যাংকের নিরাপত্তার জন্য এইচপিএসএম বিনিয়োগের বিপরীতে প্রয়োজনীয় বন্ধক, জামানত ও গ্যারান্টি গ্রহণ করা যাবে।
৯. ভাড়া চুক্তি একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি। কোন পক্ষই এককভাবে তা রদ করতে পারবে না।[১১৪]

এইচপিএসএম পদ্ধতিতে ভাড়াসংক্রান্ত শারি'আহ নীতিমালা :

১. এইচপিএসএম-এর সম্পত্তিটি অবশ্যই ভাড়াযোগ্য হতে হবে। সম্পদ ব্যবহার উপযোগী না হলে তার উপর ভাড়া ধার্য করা বৈধ নয়।
২. এইচপিএসএম-এর সম্পদ প্রস্তুত করার জন্য কিংবা ব্যবহার উপযোগী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে ভাড়া বা চার্জ আদায় করা যাবে না। এজন্য চুক্তিতে অবকাশকালীন সময়ের উল্লেখ থাকতে হবে।
৩. চুক্তি অনুসারে ভাড়া অগ্রিম, বিলম্বে কিংবা কিস্তিতে প্রদান করা বৈধ।
৪. ভাড়াদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের সম্মতিক্রমে ভাড়ার পরিমাণ ও মেয়াদ পরিবর্তন করা যাবে।
৫. ভাড়ার মেয়াদের মধ্যে ভাড়াগ্রহীতা তৃতীয় কোন পক্ষের কাছে ভাড়াকৃত সম্পদ পুনরায় ভাড়া দিতে পারবেন যদি সম্পদের কোন ক্ষতি না হয় এবং ভাড়াদাতা কর্তৃক কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকে।
৬. ভাড়া চুক্তিতে প্রত্যেকটি ইউনিটের ভাড়া ও সময় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
৭. ভাড়াকৃত সম্পদ থেকে উপকার লাভ করাটা শারি'আহর দৃষ্টিতে বৈধ হতে হবে।
৮. ব্যাংকের কোন একটি অংশের মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তরিত হলে গ্রাহক উক্ত অংশের মালিক হবে। হস্তান্তরিত উক্ত অংশের উপর গ্রাহকের নিকট থেকে আর কোন ভাড়া আদায় করা যাবে না।
৯. সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলে তার ভাড়া আদায় করা যাবে না। যেমন– এইচপিএসএম পদ্ধতিতে বিনিয়োগকৃত কোন গাড়ি দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে তার ভাড়া আদায় করা যাবে না।

---

১১৪. *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহ্‌র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

১০. এইচপিএসএম পদ্ধতিতে ভাড়ায় প্রদত্ত সম্পদ বা মেশিনারিজ ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে গেলে তার ভাড়া আদায় করা বৈধ হবে না। তবে সম্পদ ব্যবহারযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহক তা ব্যবহার না করলে সেটার দায়-দায়িত্ব তার। এজন্য তিনি ভাড়া পরিশোধ করার দায় থেকে অব্যাহতি পাবেন না। যেমন– কেউ কারো কাছে একটি বাড়ি ভাড়া দিলেন, কিন্তু ভাড়াটিয়া উক্ত বাড়িতে বসবাস না করলে মালিকের কোন ক্ষতি নেই। চুক্তি অনুযায়ী ভাড়াটিয়া বাড়ি ভাড়া যথারীতি পরিশোধ করতে বাধ্য হবেন। কেননা, রাসুল সা. বলেছেন, 'মুসলিমরা তাদের শর্তের উপর থাকবে যদি না তা কোন হারামকে হালাল করে কিংবা কোন হালালকে হারাম করে।'[১১৫]

এইচপিএসএম পদ্ধতিতে মালিকানা সংক্রান্ত শারি'আহ নীতিমালা :

১. সম্পদে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের মালিকানা থাকতে হবে। শুধু ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে শিরকাতুল মিলক হবে না। এক্ষেত্রে হায়ার পারচেজ চুক্তি সম্পাদন করা হলেও শিরকাতুল মিলক হবে না।

২. ক্রয়কৃত সম্পদে ব্যাংক ও গ্রাহকের অংশ ও মালিকানার বিষয়টি চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে ভাড়াদাতা ও গ্রহীতার ইক্যুইটি অনুযায়ী সম্পদে তাদের মালিকানা চিহ্নিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪. এইচপিএসএম চুক্তিপত্রে ভাড়া প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়পক্ষের প্রকৃত মালিকানা অবশ্যই স্বীকৃত হতে হবে। অবশ্য উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে তাদের যে কোন একজনের নামে অথবা তৃতীয় পক্ষের নামেও সম্পদটি রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন করা যাবে। তবে ইসলামি ব্যাংকের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের নামে সম্পদের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫. সম্পদের ভাড়াকৃত অংশের মালিকানা ব্যাংকের থাকবে এবং সম্পদ ব্যবহারের বিনিময়ে গ্রাহক ভাড়া প্রদান করবেন। ভাড়াকে সম্পদের মূল্য অথবা মূল্যের অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না।[১১৬]

এইচপিএসএম পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত শারি'আহ নীতিমালা :

১. শিরকাতুল মিলক হওয়ার কারণে এ পদ্ধতিতে মঞ্জুরিকৃত টাকা সরাসরি গ্রাহকের একাউন্টে কিংবা তাকে নগদ প্রদান করা যাবে। কেননা, শিরকাতুল মিলক হচ্ছে দুই বা ততোধিক পক্ষ যৌথভাবে সম্পদের মালিক হওয়া কিংবা কোন সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য চুক্তি করা। এ কারণে শিরকাতুল মিলক পদ্ধতিতে সম্পদ ক্রয়ের জন্য যে কোন অংশীদারকে দায়িত্ব দেয়া শারি'আতে বৈধ। কিস্তিতে মূল্য পরিশোদের মাধ্যমে ব্যাংকের অংশের মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তরের অঙ্গীকার তখনই কার্যকর হবে, যখন তা পৃথক বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

২. সম্পদ ক্রয় থেকে শুরু করে ব্যাংকের অংশ গ্রাহকের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া পর্যন্ত এইচপিএসএম চুক্তিটি বলবৎ থাকবে।

---

১১৫. আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা আত-তিরমিযি, *জামি' আত-তিরমিযি*, কিতাবুল আহকাম

১১৬. *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহ্‌র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৩. ভাড়াদাতা ভাড়াযোগ্য সম্পদটি ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় যেদিন গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করবেন, সেদিন থেকেই ভাড়া চুক্তিটি কার্যকর হবে।

৪. ভাড়াদানকারী কর্তৃক ভাড়াগ্রহীতার কাছে সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরের উপরই বিক্রয় চুক্তির কার্যকারিতা নির্ভর করে।

৫. প্রতিটি কিস্তি প্রদানের সাথে সাথে সম্পদের উপর গ্রাহকের আংশিক মালিকানা অর্জিত হবে।

৬. এইচপিএসএম চুক্তিটি কার্যকর করা ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক।

৭. এ চুক্তি অনুসারে ব্যাংক অংশীদার, ভাড়াদাতা ও বিক্রেতা হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে গ্রাহক একজন অংশীদার, ভাড়াগ্রহীতা ও ক্রেতা হিসেবে কাজ করে।

৮. ইক্যুইটি অনুসারে উভয় অংশীদার সম্পদের মালিকানা সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বহন করবেন।

৯. এ চুক্তি অনুসারে ভাড়াগ্রহীতার ভূমিকা একজন ট্রাস্টির মত। সম্পদটি তার কাছে ট্রাস্টের সম্পত্তির মত। তিনি উক্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। অবশ্য তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোন দুর্ঘটনা অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সম্পদের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হলে তা পৃথক কথা।[১১৭]

এইচপিএসএম পদ্ধতিতে খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত শারি'আহ নীতিমালা :

১. সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণজনিত দৈনন্দিন সাধারণ ব্যয় বহনের দায়িত্ব ভাড়াগ্রহীতার উপর অর্পণ করা বৈধ।

২. ভাড়াকালীন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভাড়াগ্রহীতার। তবে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, অবহেলা কিংবা ভুল-ভ্রান্তির কারণে সম্পদের কোন ক্ষয়-ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে এর জন্য তিনি দায়ি হবেন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।

৩. ব্যাংকের পূর্বানুমতি ছাড়া গ্রাহক ভাড়াকৃত সম্পদের কোন পরিবর্তন সাধন কিংবা স্থানান্তর করতে পারবেন না।

৪. এইচপিএসএম পদ্ধতিতে বিনিয়োগকৃত কোন সম্পদ বা মেশিনারিজের ইন্স্যুরেন্স ক্লেইম পাওয়া গেলে সম্পদে গ্রাহক ও ব্যাংকের মালিকানার আনুপাতিক হারে তা বণ্টন করা হবে।

ইসতিসনা'র শারি'আহ নীতিমালা :

১. ইসতিসনা চুক্তিতে পণ্যের স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকতে হবে। পণ্যের ধরন, শ্রেণী, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য চুক্তিতে উল্লেখ করা জরুরি। এর ফলে পরবর্তীতে কোন ভুল বুঝাবুঝি বা বিবাদ এড়ানো যাবে।

২. চুক্তিতে সম্মত দাম উল্লেখ করতে হবে। দাম কখন কিভাবে পরিশোধ করা হবে তাও চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে।

৩. পণ্য কখন, কোথায়, কার খরচে সরবরাহ করা হবে তার উল্লেখ চুক্তিতে থাকতে হবে।

৪. পক্ষগণ রাযি হলে বিক্রেতাকে পণ্যের আংশিক বা পুরা দাম অগ্রিম দেয়া যেতে পারে অথবা বাকি রাখা যেতে পারে।

৫. ইসতিসনা চুক্তিতে মাল সরবরাহের সময়সীমা নির্ধারণ জরুরি নয়। মেয়াদ নির্ধারণ না করেও ইসতিসনা চুক্তি করা যায়। তবে বিরোধ এড়ানোর জন্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারণ করা ভাল।

---

১১৭. *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহর নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৬. চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পণ্যের পূর্ণ বা আংশিক দাম পরিশোধ হওয়ার পর কোন পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারবেন না।
৭. কোন পক্ষ ইচ্ছাকৃত চুক্তি ভঙ্গ করলে দায়ি পক্ষের উপর নির্দিষ্ট জরিমানা আরোপ করা যাবে। এরূপ শর্ত ইসতিসনা চুক্তিতে রাখা যাবে।
৮. সমকালীন ফকিহগণের মতে ইসতিসনার ক্ষেত্রে আরোপিত ক্ষতিপূরণ ব্যাংকের বৈধ আয়রূপে বিবেচিত হবে।

মুশারাকার শারি'আহ নীতিমালা : মুশারাকা বিনিয়োগ পদ্ধতিতে কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে শারি'আহর নীতিমালা নিম্নরূপ–

মুশারাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট শারি'আহ নীতিমালা : মুশারাকা বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক অংশীদারের অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। আবার অংশীদারগণ যে কোন এক বা একাধিক অংশীদারকেও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। নিম্নে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার উল্লেখ করা হলো–

১. মুশারাকা কারবারে প্রত্যেক অংশীদার নিজের পক্ষ থেকে এবং অন্যান্য অংশীদারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
২. মুশারাকা কারবারের প্রত্যেক অংশীদার কারবারের ব্যবস্থাপনার কাজ যেমন– পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি সম্পাদন করতে পারেন। আবার কোন একজন অংশীদারও তা সম্পাদন করতে পারেন। যদি একজন অংশীদার সম্পাদন করেন তাহলে তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বেতন-ভাতার অধিকারী হবেন।
৩. অংশীদারগণ কারবারের কাজের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবেন এবং শ্রমিকের পারিশ্রমিক কারবার থেকে বহন করতে হবে।
৪. মুশারাকা বিনিয়োগে সকল অংশীদারের সম্মতি ছাড়া কোন একজন অংশীদার ব্যবসায়ের জন্য ঋণ গ্রহণ এবং ব্যবসায়ের ফান্ড থেকে তৃতীয় পক্ষকে ঋণ ও দান-অনুদান প্রদান করতে পারবেন না।

মুশারাকা মূলধন সংশ্লিষ্ট শারি'আহ নীতিমালা : মুশারাকা মূলধন সংশ্লিষ্ট নীতিমালাগুলো হলো–

১. মুশারাকার মূলধন হতে হবে নগদ অর্থে। যদিও কিছুসংখ্যক ফকিহ পণ্যকে মুশারাকার মূলধন হিসেবে গণ্য করা বৈধ বলেছেন। তাদের মতে, ব্যবসার শুরুতেই মূল্য নির্ধারণপূর্বক যে পণ্যকে নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায় তা মুশারাকার মূলধন হিসেবে গ্রহণ করা যায়।[১১৮]
২. মুশারাকা মূলধনের পরিমাণ, ধরন ও শ্রেণি নির্দিষ্ট হতে হবে।
৩. মুশারাকা ব্যবসায় কোন অংশীদারের মালিকানাধীন সম্পদকে মুশারাকার মূলধন হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, তবে উক্ত সম্পদের স্বত্ব ত্যাগ করে মুশারাকা ব্যবসায় প্রদান করা হলে কোন অসুবিধা নেই।[১১৯]

---

১১৮. আততামওয়িল বিল মুশারাকা (التمويل بالْمشاركة), মারকাযুল ইকতিসাদ আল ইসলামি, আল মাছরিফুল ইসলামি আদদুয়ালি লিল ইসতিসমারি ওয়াত্ তানমিয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১১৯. *শিরকাতুল ইনান ম্যানুয়েল*(ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ম্যানুয়েলটি তৎকালীন শারি'আহ কাউন্সিলের ৯ জুন ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০৪ তম অধিবেশনে অনুমোদিত হয়)

৪. মুশারাকা ব্যবসায়ে কোন অংশীদারের বিশেষ কোন সম্পদকে মিশ্রিত করা বৈধ নয়।[১২০]

৫. সকল অংশীদারের মূলধন সমান হওয়া শর্ত নয়।

মুশারাকায় লাভ-লোকসান বণ্টন-সংশ্লিষ্ট শারি'আহ নীতিমালা : মুশারাকা লাভ-লোকসান বণ্টন-সংশ্লিষ্ট নীতিমালাগুলো হলো–

১. মুশারাকা চুক্তিতে লাভ-লোকসান বণ্টনের নীতিমালা পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট হতে হবে।

২. অংশীদারদের কেউ যদি মুশারাকা কারবারে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন অথবা কার্যাবলি বাস্তবায়নে অংশ নেন, তাহলে এসব কাজের বিপরীতে তার জন্য লভ্যাংশ নির্ধারণ করা যাবে। এটা তার প্রাপ্য অধিকার। আর অবশিষ্ট অংশীদারগণ সকলের সম্মতির ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত হার অনুযায়ী লভ্যাংশ পাবেন।[১২১]

৩. মুশারাকা কারবারে বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে লভ্যাংশ আনুপাতিক হারে যেমন– অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ, অথবা শতকরা হার যেমন– ২০%, ৩০%, ৪০%, ৫০% ইত্যাদি নির্ধারণ করা যাবে।

৪. মুশারাকা ব্যবসায়ে লোকসান হলে এবং এসব লোকসান অংশীদারদের মধ্য থেকে যারা পরিচালনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে আছেন তাদের অনীহা অথবা চুক্তির শর্তাবলীর পরিপন্থী কোন কার্যকলাপের জন্য না হয়ে থাকলে অংশীদারগণ মূলধনের অংশ অনুপাতে লোকসানের অংশ বহন করবেন। এক্ষেত্রে তাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হলেও অন্য কোন হার নির্ধারণ করা যাবে না।[১২২]

৫. ব্যবসায়ে লোকসান হলে অংশীদারদের মধ্যে যিনি পরিচালনার দায়িত্বে আছে তার উপর সকল ক্ষতির বোঝা চাপানো যাবে না। তবে ক্ষতি তার ত্রুটির কারণে হয়ে থাকলে এবং তা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ তার নিকট থেকে আদায় করা যাবে।

৬. মুশারাকা ব্যবসায়ে লাভ হলে কে কত অংশ পাবেন তা চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। কোন পক্ষের জন্য থোক আকারে লাভের পরিমাণ নির্ধারণ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ লাভের অনুপাত বা শতকরা হার নির্ধারণ করা যাবে।

৭. মুশারাকা ব্যবসায়ে লোকসান হলে পুঁজির অনুপাতে তা উভয়পক্ষকে বহন করতে হবে। চুক্তি বলে লোকসান থেকে কোন পক্ষের অব্যাহতি প্রদান বৈধ নয়। যেমন– এ মর্মে কোন পক্ষের মুশারাকা চুক্তি করা যে, তিনি ব্যবসায়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি সরবরাহ করবেন আর মাসে মাসে কিংবা বছরে ব্যবসার আয় থেকে তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা দেয়া হবে, কিন্তু তার পুঁজি অক্ষত থাকবে। এরূপ চুক্তি করা মুশারাকার ক্ষেত্রে শারি'আহ পরিপন্থী।[১২৩]

মুদারাবার শারি'আহ নীতিমালা : মুদারাবা পদ্ধতির শর্তাবলি সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি ও সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। রাসুল সা. তাঁর যুগে প্রচলিত মুদারাবা পদ্ধতিকে অনুমোদন

১২০. *শিরকাতুল ইনান ম্যানুয়েল*, প্রাগুক্ত

১২১. প্রাগুক্ত।

১২২. প্রাগুক্ত।

১২৩. *শিরকাতুল ইনান ম্যানুয়েল*, প্রাগুক্ত

করেছিলেন। তাই সে যুগের প্রচলিত মুদারাবা পদ্ধতি ও ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামের সাধারণ নীতিমালা ও বিধানের আলোকে ইসলামি চিন্তাবিদ ও ফকিহগণ মুদারাবা ব্যবসার জন্য কিছু নীতিমালা ও বিধান উল্লেখ করেছেন।

মুদারাবা সহিহ হওয়ার শর্ত : মুদারাবা শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তাকে প্রধানত দু'ভাবে ভাগ করা যায়–

১. মূলধনের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী;
২. লাভের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী।

মূলধনের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী : মূলধনের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নিম্নে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো–

১. মুদারাবার মূলধন নগদ অর্থ হতে হবে।[১২৪] কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদও মুদারাবার মূলধন হতে পারে। তবে তা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কিংবা উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাযথভাবে মূল্যায়নপূর্বক তা চুক্তিতে মূলধন হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। সম্পদের মূল্য নির্ণয়পূর্বক চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করা না হলে তা বৈধ হবে না। কারণ, মূলধন ও লাভ উভয়টি এখানে অজ্ঞাত রয়েছে। এ ধরনের অজ্ঞাত, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অস্পষ্টতাকে শারি'আতে গারার বলা হয়। গারারযুক্ত ব্যবসায়িক লেনদেন ও চুক্তি শারি'আতে বৈধ নয়।
২. মূলধনের পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কেননা, মুদারাবা চুক্তি শেষ হওয়ার পর তার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট না থাকলে মূলধন ফেরত নেয়ার সময় বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে।
৩. ব্যবসা শুরু করতে ও মুদারাবা চুক্তি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় মূলধনের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদারিবের কাছে সমর্পণ করতে হবে এবং তাকে মূলধন ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে। মূলধনের উপর সাহিবুল মালের হস্তক্ষেপ বিদ্যমান থাকলে উক্ত মূলধন দ্বারা মুদারাবা কারবার শুদ্ধ হবে না।[১২৫]
৪. সাহিবুল মাল ও মুদারিবের মধ্যে লাভের হার বা অনুপাত উল্লেখ থাকতে হবে। যেমন– অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ কিংবা ৩০ : ৭০ ইত্যাদি। কেননা, রাসুল সা. খায়বারবাসীর সাথে জমির ফসলের অর্ধেক পাওয়ার শর্তে মুদারাবা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।[১২৬]
৫. মুদারিবের কাছে সাহিবুল মালের প্রাপ্য কিংবা অন্য কারো কাছে সাহিবুল মালের প্রাপ্য ঋণকে মুদারাবা মূলধন হিসেবে গণ্য করা বৈধ হবে না।

লাভের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী :

১. মুদারাবা চুক্তিতে লাভের অনুপাত বা লাভের কত অংশ মুদারিবের এবং কত অংশ সাহিবুল মালের তা উল্লেখ করা আবশ্যক। লাভের অনুপাতের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ বা

---

১২৪. আততামওয়িল বিল মুদারাবা (التمويل بالمضاربة), মারকাযুল ইকতিসাদ আল ইসলামি, , প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১২৫. আততামওয়িল বিল মুদারাবা (التمويل بالمضاربة), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১২৬. আস-সাইয়িদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*(বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবি, ১ম প্রকাশ, ১৯৭১), খ.৩, পৃ. ২০৫

শতকরা হারে লাভ নির্ধারণ করা বৈধ নয়। কারণ, সাহিবুল মাল ও মুদারিবের মধ্যে যে কোন একজনের লাভের পরিমাণ নির্ধারিত রাখা হলে, আর কারবারে উল্লিখিত পরিমাণের বেশি লাভ অর্জিত না হলে চুক্তির শর্তানুসারে কেবল একজনই লাভের অধিকারী হবেন; অন্যজন হবেন বঞ্চিত।

২. মুদারাবা কারবারে মুদারিবের জন্য লাভের অংশ ও মজুরির অংশ একত্র করা বৈধ নয়।[১২৭] অর্থাৎ, পুঁজি ব্যবহারকারী মুদারিব হিসেবে লাভের কত অংশ পাবেন এবং শ্রমিক হিসেবে কত মজুরি পাবেন তা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে। কেননা, লাভের সঙ্গে মজুরির কোন সম্পর্ক নেই। মুদারাবা কারবারে কোন লাভ অর্জিত না হলেও শ্রমিক হিসেবে মুদারিব যে কাজ করবেন তার জন্য তিনি মজুরি পাবেন। আর কারবারে যে লাভ অর্জিত হবে তা মুদারিবের জন্য নির্ধারিত মজুরির চেয়ে বেশি না হলে তিনি কোন লাভই পাবেন না। মুদারাবা কারবার সংশ্লিষ্ট কোন সুনির্দিষ্ট কাজ যা মুদারিব শ্রমিক হিসেবে সম্পাদন করবেন, এর জন্য তাকে নির্ধারিত পারিশ্রমিক প্রদান করা বৈধ।

৩. চুক্তি করার সময়ই লাভ বণ্টনের হার নির্ধারণ করতে হবে। অনুরূপভাবে উভয়ের সম্মতিক্রমে পরবর্তীতে লাভ বণ্টনের হার পরিবর্তন করা বৈধ। তবে, এক্ষেত্রে চুক্তি বলবৎ থাকার মেয়াদ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।[১২৮]

৪. চুক্তির সময় লাভ বণ্টনের হার উল্লেখ না করা হলে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী লাভ বণ্টন করা হবে। আর কোন প্রচলিত নিয়ম না থাকলে মুদারাবা চুক্তি ভঙ্গ বা ফাসিদ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মুদারিব তার পারিশ্রমিকের মূল্য পাবেন। মুদারিব যে কাজ করেছেন অনুরূপ কাজের জন্য অন্যরা যেমন মজুরি পেয়ে থাকেন তিনিও ততটা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

৫. কোন পক্ষ নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ পাওয়ার শর্ত আরোপপূর্বক মুদারাবা চুক্তি করলে সে চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে। কিন্তু শর্ত করা হলে, লাভের একটা নির্দিষ্ট হার পর্যন্ত উভয়ে নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাগাভাগি করে নিবেন আর উক্ত হারের বেশি লাভ অর্জিত হলে তা মুদারিব বা সাহিবুল মালের কোন একপক্ষ পাবেন, তাহলে এটা বৈধ হবে।[১২৯]

৬. সাহিবুল মালের জন্য এটা বৈধ হবে না, তিনি দুই অংশে বিভক্ত করে মুদারিবকে মূলধন প্রদান করবেন এ শর্তে যে এক অংশের লাভ তার নিজের এবং অপর অংশের লাভ মুদারিবের। তার জন্য এরূপ করাও বৈধ নয় যে চুক্তির এক মেয়াদের লাভ তার এবং অবিশষ্ট মেয়াদের লাভ মুদারিবের কিংবা একটি ব্যবসায়িক ডিলের লাভ তার আর অপরটির লাভ মুদারিবের।[১৩০]

৭. মূলধন অক্ষত থাকা ব্যতীত মুদারাবার লাভ ধর্তব্য হবে না। মুদারাবার কোন কার্যক্রমে লোকসান হলে অন্যান্য কার্যক্রমের প্রাপ্ত লাভ দ্বারা তা পূরণ করা হবে। পূর্বের ক্ষতিকে পরবর্তী লাভের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং চুক্তির মেয়াদ শেষে মোট লাভের ভিত্তিতে প্রকৃত লাভ নির্ণয় করা হবে।[১৩১] মুদারাবা কারবারের শেষে অধিক পরিমাণে ক্ষতি পরিলক্ষিত হলে মোট ক্ষতি মূলধন থেকে বাদ দেয়া হবে। এটা মূলধনের ক্ষয় হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং এর

---

১২৭. AAOIFI, শারি‘আহ স্ট্যান্ডার্ড নং-১৩, মে ২০০২, পৃ. ২৪০

১২৮. প্রাগুক্ত।

১২৯. প্রাগুক্ত।

১৩০. প্রাগুক্ত।

১৩১. প্রাগুক্ত।

কিছুই মুদারিবকে বহন করতে হবে না। কেননা, মুদারিব আমানত সংরক্ষণকারী হিসেবে গণ্য। তবে তার সীমালজ্ঘন ও অবহেলার কারণে কোন ক্ষতি হলে তা তাকেই বহন করতে হবে। মুদারাবা ব্যবসার আয়-ব্যয় সমান হলে সাহিবুল মাল তার মূলধন বুঝে নিবেন। এমতাবস্থায় মুদারিব কিছুই পাবেন না। আর লাভ হলে উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হবে।

৮. মুদারিব তার কোন সম্পদ মুদারাবা ব্যবসার সাথে একীভূত করে ফেললে নিজের সম্পদের দ্বারা ব্যবসায়ের অংশীদার এবং অন্য সাহিবুল মালের সম্পদ দ্বারা মুদারিব বিবেচিত হবেন।[১৩২] মুদারিব তার নিজস্ব পুঁজির মাধ্যমে অংশীদার হিসেবে লাভ পাবেন এবং মুদারাবা কারবারের লাভ তার ও সাহিবুল মালের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হবে।

লক্ষণীয় যে, ইসলামে হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে অর্থ উপার্জনের হালাল নীতিমালা ও পন্থার যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে তার অনুসরণে ব্যাংকিং বিনিয়োগ পরিচালনা করলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

১৩২. AAOIFI, শারি'আহ স্ট্যান্ডার্ড নং-১৩, মে ২০০২, পৃ. ২৪০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শারি‘আহ নীতিমালা তদারকি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

ইসলামি ব্যাংকে ব্যাংকিং কার্যক্রমে শারি‘আহর নীতিমালা যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তার জন্য রয়েছে কিছু শারি‘আহ নীতিমালা তদারকি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ–

শারি‘আহ কাউন্সিল বা শারি‘আহ সুপাভাইজরি কমিটি : একটি ইসলামি ব্যাংকের কার্যক্রম শারি‘আহ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা তত্ত্বাবধান, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য ফিকহুল মু‘আমালাত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বাধীন সংস্থার নাম শারি‘আহ বোর্ড বা শারি‘আহ কাউন্সিল অথবা শারি‘আহ সুপারভাইজরি কমিটি। এ সংস্থার অবর্তমানে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের অস্তিত্ব চিন্তাই করা যায় না। শারি‘আহ বোর্ডের মর্যাদা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মর্যাদা বলতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে শারি‘আহ বোর্ডের আইনগত অবস্থান কোথায় তা বুঝানো হয়েছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান শারি‘আহ বোর্ডকে পরামর্শকের মর্যাদা দিয়ে থাকে তাকে শারি‘আহ সুপারভাইজরি বোর্ড বলা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানের শারি‘আহ বোর্ড সুপারভাইজরি মর্যাদা পেয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যে ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণ বাস্তবজীবনে ইসলামের যত বেশি অনুসারী এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থার প্রতি যত বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তারা শারি‘আহ বোর্ডকে তত বেশি ক্ষমতাবান করে থাকেন এবং এ ক্ষমতায়নকে আইনগতভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন।[১৩৩] এখানে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকের শারি‘আহ সুপাভাইজরি কমিটির তালিকা উপস্থাপন করা হলো–

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সুপারভাইজরি কমিটি :[১৩৪]

ক্রমিক	নাম	পদবি
১.	শাইখ মাওলানা মুহাম্মদ কুতুবুদ্দীন চেয়ারম্যান, বায়তুশ শরফ আঞ্জুমান-ই-ইত্তেহাদ বাংলাদেশ	চেয়ারম্যান
২.	মুফতি সাঈদ আহমদ প্রধান মুফতি, আল-জামিয়াতুস সিদ্দিকিয়া দারুল উলুম (মাদরাসা-ই-ফুরফুরা) দারুস সালাম, ঢাকা	ভাইস চেয়ারম্যান
৩.	ড. আবদুস সামাদ সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম, ঢাকা ক্যাম্পাস	সদস্য সচিব
৪.	মুহতারাম আবদুর রকীব সাবেক ইপি, আইবিবিএল	সদস্য

১৩৩. Board of Editors, Text Book on Islamic Banking, Ibid, pp. 367-372

১৩৪. Diary 2017, Islami Bank Bangladesh Limited, p. 16

ক্রমিক	নাম	পদবি
৫.	মুফতি শামসুদ্দীন (জিয়া) মুফতি, মুহাদ্দিস ও শিক্ষা বিষয়ক প্রধান আল-জায়িাতুল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম	সদস্য
৬.	ড. হাসান মুহা. মঈনুদ্দীন সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা	সদস্য
৭.	ড. মোঃ মনজুর-ই-ইলাহি সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্ট্যাডিজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮.	মাওলানা মহিউদ্দীন রাব্বানী মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া মারকাজুল উলূম, কর্নপাড়া, সাভার, ঢাকা	সদস্য

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর সুপারভাইজরি কমিটি :[১৩৫]

ক্রমিক	নাম	পদবি
১.	মুফতি সাঈদ আহমদ মুজাদ্দিদী	চেয়ারম্যান
২.	মোঃ আবদুর রহীম খান	সচিব
৩.	মুফতি শহীদ রাহমানি	সদস্য
৪.	মুহাম্মদ আবুল হুসাইন আল-আযহারি	সদস্য
৫.	আলহাজ্জ আবদুস সামাদ	সদস্য
৬.	মুফতি মঈনুল ইসলাম	সদস্য
৭.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই নাদভী	সদস্য
৮.	আলহাজ্জ আ.জ.ম. শামসুল আলম	সদস্য

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর সুপারভাইজরি কমিটি :[১৩৬]

ক্রমিক	নাম	পদবি
১.	মুফতি আবদুল হালিম বুখারি	চেয়ারম্যান
২.	ফরমান আর. চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	সদস্য সচিব
৩.	এম আযিযুল হক সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আইবিবিএল	সদস্য
৪.	অধ্যাপক হামিদুর রহমান সহকারি অধ্যাপক, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব টেকনলজি, গাজিপুর	সদস্য

---

১৩৫. Diary 2017, Al-Arafah Islami Bank Limited, p. 11

১৩৬. Diary 2017, Shahjalal Islami Bank Limited, p. 15

ক্রমিক	নাম	পদবি
৫.	মাওলানা ইউসুফ আবদুল মজিদ খতিব, তারা মসজিদ, ঢাকা	সদস্য
৬.	মুফতি শহিদ রাহমানি চিপ এক্সিকিউটিভ অফিসার, সেন্টার ফর ইসলামিক ইকনমিকস বাংলাদেশ, ঢাকা	সদস্য
৭.	ব্যারিস্টার এম. জিয়াউল হাসান হাসান এন্ড এসোসিয়েটস, ঢাকা	সদস্য
৮.	এম. কামালুদ্দিন চৌধুরী সাবেক চিপ এক্সিকিউটিভ অফিসার শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	সদস্য
৯.	আলহাজ্জ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ তাওহিদুর রহমান চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	সদস্য

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর সুপারভাইজরি কমিটি :[১৩৭]

ক্রমিক	নাম	পদবি
১.	শাইখ মাওলানা মুহাম্মদ কুতুবুদ্দীন চেয়ারম্যান, বায়তুশ শরফ আঞ্জুমান-ই-ইত্তেহাদ বাংলাদেশ	চেয়ারম্যান
২.	মুফতি সাঈদ আহমদ প্রধান মুফতি, আল-জামিয়াতুস সিদ্দিকিয়া দারুল উলুম (মাদরাসা-ই-ফুরফুরা) দারুস সালাম, ঢাকা	ভাইস চেয়ারম্যান
৩.	মাওলানা এম. শামাউন আলী	সদস্য সচিব
৪.	মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম	সদস্য
৫.	জনাব মুহাম্মদ আজহারুল ইসলাম	সদস্য
৬.	আলহাজ্জ মুহাম্মদ আবদুল মালেক ভাইস চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	পর্যবেক্ষক সদস্য
৭.	জনাব শহিদুল ইসলাম	পর্যবেক্ষক সদস্য
৮.	সৈয়দ ওয়াছেক মুহাম্মদ আলী ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	পর্যবেক্ষক সদস্য

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড-এর সুপারভাইজরি কমিটি :[১৩৮]

ক্রমিক	নাম	পদবি
১.	মাওলানা মুহাম্মদ সাদেকুল ইসলাম ইমাম ও খতিব, মহাখালী ডিওএইচএস জামে মসজিদ, ঢাকা	চেয়ারম্যান

১৩৭. Diary 2017, First Security Islami Bank Limited, p. 12
১৩৮. Diary 2017, EXIM Bank Limited, p. 10

ক্রমিক	নাম	পদবি
২.	আবুল কাশেম মুহাম্মদ সাফিউল্লাহ সিনিয়র এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, এক্সিম ব্যাংক	সদস্য সচিব
৩.	অধ্যাপক ড. এইচ. এম. শহিদুল ইসলাম বরকাতি ডাইরেক্টর, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	সদস্য
৪.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক প্রিন্সিপ্যাল, মদিনাতুল উলুম মডেল ইনস্টিটিউট বয়েজ কামিল মাদরাসা, তেজগাঁও, ঢাকা	সদস্য
৫.	হাফেজ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ খাইরুল্লাহ চিপ মুফতি, জামিয়া আম্বরশাহ আল-ইসলামিয়া, কাওরান বাজার, ঢাকা	সদস্য
৬.	প্রফেসর ড. আবু নোমান মোঃ রফিকুর রহমান চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ঢাকা	সদস্য
৭.	মিসেস নাসরিন ইসলাম	সদস্য
৮.	জনাব মোঃ নুরুল আমিন	সদস্য
৯.	জনাব মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ	সদস্য
১০.	জনাব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	সদস্য
১১.	এ.কে.এম. নুরুল ফজল বুলবুল	সদস্য
১২.	ড. মুহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, এক্সিম ব্যাংক	সদস্য

ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড-এর সুপারভাইজরি কমিটি :[১৩৯]

ক্রমিক	নাম	পদবি
১.	ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নিজামুদ্দীন নদভী	চেয়ারম্যান
২.	আবদুল হাই নদভী	সদস্য সচিব
৩.	মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিকী	সদস্য
৪.	মাওলানা মহিব্বুল্লাহ নদভী	সদস্য
৫.	মুফতি মুহাম্মদ শামসুদ্দিন জিয়া	সদস্য
৬.	মোর্তজা সিদ্দিক চৌধুরী	পর্যবেক্ষক সদস্য
৭.	শহিদুল হক	পর্যবেক্ষক সদস্য
৮.	মোঃ আবদুল কুদ্দুস	পর্যবেক্ষক সদস্য

সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ : সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামি ব্যাংক ও ইসলামি ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডোধারী ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় অলাভজনক ইসলামি প্রতিষ্ঠান। যার রেজিস্ট্রেশন নং : এস-৯৯২২/০৯। ইসলামি ব্যাংকিংব্যবস্থাকে শারি'আহর দিক-নির্দেশনা ও

১৩৯. Diary 2017, Union Bank Limited, p. 17

নীতিমালার আলোকে সঠিক পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ এবং সদস্য ব্যাংকসমূহকে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা এবং তাদের কার্যক্রম শারি'আহর নিরিখে তত্ত্বাবধান করা এর মূল উদ্দেশ্য।

সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ডের ভিশন

- বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামি ব্যাংকসমূহকে তাদের সকল কার্যক্রম ইসলামি শারি'আহ ও আইনের একই দিক-নির্দেশনা ও নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনা করাতে সামর্থ্যবান করা।
- বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামিকরণের প্রচেষ্টা চালানো যাতে কল্যাণমুখী ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে সামগ্রিক উন্নতির দিকে এগিয়ে নেয়া যায়।
- ইসলামি ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একে একটি বিশ্বখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শারি'আহ রেফারেন্স সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা।

সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ডের মিশন

- শারি'আহ নীতিমালার একই পদ্ধতি ও সর্বসম্মত কর্মপন্থা অনুসরণে সদস্য ব্যাংকসমূহকে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা এবং সদস্য ব্যাংকসমূহের কর্মকাণ্ডে শারি'আহ নীতিমালার বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা।
- ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ক বই-পুস্তক, জার্নাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশ, অনুবাদ ও বিতরণ করা।
- দ্রুত বিকাশমান ইসলামি ব্যাংকিং ও আর্থিক শিল্পের জন্য দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে শারি'আহ ও ব্যাংকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা।
- ইসলামি শারি'আহ মুতাবিক আর্থিক লেনদেন পরিচালনায় জনসাধারণের সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টি ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ডের ঐতিহাসিক পটভূমি

১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। এর অভাবনীয় সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ও সহযোগিতায় এরপর থেকে বাংলাদেশে নতুন নতুন শারি'আহভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এছাড়াও দেশে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রচলিত ব্যাংক তাদের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো চালু এবং কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তরের মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের অগ্রযাত্রায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ইসলামি ব্যাংকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামি ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের পরিসরও দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামি ব্যাংকসমূহ ও ইসলামি ব্যাংকিং শাখাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং ইসলামি ব্যাংকিংয়ের সঠিক ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সম্মিলিতভাবে যৌথ ও একক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা সময়ের অপরিহার্য দাবিতে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকসমূহের প্রধান নির্বাহীবৃন্দকে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

ইসলামি ব্যাংকিং নিয়মাচার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন শারি'আহ ইস্যুতে সম্মিলিতভাবে একক ও সামঞ্জস্যশীল নীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য ইসলামি ব্যাংকসমূহের শারি'আহ বোর্ড গঠনের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত নির্দেশনাপত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নির্দেশনাপত্রে প্রদত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ–

'ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রত্যেকের নিজস্ব শরীয়াহ বোর্ড বা কাউন্সিল স্ব স্ব ক্ষেত্রে ব্যাংকিং নিয়মাচার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন শরী'আহ ইস্যুতে সম্মিলিতভাবে একক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি-সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীয়াহ বোর্ড বা কাউন্সিলসমূহের সমন্বয়ে একটি যৌথ শরীয়াহ বোর্ড (Common Shariah Board) গঠন করা যায় কি না সে ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করা যেতে পারে।'[১৪০]

সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড প্রতিষ্ঠা :

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উক্ত নির্দেশনা প্রাপ্তির পর থেকেই একটি যৌথ শারি'আহ বোর্ড বা সম্মিলিত শারি'আহ বোর্ড গঠনের জন্য ইসলামি ব্যাংকসমূহ বিভিন্নভাবে উদ্যোগ-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অতঃপর ২০০১ সালের ১৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত এক সভায় ইসলামি ব্যাংকসমূহ একটি যৌথ শারি'আহ বোর্ড গঠনে একমত হয়। ঐতিহাসিক সে সভার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে সেদিনই প্রতিষ্ঠিত হয় সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শারি'আহ বোর্ড। বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ব্যাংকসমূহের শারি'আহ কাউন্সিল বা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিববৃন্দ এবং উক্ত ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ পদাধিকারবলে 'সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ'-এর সদস্য। বর্তমানে এর সম্মানিত সদস্য সংখ্যা ৮০ জন এবং সদস্য ব্যাংকের সংখ্যা ২৪টি।

সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড-এর সদস্যব্যাংকসমূহ :

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
২. আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৩. আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৪. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৫. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৬. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৭. এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড
৮. ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড
৯. প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামি শাখা)
১০. সাউথ-ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামি শাখা)
১১. প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামি শাখা)
১২. দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড (আল-মানারাহ)

---

১৪০. Guidelines for Conducting Islamic Banking, Bangladesh Bank, November 2009, BRPD Circular No. 15/2009, Section III, p. 10

১৩. ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামি শাখা)
১৪. এবি ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামি শাখা)
১৫. যমুনা ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামি শাখা)
১৬. ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড (ইসলামি শাখা)
১৭. ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামি শাখা)
১৮. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামি শাখা)
১৯. সোনালী ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামি শাখা)
২০. অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামি শাখা)
২১. পূবালী ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামি শাখা)
২২. ব্যাংক আল-ফালাহ (ইসলামি শাখা)
২৩. স্টান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক (সাদিক শাখা)
২৪. এইচএসবিসি (আমানাহ শাখা)

সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড-এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং পরিচালনায় শারি'আহ নীতিমালার একই পদ্ধতি ও সর্বসম্মত কর্মপন্থা অনুসরণে সদস্য ব্যাংকসমূহকে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করাই সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। এর অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ক বই-পুস্তক, জার্নাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও অনুবাদ, শারি'আহ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকর্ম পরিচালনা, সদস্য ব্যাংকসমূহের কর্মকাণ্ডে শারি'আহ নীতিমালার বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা, ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, মতবিনিময় সভা ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ইত্যাদি। সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

১. **ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ :** বিভিন্ন ব্যাংকে কর্মরত নির্বাহী ও কর্মকর্তা, কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক, মুফতি, ইমাম ও খতিবগণের জন্য ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। এ পর্যন্ত ৮৫৫ জন এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মকর্তাগণও রয়েছেন।

২. **ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা :** ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড থেকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট বিষয়ে 'রচনা প্রতিযোগিতা' আহ্বান করা হয়ে আসছে। স্কুল পর্যায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় এবং উন্মুক্ত পর্যায়– এ তিন গ্রুপের প্রত্যেক গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে যথাক্রমে নগদ ১৫, ১০ ও ৭ হাজার টাকা নির্ধারিত আছে।

৩. **ইসলামি ব্যাংকিং এ্যাওয়ার্ড :** বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের উপর বিশেষ অবদান রাখার জন্য সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রতিবছর 'ইসলামি ব্যাংকিং এ্যাওয়ার্ড' প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ এ্যাওয়ার্ডে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট এবং নগদ একলক্ষ টাকা সম্মানী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪. **প্রস্তাবিত 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন (খসড়া)' প্রণয়ন :** বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকসমূহ প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের জন্য প্রণীত 'ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১' দ্বারা

পরিচালিত হয়ে আসছে। পৃথক আইন না থাকায় সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড একটি খসড়া 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন' প্রণয়ন ও অনুমোদন করে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করেছে।

৫. **ব্যাংকিং বিষয় শারি'আহ ম্যানুয়েল প্রণয়ন :** শারি'আহভিত্তিক ব্যাংক পরিচালনা সহজতর করার লক্ষ্যে সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ডের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতির উপর শারি'আহ ম্যানুয়েল প্রণয়নের কার্যক্রম বর্তমানে এগিয়ে চলেছে।

৬. **আন্তঃইসলামি ব্যাংক মানি মার্কেট-এর নীতিমালা অনুমোদন :** নীতিগতভাবে কোন ইসলামি ব্যাংক তার তারল্যসংকট মোচনের জন্য প্রচলিত কলমানি মার্কেট থেকে সুদের ভিত্তিতে অর্থ ধার গ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই দেশের ইসলামি ব্যাংকসমূহ নিজেদের তারল্য সংকট বা উদ্বৃত্ত তারল্য পারস্পরিক সমঝোতা ও শারি'আহ নীতিমালার ভিত্তিতে যেন আদান-প্রদান করতে পারে, সেজন্য সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড 'আন্তঃইসলামি ব্যাংক মানি মার্কেট'-এর নীতিমালা অনুমোদন করেছে।

৭. **ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড প্রচলন :** সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড এদেশের ইসলামি ব্যাংকসমূহে প্রচলনের জন্য 'ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড' সম্পর্কে একটি 'রায়' প্রদান করেছে। এরই ভিত্তিতে বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক ইসলামিক ক্রেডিট কার্ডের প্রচলন করেছে।

৮. **মতবিনিময় সভা :** দেশের ইসলামি ব্যাংকসমূহের শারি'আহ বোর্ড বা কাউন্সিলের ফকিহ সদস্যবৃন্দকে একত্রীকরণ বা একই প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা হিসেবে সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড-এর উদ্যোগে সময়ে সময়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়ে আসছে। ফকিহ সদস্যগণের মানোন্নয়ন, শারি'আহ ব্যাংকিং বিষয়ে একই রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যাংকিং ক্ষেত্রে প্রচলিত বিভিন্ন আধুনিক বিষয় সম্পর্কিত ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ডের এ ধরনের মতবিনিময় সভা বেশ ফলপ্রসূ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

৯. **সদস্য ব্যাংক পরিদর্শন :** ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ডের প্রতিনিধিদল বিগত কয়েক বছর যাবত দেশের ইসলামি ব্যাংকসমূহ এবং ইসলামি ব্যাংকিং শাখাধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করে ব্যাংকসমূহের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়ে আসছে। উক্ত মতবিনিময়ের মাধ্যমে সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ডের প্রতিনিধিদল ইসলামি ব্যাংকিং পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের অবস্থান, অগ্রগতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা, বিশেষকরে শারি'আহ পরিপালনের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত হন এবং ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। ইসলামি ব্যাংকসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত এ পরিদর্শন কার্যক্রম ফলপ্রসূ হওয়ায় এবং সদস্য ব্যাংকসমূহের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর কমপক্ষে একবার অনুরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।[১৪১]

১৪১. *Text Book on Islamic Banking*, Ibid, p. 367

জেনারেল সেক্রেটারিয়েট : রাজধানীর গুলশানের বাড়ি নং ১৪৫ (ফ্ল্যাট-৭০৪), রোড-৩, ব্লক-এ, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ এ ঠিকানায় সেন্ট্রাল শারি'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ-এর জেনারেল সেক্রেটারিয়েট অবস্থিত। বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল এর প্রধান নির্বাহী। তার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী জেনারেল সেক্রেটারিয়েটের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নিয়োজিত আছেন। গবেষণা ও অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এখানে ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক বাংলা-ইংরেজি-আরবিসহ বিভিন্ন ভাষায় তিন সহস্রাধিক পুস্তকের সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার রয়েছে।

এ্যাকাউন্টিং এ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যানসিয়াল ইনস্টিটিউসন (আওইফি) : শারি'আহ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকিং এবং অন্যান্য ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিচালনায় সহায়তার লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ মর্মে ১৯৯১ সালের ২৭ মার্চ বাহরাইনে এ্যাকাউন্টিং এ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যানসিয়াল ইনস্টিটিউসন (আওইফি) একটি স্বাধীন ইসলামি আন্তর্জাতিক স্বায়ত্বশাসিত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় বাহরাইনে অবস্থিত। এর পূর্বে ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি মুতাবিক ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এ্যাকাউন্টিং, অডিটিং, গভর্নেন্স, ইথিকস এবং শারি'আহ বিষয়ক মানদণ্ড বা স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের লক্ষ্যে 'আওইফি' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৪২] ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক, দাল্লা আল বারাকা গ্রুপ, ফয়সাল গ্রুপ তথা দার আল মাল ইসলামি গ্রুপ, আল-রাযি ব্যাংকিং এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন, বাহরাইন মনিটারি এজেন্সি এবং কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ আওইফি প্রতিষ্ঠার চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থশিল্প যখন থেকে অনুভব করে যে, প্রচলিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড তাদের চাহিদা মিটনোর জন্য যথেষ্ট নয়; তখন থেকেই আওইফি প্রধান মানদণ্ড নির্ধারক সংগঠন হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করে। ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সংরক্ষণ, পরিচালনার মূলনীতি, লেনদেন পদ্ধতি ও বিনিয়োগের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে গ্রহণযোগ্য শারঈ' মান নির্ধারণ করা এর প্রধান কাজ। ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আওইফি এ্যাকাউন্টিং, অডিটিং, গভর্নেন্স, ইথিকস এবং শারি'আহ বিষয়ে এ পর্যন্ত ১০০ টি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করেছে এবং বিশ্বব্যাপী এ সকল মানদণ্ড প্রয়োগে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ স্ট্যান্ডার্ডগুলোর মধ্যে ৪০টি এ্যাকাউন্টিং, ১০টি অডিটিং, ১৩টি গভর্নেন্স, ৭টি কোড অব ইথিকস এবং ৩০টি শারি'আহ স্ট্যান্ডার্ড। এ ছাড়াও বর্তমানে আরও ৪০টি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, উন্নয়ন ও রিভিউর কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এ সকল স্ট্যান্ডার্ডের সফল প্রণয়ন ইসলামি অর্থব্যবস্থার অনুশীলনে অধিক সমন্বয় সাধনে সহায়তা করবে এবং ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থনৈতিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও নিশ্চিত করবে। বাহরাইন, সুদান, জর্ডান, মালয়েশিয়া, কাতার, সাউদি আরব এবং দুবাইসহ বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় ইসলামি ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে আওইফি কর্তৃক প্রণীত মানদণ্ড অনুসৃত হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের ২৫টি দেশে আওইফির সদস্য সংখ্যা ১১৩। এ সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দ্রুত অগ্রগতিতে শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে আওইফির প্রতি আস্থার প্রতিফলন ঘটছে। এ

---

১৪২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামিক ফাইন্যান্স : আওইফি পরিচিতি*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শারী'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ-এর বুলেটিন, মে ২০০৫), পৃ. ৬

সকল মানদণ্ডের প্রয়োগে উৎসাহ প্রদান এবং নতুন মানদণ্ডের বিকাশ ছাড়াও আওইফি নিয়মিতভাবে রেগুলেটরি ও শারি‘আহ ইস্যু নিয়ে কনফারেন্সের আয়োজন করে আসছে। এ সকল কনফারেন্সে আলোচনা ও বিতর্কে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত, গবেষক, নীতি নির্ধারক ও প্র্যাকটিশনারগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন।[১৪৩]

আওইফির সদস্য ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় শারি‘আহ সুপারভাইজরি বোর্ডের প্রতিনিধি ফকিহ স্কলারদের মধ্য থেকে ১৫ জনকে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ আওইফির শারি‘আহ বোর্ডের সদস্য হিসেবে চার বছরের জন্য মনোনয়ন প্রদান করে। বর্তমানে এর শারি‘আহ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি মুফতি মওলানা মুহাম্মদ তাকি ওসমানি।

দি ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (আইএফএসবি) : শারি‘আহ মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিদ্যমান আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড চালু এবং নতুন নতুন স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দূরদর্শী ও স্বচ্ছ ইসলামি আর্থিক সেবাশিল্পের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান ‘দি ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (আইএফএসবি)’। আইডিবি, আইএমএফ এবং আওইফির সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ও মনিটারি অথরিটির শীর্ষ নির্বাহীবৃন্দের উদ্যোগে ২০০২ সালের ৩ নভেম্বর কুয়ালামপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে আইএফএসবি যাত্রা শুরু করে।[১৪৪] এ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিংয়ের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে এর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল হচ্ছেন প্রফেসর রিফাত আহমদ আবদুল করিম। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৩১ এ দাঁড়িয়েছে।[১৪৫] যাদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মরিটারি অথরিটি ছাড়াও রয়েছে ইসলামি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও সহযোগী সংস্থা। শারি‘আহ মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিদ্যমান আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড চালু এবং নতুন নতুন স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দূরদর্শী ও স্বচ্ছ ইসলামি আর্থিক সেবাশিল্পের বিকাশ ঘটানো এর প্রধান লক্ষ্য। এ বিগত ১৫ বছরে আইএফএসবি ২০টি স্ট্যান্ডার্ড, গাইডিং মূলনীতি এবং টেকনিক্যাল নোট জারি করেছে।[১৪৬]

ইসলামি ব্যাংকসমূহের আন্তর্জাতিক সমিতি (আইএআইবি) : ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাউদি আরবে ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস (আইএইবি) নামে উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান ও দ্রুত বিকাশমান ইসলামি ব্যাংকগুলোর কারিগরি পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই মূলত আইএআইবির প্রতিষ্ঠা। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইসলামি ব্যাংকগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ, এদের পারস্পরিক সহযোগিতার পথ প্রশস্তকরণ এবং তাদের কার্যাবলির সমন্বয় সাধন। মূলত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করাই এর প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তা বাস্তবমুখী। ইসলামি ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডে জড়িত নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য তুরস্কের কিবরিজে

১৪৩. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, জুন ২০১২), পৃ. ৬২২
১৪৪. ওয়েবসাইট : http//:www.ifsb.org, visited on 16.09.2017
১৪৫. The new members for the IFSB (Report), Islamic Business and Finance, Issue 42, May 2016, p. 10
১৪৬. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, জুন ২০১২), পৃ. ৬২৪

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ইকনমিকস নামে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আইএআইবি কর্তৃক স্থাপন করা হয়েছে।[১৪৭]

বাহরাইন মনিটারি এজেন্সি (বিএমএ) : বাহরাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাহরাইন মনিটারি এজেন্সি (বিএমএ)' বিশ্বব্যাপী ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এবং ইসলামি ব্যাংকিং নীতিমালার বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিএমএর বর্তমান গভর্নর হচ্ছেন শাইখ আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-খলিফা। বাহরাইন ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স (বিআইবিএফ) গবেষণা কেন্দ্র ২০০৬ সালে বাহরাইন মনিটারি অথরিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে এবং শিক্ষামূলক কোর্স চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সার্টিফাইয়েড শারি'আহ স্কলার, সার্টিফাইয়েড শারি'আহ অডিটর এবং সার্টিফাইয়েড ইসলামিক এ্যাকাউন্ট্যান্ট কোর্স।[১৪৮]

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন ইন ইসলামিক ফাইন্যান্স (ইনসেইফ) : বিশ্বব্যাপী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও নৈতিক দিক-নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম 'নলেজ লিডার' তৈরি করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন ইন ইসলামিক ফাইন্যান্স (ইনসেইফ)। ইনসেইফ শিক্ষার্থীদের ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানদানের পাশাপাশি মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদানেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।[১৪৯] ইনসেইফ যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ তাহলো :

১. ইসলামি অর্থশিল্পের বিকাশে ইসলামি অর্থনীতির জ্ঞানের উন্মেষ ঘটনো।
২. পেশাদার ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদেরকে বিশেষ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে তাদের অর্থশিল্পের ভবিষ্যৎ কর্ণদার হিসেবে গড়ে তোলা।
৩. ইসলামি অর্থনীতির অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সহযোগিতার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা।
৪. প্রতিষ্ঠানটির ফ্যাকাল্টি মেম্বর ও প্রধান স্টাফ হিসেবে সবচেয়ে বেশি মেধাসম্পন্ন লোকদের মনোনীত করা।
৫. অর্থশিল্পের প্রধান উপাদান শক্তিকে সহায়তা করার জন্য অব্যাহতভাবে ইসলামি আর্থিক সেবা মেধা সরবরাহ করা।
৬. সরকারি ও বেসরকারি খাতকে সহযোগিতা করার জন্য ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ক এ্যাডভাইস ও ইনপুট যোগান দেয়া।
৭. ইসলামি অর্থনীতির ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সমাজের প্রতি কর্পোরেট রেসপনসিবিলিটি দ্রুত সম্পন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করা।[১৫০]

---

১৪৭. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৪
১৪৮. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামিক ফাইন্যান্স : আওইফি পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১৪৯. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৫
১৫০. website : http//:www.inceif.org, visited on 25.09.2017

ইনসেইফ দি গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি ইন ইসলামিক ফাইন্যান্স নামে মালয়েশিয়ার ১৯তম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। মালয়েশিয়ার উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় ইনসেইফকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা প্রদান করায় সেখানে ডিপ্লোমা কোর্সের পাশাপাশি অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি. কর্মসূচি চালু হয়েছে।[১৫১] ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া ২০০৮ সালের মার্চ মাসে ইন্টারন্যাশনাল শারি'আহ রিসার্চ একাডেমি ফর ইসলামিক ফাইন্যান্স বিষয়ে ফলিত গবেষণা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে আইএসআরএ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ইনসেইফের অংশ হিসেবে কাজ করছে।

ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া : ইসলামি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের উপর গবেষণাকর্ম পরিচালনায় মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্স্ট্রুমেন্টের সফলতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক খাত ভিত্তিক মাস্টার প্লানের কারণেই সম্ভব হয়েছে। মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল হাব হওয়ার পিছনে তিনটি উপাদান কাজ করেছে, তা হলো– ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, ফাইন্যান্সিয়াল ইনফ্রাসট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এবং রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট।[১৫২] ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া দুবাই ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টারের মত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছে মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টার ও দি ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্সিং ইনস্টিটিউট, মালয়েশিয়া।[১৫৩]

জেনারেল কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংকস এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন : দেশে দেশে ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরো বেগবান করার জন্য ১৯৯৮ সালে বাহরাইনের রাজধানী মানামায় ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিকে প্রমোট করা; ইসলামি ব্যাংক, তাদের গ্রাহক এবং ব্যাপক জনসাধারণের মাঝে বহুমুখী ধারণা বৃদ্ধি করা; বিভিন্ন ইসলামিক ফাইন্যান্স প্রডাক্টকে বিশ্ব বাজারে আনয়ন করা। এর চেয়ারম্যান হচ্ছেন শাইখ সালিহ এ কামিল।[১৫৪] এছাড়া অন্যান্য দেশেও একই ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন– দি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর লিডারশিপ ইন ফাইন্যান্স, দি ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ সেন্টার, কিং আবদুল আযিয ইউনিভার্সিটি, সাউদি আরব ইত্যাদি। এছাড়াও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রেটিং এজেন্সি, দি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস, দি ইসলামিক লিক্যুইডিটি ম্যানেজমেন্ট সেন্টার ইত্যাদি।

ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো : ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক গবেষণা এবং তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো ১৯৭৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের নেতৃত্বে ও প্রেরণায় এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৯ সালের ৩ থেকে ৫ জুলাই এ সংস্থার উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-

---

১৫১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামিক ফাইন্যান্স : আওইফি পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১৫২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা*(ঢাকা : বাংলাদেশ ব্যাংক, জানু. ২০১০), খ.৩৭, পৃ. ১৪

১৫৩. website : http//:www.mifc.com, visited on 17.09.2017

১৫৪. website : http//:www.gcibafi.org, visited on 20.08.2017

শিক্ষক কেন্দ্রে এবং বাংলাদেশ এ্যাটমিক এ্যানার্জি সেন্টার অডিটরিয়ামে ইসলামি অর্থনীতির উপরে তিনদিন ব্যাপী এক সফল আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার উপর পরবর্তী বছর এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের ১৫ থেকে ১৭ ডিসেম্বর ব্যুরোর উদ্যোগে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অডিটরিয়ামে দুদিন ব্যাপী এ সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারগণ অংশ নেন। এছাড়া ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক, সাউদি এ্যারাবিয়ান মনিটারি এজেন্সির প্রতিনিধিসহ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশী গবেষক, অধ্যাপক ও চিন্তাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর এ সেমিনারে তার ভাষণে শিগগিরই বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ব্যুরো তার দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় এ যাবত বাংলাদেশে অনেকগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছে। বাংলাদেশে ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতে জাতীয়-আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, ব্যাংকিংয়ের প্রতিটি বিষয়ে মতামত প্রদানে 'থিংক ট্যাংক' হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং শিল্পের পরিচর্যা ও উন্নতি বিধানে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। ব্যুরোর বর্তমান চেয়ারম্যান হচ্ছেন শাহ আবদুল হান্নান এবং জেনারেল সেক্রেটারি হচ্ছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন।[১৫৫]

বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন : বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং প্রমোট করার জন্য ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন। এর প্রথম চেয়ারম্যান পূবালী ব্যাংকের তৎকালীন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম. খালেদ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল এম. আযিযুল হক। এতে প্রত্যেক ব্যাংক থেকে দুইজন করে সদস্য ছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ সংস্থা সাপ্তাহিক, মাসিক আলোচনা সভা, স্ট্যাডি সার্কেল, দেশ-বিদেশের ইসলামি অর্থনীতি, ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অগ্রগতির খোঁজ-খবর নেয়া এবং বিদেশে গবেষক পাঠানোর কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এ সংস্থা সে সময় ইসলামি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের উপর ৫টি সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। প্রতিটি কোর্সের স্থায়িত্ব ছিল এক মাস। ২১১ জন কর্মকর্তা এ কোর্সগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদান এ প্রতিষ্ঠান যাত্রালগ্নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে।

ইসলামিক ব্যাংকস কনসালটেটিভ ফোরাম (আইবিসিএফ) : বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং এখানে বিদ্যমান পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক ও ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহে পরামর্শ প্রদান, কর্মরত জনশক্তির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে এ ফোরাম। দেশের ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক– ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটিড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড এবং আটটি ইসলামি শাখাধারী প্রচলিত ব্যাংক– প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, সাউথ-ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড (আল-মানারাহ), ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, এবি ব্যাংক লিমিটেড, যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড এ

১৫৫. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৭

ফোরামের সদস্য। ২০১১ সালের ২৪-২৫ জানুয়ারি এই ফোরামের উদ্যোগে 'গ্লোবাল অর্থনৈতিক সংকট এবং ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার শক্তিমত্তার' উপর এক সাড়া জাগানো আন্তর্জাতিক সেমিনার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ড. আহমদ মুহাম্মদ আলি এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর ড. আতিয়ার রহমান এ সেমিনারের প্রশংসা করেন এবং আইবিসিএফ-এর কর্মকাণ্ড জোরদারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ফোরামের চেয়ারম্যান হচ্ছেন প্রফেসর আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ জাহের এবং ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছেন মো. নজরুল ইসলাম।[১৫৬]

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি) : বিএবি বাংলাদেশের ব্যাংক মালিকদের সংগঠন। এর চেয়ারম্যান হচ্ছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার এবং ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছেন প্রফেসর আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ জাহের।

ইসলামি ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্স স্ট্যাডি গ্রুপ (আইবিএফএসজি) : ইসলামি ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্স স্ট্যাডি গ্রুপ বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকিং এবং অন্যান্য ইসলামি ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার জন্য গঠিত হয়েছে। ইসলামি ব্যাংকিং সংক্রান্ত অতি সাম্প্রতিক তথ্যাদি বিনিময় করা, নতুন প্রোডাক্ট চালু, ইসলামি ব্যাংকিংয়ের নানাবিধ সমস্যা ও বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা ও তথ্য আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ আইবিএফএনজি গঠন করা হয়।[১৫৭]

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামি ব্যাংকসমূহে শারি'আহ নীতিমালা তদারকির জন্য রয়েছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান; যাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে অতীতে ধীরে ধীরে হলেও ইসলামি ব্যাংকসমূহ ভবিষ্যতে পর্যাক্রমে অতি দ্রুততার সাথে উন্নয়নের দিকে ধাবিত হতে পারবে।

১৫৬. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৭
১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ আইনের প্রায়োগিক বাস্তবতা

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামি ব্যাংকিং-এ শারি‘আহ লঙ্ঘন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শারি‘আহ আইন-এর প্রায়োগিক বাস্তবতা : ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শারি‘আহ আইন-এর প্রায়োগিক বাস্তবতা : গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : গবেষণালব্ধ প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা নিরসনে সুপারিশমালা

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ্ আইনের প্রায়োগিক বাস্তবতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামি ব্যাংকিং-এ শারি‘আহ লঙ্ঘন

ইসলামে হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের হালাল নীতিমালা ও পন্থারও দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামি শারি‘আহর উৎস কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান, মাসালিহে মুরসালাহ ইত্যাদির আলোকে ইসলামি শারি‘আহ বিশেষজ্ঞগণ ইসলামি ফিকহের গ্রন্থাবলীতে হালাল পন্থায় অর্থ বিনিয়োগের পদ্ধতিসমূহ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। কুরআন, সুন্নাহ ও সমৃদ্ধ ইসলামি ফিকাহ গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ ইসলামি ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগ পদ্ধতিতে শারি‘আহর নীতিমালা উল্লেখ করার পাশাপাশি এসব বিনিয়োগ পদ্ধতিতে শারি‘আহ লঙ্ঘনের দিকগুলোও তুলে ধরেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ–

ইসলামি ব্যাংকিং-এ শারি‘আহ লঙ্ঘন :

প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম, ফকিহ, ইসলামি চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও ইসলামি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ব্যাংকারদের সমন্বিত গবেষণায় ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় যেসব বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুশীলনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে বায়‘ মুরাবাহা লিল আমিরি বিশশিরা, বায়‘ মুআজ্জাল, বায়‘ সালাম, ইসতিসনা‘, মুদারাবা, মুশারাকা ও ইজারা উল্লেখযোগ্য। ইসলামি ব্যাংকিং-এ শারি‘আহ লঙ্ঘনের পৃথক পৃথক বিভিন্ন দিক রয়েছে। সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো–

বায়‘ মুরাবাহা লিল আমিরি বিশশিরার ক্ষেত্রে শারি‘আহ লঙ্ঘন : বায়‘ মুরাবাহার ক্ষেত্রে যে ধরনের শারি‘আহ লঙ্ঘন হতে পারে সেগুলো হলো–

১. **মালামাল ক্রয়ের পরিবর্তে বিভিন্নভাবে গ্রাহককে নগদ সুবিধা প্রদান করা :** গ্রাহককে মালামাল প্রদানের পরিবর্তে বিভিন্নভাবে নগদ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তার কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা হলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে।[১]

২. **বিনিয়োগের অর্থ দ্বারা মাল ক্রয় না করে পুরাতন বিনিয়োগ সমন্বয় করা :** এক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে কোন ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় না। ফলে, গ্রাহকের নিকট থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা হলে তা সুদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩. **হারাম বা শারি‘আহ নিষিদ্ধ পণ্যে মুরাবাহা বিনিয়োগ করা :** হারাম মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করাকে শারি‘আহর ভাষায় বায়‘ বাতিল বলা হয়। এ ধরনের মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত আয় হারাম বলে পরিগণিত হবে।

৪. **মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্যের উপর ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও কবদ ছাড়া গ্রাহকের কাছে তা বিক্রয় করা :** আয়ত্বহীন মালামাল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। কেননা, রাসুল সা.

---

১. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্*(ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৬), পৃ. ১০১

বলেছেন, 'তোমার কাছে যা নেই তা বিক্রয় করো না।' এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত আয় হালাল হবে না।

৫. **ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো নেয়া :** গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো থাকার একটি অর্থ হতে পারে, ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহক নিজে মালামাল ক্রয় করেছেন। এটাই প্রমাণিত হয় যে ব্যাংক মালামাল ক্রয় করেনি, তাহলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা গ্রাহককে নগদ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। এ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যাংক কর্তৃক মালামাল ক্রয় ও তার উপর দখল লাভের পরই গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করতে হয়।[২]

৬. **ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকারী থেকে ক্যাশমেমো সংগ্রহপূর্বক তা ব্যাংকে উপস্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ গ্রহণ করা :** গ্রাহক কর্তৃক ক্যাশমেমো সংগ্রহের দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি ব্যাংকের পরিবর্তে নিজে মালামাল ক্রয় করেছেন এবং মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কোন ভূমিকা নেই, তাহলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে গ্রাহককে নগদ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং অর্জিত আয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩]

৭. **মুরাবাহা চুক্তিপত্র খালি, অপূরণকৃত, অপূর্ণাঙ্গ ও সাক্ষীবিহীন রাখা :** ব্যাংক একটি প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে লেনদেনের সকল বিবরণ বিশেষ করে বিক্রয়মূল্য ও মূল্য পরিশোধের তারিখ লিখিত থাকা আবশ্যক। এগুলোর অনুপস্থিতিতে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ বলে গণ্য হবে। বায়' ফাসিদে মালামাল ক্রেতার হস্তগত হলে তিনি তার মালিক হবেন এবং ক্রয়-বিক্রয় বৈধ ও কার্যকর হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ শারি'আহ লঙ্ঘনের জন্য অপরাধী হবেন।[৪]

৮. **মুরাবাহা বিনিয়োগে গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি করা হলে সে ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক মালামাল পরিদর্শনপূর্বক গ্রাহককে বুঝিয়ে না দেয়া :** ক্রয় প্রতিনিধি কর্তৃক মালামাল ক্রয়ের পর ব্যাংক কর্তৃক তা পরিদর্শন না করার দ্বারা বুঝা যায় যে উক্ত মালের উপর ব্যাংকের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর দখল করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট মালামাল বিক্রয় করতে রাসুল সা. নিষেধ করেছেন। ক্রয় প্রতিনিধির ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক মালামাল ব্যবহারের পূর্বেই ব্যাংক কর্তৃক তা পরিদর্শন করতে হবে।

৯. **মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট বা এমপিআই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংককে মালামাল ক্রয় বা আমদানি করার ক্ষমতাপত্র না দেয়া :** এ ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লেটার অব অথরিটি ছাড়া মালের উপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর মালিকানা ও দখলবিহীন মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করাকে বায়' ফাসিদ বলে।

১০. **ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে তার হিসাবে বিনিয়োগের টাকা স্থানান্তর করার দীর্ঘদিন পরও বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে মালামাল ক্রয় না করা :** প্রথম দিনেই মালামাল ক্রয়ের ক্যাশমেমো প্রদান করা ও যথারীতি মুনাফা ধার্য করা। গ্রাহকের কাছে মালামাল হস্তান্তর ব্যতীত মুনাফা ধার্য করা বৈধ নয়।

---

২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৩. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৪. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

১১. **বিক্রীত পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় আসার পূর্বেই উক্ত পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি করা :** এ ধরনের চুক্তি বৈধ নয়। কেননা, রাসুল সা. বলেছেন– 'যে পণ্য তোমার কাছে নেই তা বিক্রয় কর না।'[৫]

১২. **মালামাল ক্রয়ে ব্যাংকের ভূমিকা না থাকা অর্থাৎ ব্যাংকের পরিবর্তে বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকারীর নিকট থেকে সরাসরি মালামাল বুঝে নেয়া :** মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কোন ভূমিকা না থাকার অর্থ হল গ্রাহক ব্যাংকের পরিবর্তে নিজেই মালামাল ক্রয় করেছেন। এ ধরনের বিনিয়োগের দ্বারা গ্রাহককে নগদ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৩. **গ্রাহককে নিজের জন্য ক্রয়কৃত মালের উপর বিনিয়োগ প্রদান করা :** এমতাবস্থায় ব্যাংক কর্তৃক উক্ত মালের মূল্য পরিশোধপূর্বক মুরাবাহা বিনিয়োগ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। কেননা, গ্রাহক মালামাল ক্রয় করে বিক্রেতার কাছে ঋণী হয়েছেন আর ব্যাংক তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকে ঋণ দিয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় থেকে অর্জিত আয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৬]

১৪. **বিনিয়োগের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে মালামাল ক্রয় না করে আংশিক অর্থ দিয়ে মালামাল ক্রয় করে সম্পূর্ণ বিনিয়োগের উপর মুনাফা ধার্য করা :** যে অর্থ দ্বারা মালামাল ক্রয় করা হয়নি, সে অর্থ থেকে অর্জিত আয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

বায়‘ মুআজ্জালের ক্ষেত্রে শারি‘আহ লঙ্ঘন : বায়‘ মুআজ্জালের ক্ষেত্রে যে ধরনের শারি‘আহ লঙ্ঘন হতে পারে সেগুলো হলো–

১. **মালামাল ক্রয়ের পরিবর্তে বিভিন্নভাবে গ্রাহককে নগদ সুবিধা প্রদান করা :** গ্রাহককে মালামাল প্রদানের পরিবর্তে বিভিন্নভাবে নগদ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তার কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা হলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে।[৭]

২. **বিনিয়োগের অর্থ দ্বারা মাল ক্রয় না করে পুরাতন বিনিয়োগ সমন্বয় করা :** এক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে কোন ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় না। ফলে, গ্রাহকের নিকট থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা হলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে।[৮]

৩. **হারাম বা শারি‘আহ নিষিদ্ধ পণ্যে মুরাবাহা বিনিয়োগ করা :** হারাম মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করাকে শারি‘আহর ভাষায় বায়‘ বাতিল বলা হয়। এ ধরনের মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত আয় হারাম বলে গণ্য হবে।

৪. **মুআজ্জাল পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্যের উপর ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও দখল ছাড়া গ্রাহকের কাছে তা বিক্রয় করা :** আয়ত্বহীন মালামাল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। কেননা, রাসুল সা. বলেছেন– 'তোমার কাছে যা নেই তা বিক্রয় কর না।'[৯] এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত আয় হালাল হবে না।

---

৫. আবু দাউদ সুলায়মান, *আবু দাঊদ শরীফ*, প্রাগুক্ত,খ.৪, পৃ. ৪১৪, হাদিস নং ৩৪৬৬

৬. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৭. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৯. আবু দাউদ সুলায়মান, *আবু দাঊদ শরীফ*, প্রাগুক্ত

৫. **ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো নেয়া :** গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো থাকার একটি অর্থ হতে পারে, ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহক নিজে মালামাল ক্রয় করেছেন। এটাই প্রমাণিত হয় যে ব্যাংক মালামাল ক্রয় করেনি, তাহলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা গ্রাহককে নগদ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। এ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, মুআজ্জাল পদ্ধতিতে ব্যাংক কর্তৃক মালামাল ক্রয় ও তার উপর দখল লাভের পরই গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করতে হয়।

৬. **ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকারী থেকে ক্যাশমেমো সংগ্রহপূর্বক তা ব্যাংকে উপস্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ গ্রহণ করা :** গ্রাহক কর্তৃক ক্যাশমেমো সংগ্রহের দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি ব্যাংকের পরিবর্তে নিজে মালামাল ক্রয় করেছেন এবং মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কোন ভূমিকা নেই, তাহলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে গ্রাহককে নগদ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং অর্জিত আয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১০]

৭. **বায়' মুআজ্জাল চুক্তিপত্র খালি, অপূরণকৃত, অপূর্ণাঙ্গ ও সাক্ষীবিহীন রাখা :** ব্যাংক একটি প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে লেনদেনের সকল বিবরণ বিশেষ করে বিক্রয়মূল্য ও মূল্য পরিশোধের তারিখ লিখিত থাকা আবশ্যক। এগুলোর অনুপস্থিতিতে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ বলে গণ্য হবে। বায়' ফাসিদে মালামাল ক্রেতার হস্তগত হলে তিনি তার মালিক হবেন এবং ক্রয়-বিক্রয় বৈধ ও কার্যকর হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ শারি'আহ লঙ্ঘনের জন্য অপরাধী হবেন।

৮. **বায়' মুআজ্জাল বিনিয়োগে গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি করা হলে সে ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক মালামাল পরিদর্শনপূর্বক গ্রাহককে বুঝিয়ে না দেয়া :** ক্রয় প্রতিনিধি কর্তৃক মালামাল ক্রয়ের পর ব্যাংক কর্তৃক তা পরিদর্শন না করার দ্বারা বুঝা যায় যে উক্ত মালের উপর ব্যাংকের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর দখল করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট মালামাল বিক্রয় করতে রাসুল সা. নিষেধ করেছেন। ক্রয় প্রতিনিধির ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক মালামাল ব্যবহারের পূর্বেই ব্যাংক কর্তৃক তা পরিদর্শ করতে হবে।[১১]

৯. **বায়' মুআজ্জাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংককে মালামাল ক্রয় বা আমদানি করার ক্ষমতাপত্র না দেয়া :** এ ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লেটার অব অথরিটি ছাড়া মালের উপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর মালিকানা ও দখলবিহীন মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করাকে বায়' ফাসিদ বলে।

১০. **ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে তার হিসাবে বিনিয়োগের টাকা স্থানান্তর করার দীর্ঘদিন পরও বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে মালামাল ক্রয় না করা :** প্রথম দিনেই মালামাল ক্রয়ের ক্যাশমেমো প্রদান করা ও যথারীতি মুনাফা ধার্য করা। গ্রাহকের কাছে মালামাল হস্তান্তর ব্যতীত মুনাফা ধার্য করা বৈধ নয়।

---

১০. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

১১. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

১১. **বিক্রীত পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় আসার পূর্বেই উক্ত পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি করা :** এ ধরনের চুক্তি বৈধ নয়। কেননা, রাসুল সা. বলেছেন– 'যে পণ্য তোমার কাছে নেই তা বিক্রয় কর না।'[১২]

১২. **মালামাল ক্রয়ে ব্যাংকের ভূমিকা না থাকা :** মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কোন ভূমিকা না থাকার অর্থ হল গ্রাহক ব্যাংকের পরিবর্তে নিজেই মালামাল ক্রয় করেছেন। এ ধরনের বিনিয়োগের দ্বারা গ্রাহককে নগদ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৩]

১৩. **গ্রাহককে নিজের জন্য ক্রয়কৃত মালের উপর বিনিয়োগ প্রদান করা :** এমতাবস্থায় ব্যাংক কর্তৃক উক্ত মালের মূল্য পরিশোধপূর্বক মুরাবাহা বিনিয়োগ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। কেননা, গ্রাহক মালামাল ক্রয় করে বিক্রেতার কাছে ঋণী হয়েছেন আর ব্যাংক তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকে ঋণ দিয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে বায়' ইনা বলা হয়। এর মাধ্যমে অর্জিত আয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৪. **বিনিয়োগের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে মালামাল ক্রয় না করা :** যে অর্থ দ্বারা মালামাল ক্রয় করা হয়নি, সে অর্থ থেকে অর্জিত আয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

বায়' সালামের ক্ষেত্রে শারি'আহ লঙ্ঘন :

১. **চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, ধরন, পরিমাণ, গুণাগুণ, মূল্য পরিশোধের সময় ও স্থান ইত্যাদি উল্লেখ না থাকা :** এগুলোর অনুপস্থিতিতে ক্রয়-বিক্রয়টি ফাসিদ বলে গণ্য হবে। বায়' ফাসিদে মালামাল ব্যাংকের হস্তগত হলে ব্যাংক তার মালিক হবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বৈধ ও কার্যকর হবে। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ শারি'আহ লঙ্ঘনের জন্য অপরাধী হবেন।[১৪]

২. **চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকে মূল্য পরিশোধ না করা :** চুক্তি সম্পাদনকালে মূল্য পরিশোধ না করা হলে সালাম চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, এ ধরনের চুক্তি বায়' আদ-দাইন বা ঋণ ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর রাসুল সা. ঋণ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[১৫]

৩. **মেয়াদান্তে গ্রাহক ব্যাংককে মালামাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে তার নিকট থেকে অগ্রিম প্রদত্ত মূল্যের অতিরিক্ত কিছু ব্যাংক কর্তৃক গ্রহণ করা :** গ্রাহক মালামাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তার নিকট থেকে মালামালের মূল্য ফেরত নিতে পারে কিংবা গ্রাহকের হাতে মালামাল আসা পর্যন্ত তাকে সময় দিতে পারে। কিন্তু ব্যাংক মূল্যের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করতে পারবে না। অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তা সুদ বলে গণ্য হবে।[১৬]

৪. **হারাম বা শারি'আহ নিষিদ্ধ পণ্যে বায়' সালাম বিনিয়োগ প্রদান করা :** হারাম মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করাকে শারি'আহর ভাষায় বায়' বাতিল বলা হয়। এ ধরনের মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত আয় হারাম বলে গণ্য হবে।

---

১২. আবু দাউদ সুলায়মান, *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত

১৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

১৪. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

১৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

১৬. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৫. **সরবরাহকালীন সহজলভ্য নয়– এমন পণ্যের জন্য বায়' সালাম করা :** সরবরাহকালীন মালামাল সহজলভ্য হওয়া বায়' সালামের একটি শর্ত। শর্ত লঙ্ঘিত হলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, এক্ষেত্রে চুক্তিকৃত মালামাল বাস্তবে সরবরাহ করা যাবে না। ফলে ক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। তবে এরূপ ক্ষেত্রে মালামাল ক্রেতার হস্তগত হলে তিনি তার মালিক হবেন এবং ক্রয়-বিক্রয় বৈধ ও কার্যকর হবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ শারি'আহ লঙ্ঘনের জন্য অপরাধী হবেন।

৬. **বায়' সালাম চুক্তিতে কোন নির্দিষ্ট গাছের ফুল বা কোন নির্দিষ্ট ক্ষেতের ফসল বিক্রির শর্ত করা:** বায়' সালামে এরূপ শর্ত করা জায়িয হবে না। কেননা, যে কোন কারণে নির্দিষ্ট গাছ বা ক্ষেতের ফসল সরবরাহ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এরূপ অনিশ্চয়তাসহ চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ নয়।

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক-এর ক্ষেত্রে শারি'আহ লঙ্ঘন :

১. অবকাশকালে ভাড়া আদায় করা বৈধ নয়। কেননা, এ সময়ে সম্পদটি ব্যবহারযোগ্য না হওয়ার কারণে ভাড়াগ্রহীতা তা থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারেন না। ফলে, অবকাশকালের আদায়কৃত ভাড়া সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

২. এইচপিএসএম পদ্ধতিতে ভাড়ায় প্রদত্ত সম্পদ বা মেশিনারিজ ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে গেলে তা থেকে বাড়া আদায় করা বৈধ নয়। কেননা, সম্পদ ব্যবহারযোগ্য না হলে তা থেকে ভাড়া আদায় করা বৈধ নয়। আদায়কৃত ভাড়া সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

৩. সম্পদ ক্রয়ে উভয়পক্ষের অংশগ্রহণ, মালিকানায় অংশীদারিত্বের অনুপাত, সম্পদের বিবরণ ইত্যাদি চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকা। চুক্তিপত্র অপূরণকৃত থাকলে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কা দেখা দিবে। তাই চুক্তিপত্র অপূরণকৃত রাখা বৈধ নয়। এ জন্য ভাড়াদাতা ও ভাড়া গ্রহীতা অপরাধী হবেন।[১৭]

৪. সম্পদের উপর ব্যাংকের মালিকানা অর্জন ব্যতীত ভাড়া আদায় করা বৈধ নয়। মালিকানা অর্জন ব্যতীত কোন সম্পদের উপর ভাড়া আদায় করা হলে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫. ভাড়ার উপর ভাড়া আরোপ করা বৈধ নয়। এরূপ আদায়কৃত ভাড়া সুদ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, ব্যবহারযোগ্য সম্পদের উপরই কেবল ভাড়া ধার্য করা যায়; অর্থের উপর নয়।

৬. সম্পদ ক্রয়ের পূর্বে ভাড়া ও বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ নয়। কেননা, অস্তিত্বহীন সম্পদের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি করা বৈধ নয়। এরূপ চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭. গ্রাহক কর্তৃক বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে নির্দিষ্ট সম্পদ তৈরি না করে তা অন্য খাতে স্থানান্তর করা বৈধ নয়। এরূপ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় সুদ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, অস্তিত্বহীন সম্পদের উপর ভাড়া ধার্য করা যায় না।

৮. বায়' মুরবাহা ও বায়' মুআজ্জাল পদ্ধতিতে প্রদত্ত বিনিয়োগকে এইচপিএসএম পদ্ধতিতে রূপান্তর করা বৈধ নয়।[১৮]

---

১৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

১৮. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

ইসতিসনা'র ক্ষেত্রে শারি'আহ লঙ্ঘন : ইসতিসনার ক্ষেত্রে যেভাবে শারি'আহ লঙ্ঘিত হতে পারে তা নিম্নরূপ–

১. ইসতিসনা চুক্তিতে সম্পদের অস্তিত্ব থাকা শারি'আহ লঙ্ঘন। সম্পদের অস্তিত্ব ছাড়াই বেচা-কেনা সংঘটিত হতে হবে। যদি বিক্রির জন্য মালামাল প্রস্তুত থাকে সেক্ষেত্রে শারি'আহ অনুযায়ী ইসতিসনা চুক্তির আওতায় ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না।

২. শারি'আহ নীতি অনুযায়ী ইসতিসনার অন্যতম শর্ত হচ্ছে চুক্তি। চুক্তি লিখিত, সুনির্দিষ্ট, সাক্ষীযুক্ত ও সকল শর্ত লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।[১৯]

মুশারাকার ক্ষেত্রে শারি'আহ লঙ্ঘন :

১. মূলধনের পরিমাণ, মুনাফা ও ক্ষতির হার চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকা। চুক্তিপত্র অপূরণকৃত রাখা, তারিখ না থাকা, পক্ষসমূহের স্বাক্ষর ও সাক্ষীর স্বাক্ষর না থাকা।

২. মুশারাকার মূলধন নগদে না হয়ে পণ্যে হওয়া। তবে, পণের মূল্য নির্ধারণ করে নগদে রূপান্তর করে নিলে কোন দোষ হবে না।

৩. চুক্তিবদ্ধ খাতে মূলধন ব্যবহার না করে গ্রাহকের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে মুশারাকার মূলধন ব্যবহার করা।

৪. উভয়পক্ষের সম্মতি ব্যতীত একতরফাভাবে চুক্তির কোন শর্ত পরিবর্তন করা।

৫. উভয় পক্ষ ব্যবসায়ের ক্ষতি মূলধন অনুপাতে বহন না করা। তবে কোন এক পক্ষের অবহেলা বা চুক্তি লঙ্ঘনের কারণে ব্যবসায়ের ক্ষতি হলে তা স্বতন্ত্র বিষয়।

৬. চুক্তিতে উভয়পক্ষ ব্যবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার কথা উল্লেখ থাকলে পরবর্তীতে এককভাবে কোন একপক্ষ ব্যবসা পরিচালনা করা আর অন্য পক্ষকে তাতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ না দেয়া।[২০]

৭. উভয়পক্ষের মধ্যে ব্যবসায়ের মুনাফা চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত না হয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টিত হওয়া।

৮. কোন অংশীদার তার অংশটিকে পণ্যে রূপান্তর না করে লাভসহ অন্য কোন অংশীদারের কাছে বিক্রি করে দেয়া।[২১]

৯. কোন অংশীদার তার অংশের শারই' দখলদার না হয়ে তা অন্য কারো কাছে বিক্রি করা।

১০. ব্যবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী পক্ষ মুনাফার হারের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক ভোগ করা।

১১. মুশারাকা ব্যবসা সম্পাদনের শুরুতে উভয় পক্ষের মূলধন উপস্থিত না থাকা।

১২. মূলধন অথবা শ্রম বিনিয়োগ অথবা দায়িত্ব বহন কোনটাই না করে মুনাফায় অংশগ্রহণ করা।

১৩. দুজন অংশীদারের ক্ষেত্রে একজনের মৃত্যু হলে মুশারাকা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এরপর অন্যপক্ষ কর্তৃক এ চুক্তিতে মুশারাকা ব্যবসা পরিচালনা করা বৈধ হবে না। তবে দুজনের অধিক অংশীদার হলে একজনের মৃত্যুতে মুশারাকা চুক্তি বাতিল হবে না।

---

১৯. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

২০. প্রাগুক্ত।

২১. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

মুদারাবার ক্ষেত্রে শারি‘আহ লঙ্ঘন : মুদারাবা বিনিয়োগে যেভাবে শারি‘আহ লঙ্ঘিত হতে পারে তা হলো–

১. মুদারাবা চুক্তির সমস্ত বিষয় লিখিত ও স্পষ্ট না হওয়া। কেননা, পরবর্তীতে লাভ বণ্টন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে, যা শারি‘আহ লঙ্ঘনের কারণ।

২. মুদারিব কর্তৃক সাহিবুল মালের সম্পদের সাথে নিজের সম্পদ মিশ্রণ করে ব্যবসা করা, অথচ পৃথক কোন হিসাব সংরক্ষণ না করা।

৩. মুদারিবের উচিত ব্যবসার সমস্ত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। এক্ষেত্রে তার উদাসীনতা শারি‘আহ লঙ্ঘনের কারণ হতে পারে।[২২]

৪. চুক্তিতে উল্লিখিত মুনাফা বণ্টনের নীতিমালা লঙ্ঘন করে সাহিবুল মালকে মুনাফা দেয়া হলে কিংবা ব্যবসায়ে লাভ হোক বা না হোক মুদারিব কর্তৃক সাহিবুল মালকে লাভ দিলে শারি‘আহ লঙ্ঘন হবে।

৫. উভয়পক্ষের সম্মতি ব্যতীত একতরফাভাবে চুক্তি ভঙ্গ করলে শারি‘আহ লঙ্ঘন হবে।

৬. মুদারাবার মূল বিষয় হলো– যৌক্তিক কারণ ছাড়া ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে সাহিবুল মাল পুরোপুরি দায়-দায়িত্ব নিবেন। চুক্তি এ রকম হলে লাভ-ক্ষতি যা-ই হোক উভয়ই অংশীদার হবে, তা হলে শারি‘আহ লঙ্ঘন হবে।

৭. মুদারাবা চুক্তিতে কারবারের অর্থ থেকে ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় বহনের কথা উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও মুদারিব সমস্ত ব্যয় কারবার থেকে নিলে শারি‘আহ লঙ্ঘিত হবে।[২৩]

মূলত, ইসলামি ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং কার্যক্রমে শারি‘আহর বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখী হচ্ছে। দেশের প্রচলিত আইন, আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি-প্রকৃতি, শারি‘আহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণার অভাব, সমাজে ইসলামি অনুশাসনের অনুপস্থিতি ও নৈতিকতার অভাবসহ নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে শারি‘আর প্রয়োগ কাঙ্খিত মানে হচ্ছে না। তবে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকিং কোম্পানি আইন প্রবর্তন করতে পারলে এবং যতটুকু আইন বলবৎ আছে তার আলোকে ক্রয়-বিক্রয় যতখানি সম্ভব কার্যকর করতে পারলে ইসলামি ব্যাংকিংয়ে শারি‘আহ পরিপালনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে।

---

২২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

২৩. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক বাস্তবতা : ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ

জনকল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামি ব্যাংকসমূহ ইসলামি শারি'আহ্ মুতাবিক পরিচালিত একটি ভিন্ন ধারার ব্যাংকব্যবস্থা। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যাংকসমূহের রয়েছে ইসলামি শারি'আহ্ সম্মত নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা। এসব নীতি ও পদ্ধতির আলোকে ইসলামি ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সমস্ত বিষয়ে ইসলামি ব্যাংকসমূহে কার্যরত নির্বাহী, কর্মকর্তাবৃন্দ ও গ্রাহকসাধারণ তাদের মনে লুকিয়ে রেখেছেন অনেক ভাবনা। তাদের সেসব ভাবনা ও দৃষ্টিকোণ ইসলামি ব্যাংকসমূহকে আজ বর্তমান অবস্থানে উন্নীত করেছে।

জরিপের উদ্দেশ্য : ইসলামি ব্যাংকসমূহ শারি'আতের নীতিমালা অনুসরণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে অর্থায়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে একটি ভিন্নতর স্থান অধিকার করে আছে। মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কিভাবে ইসলামি শারি'আহ পরিপালন সাপেক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থায়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে এমন অবদান রেখেছে এসব বিষয়ে ব্যাংকার ও সাধারণ গ্রাহকগণ কতটুকু জানেন এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এ জরিপ পরিচালিত হয়েছে।

জরিপ পদ্ধতি : এটি একটি প্রাথমিক গবেষণা জরিপ। ২০১৬ সালের ২০ মার্চ হতে ২০ জুলাই পর্যন্ত ইসলামি ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত ৫০ জন নির্বাহী/ কর্মকর্তা ও ৫০ জন বিনিয়োগ গ্রাহক-এর উপর এ জরিপ চালানো হয়েছে। প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর আলোকে গৃহীত বক্তব্য সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে সারণিবদ্ধভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সারণির নিচে উপাত্ত বিশ্লেষণও করা হয়েছে।

শারি‘আহ আইনের প্রায়োগিক বাস্তবতা : ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ

ইসলামি ব্যাংকসমূহে কর্মরত ব্যাংকারগণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে ইসলামি শারি‘আহ আইন পরিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থায়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। অভিজ্ঞ ব্যাংকারগণ তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার আলোকে ইসলামি ব্যাংকগুলোকে সামনে আরো বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়তার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রশ্নমালার এ অংশে ইসলামি ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত ব্যাংকারগণের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখানে সম্মানিত ব্যাংকারগণের সামনে ২৫টি প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছিল যার প্রথম ৩টি প্রশ্ন ছিল যথাক্রমে উত্তরদানকারীর নাম, পদবী ও কর্মস্থলের ঠিকানা সংক্রান্ত। চতুর্থ ও পঞ্চম প্রশ্নদ্বয় ছিল যথাক্রমে উত্তরদাতার বয়স/জন্ম তারিখ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ক, যা তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। নিচে প্রশ্নমালার আলোকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণসহ উপস্থাপিত হলো :

সারণি-১ : ব্যাংকারগণের বয়স/জন্ম তারিখ সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)*	শতকরা হার (%)
বয়স/জন্ম তারিখ	৩০-৫০ বছর	৩৫	৭০
	৫০ বছর ও তদুর্ধ্ব	৯	১৮
	২০-৩০ বছর	৬	১২
	২০ বছরের নিচে	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০.০০**

* N = গবেষণার অন্তর্ভূক্ত জনসংখ্যার সংখ্যা

প্রশ্নমালার উপরোক্ত ৪নং প্রশ্নে উত্তরের জন্য কোন নির্দেশনা ছিল না। উত্তরদাতাগণের প্রদত্ত বয়স/জন্ম তারিখ থেকেই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে। উপরোক্ত ১ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫০ জন ব্যাংকারের মধ্যে সর্বোচ্ছ শতকরা ৭০ ভাগের বয়স ৩০-৫০ বছরের মধ্যে, ১৮ ভাগের বয়স ৫০ বছরের উর্ধে ও ১২ ভাগের বয়স ২০-৩০ বছরের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে কারও বয়স ২০ বছরের নিচে ছিল না।

সারণি-২ : ব্যাংকারগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	পোস্ট গ্রাজুয়েট	৩৫	৭০
	গ্রাজুয়েট	৮	১৬
	এইচ.এস.সি	৪	৮
	অন্যান্য	৩	৬
	এস.এস.সি	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ২নং সারণিতে ব্যাংকারগণের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার ৫নং প্রশ্নে উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ৫০ জন ব্যাংকারের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭০% পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী, ১৬% গ্রাজুয়েট, ৮% এইচ.এস.সি ও ৬% অন্যান্য ডিগ্রিধারী। উল্লেখ্য যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে কেউই শুধুমাত্র এস.এস.সি পাশ ছিলেন না।

সারণি-৩ : ব্যাংকারগণের ইসলামি ব্যাংকে চাকুরি করার কারণ সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
আপনি ইসলামি ব্যাংকে চাকুরি করছেন কেন?	ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবায়নে অংশ নিতে	৪৬	৯২
	ভাল সুযোগ-সুবিধার জন্য	৩	৬
	চাকুরির উদ্দেশ্যে	১	২
	কোনটিই নয়	-	-
মোট		**৫০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯২% ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবায়নে অংশ নিতে, ৬% ভাল সুযোগ-সুবিধার জন্য ও ২% চাকুরির উদ্দেশ্যে ইসলামি ব্যাংকে কর্মরত আছেন। কোনটিই নয় বিষয়ে কেউই মতামত ব্যক্ত করেননি।

সারণি-৪ : ইসলামি ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
ইসলামি ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?	সম্পূর্ণ	৩৪	৬৮
	মোটামুটি	১০	২০
	স্বল্প	৪	৮
	তেমন অবহিত নই	১	২
	মন্তব্য নেই	১	২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামি ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত আছেন পর্যায়ক্রমে ৬৮% সম্পূর্ণ, ২০% মোটামুটি, ৮% স্বল্প, ২% তেমন অবহিত নই ও ২% মন্তব্য নেই।

সারণি-৫ : ব্যাংকিং ব্যাবস্থায় শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
ব্যাংকিং ব্যাবস্থায় শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?	অনেক	৩১	৬২
	মোটামুটি	১৪	২৮
	স্বল্প	৩	৬
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	১	২
	মন্তব্য নেই	১	২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংকিং ব্যাবস্থায় শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা অনেক বলে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ অনেক ৬২%, মোটামুটি ২৮%, স্বল্প ৬%, তেমন ভূমিকা রাখছে না ২% ও মন্তব্য নেই ২% ব্যাংকার।

সারণি-৬ : ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?	স্বল্প	৩৫	৭০
	মোটামুটি	১১	২২
	অনেক	২	৪
	তেমন ভূমিকা নেই	১	২
	মন্তব্য নেই	১	২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের ৮টি পরিপূর্ণ ইসলামি ব্যাংকের তুলনায় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা স্বল্প বলে উত্তর দিয়েছেন পর্যায়ক্রমে স্বল্প ৭০%, মোটামুটি ২২%, অনেক ৪%, তেমন ভূমিকা নেই ২% ও মন্তব্য নেই ২% ব্যাংকার।

সারণি-৭ : বিনিয়োগ গ্রাহকগণকে কোন্ ধরনের বিনিয়োগ প্রদানে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
বিনিয়োগ গ্রাহকদেরকে কোন ধরনের বিনিয়োগ প্রদানে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন?	এইচপিএসএম	২৯	৫৮
	বায়‘ মুরাবাহা	১০	২০
	মুশারাকা	৫	১০
	বায়‘ মুয়াজ্জাল	৩	৬
	বায়‘ সালাম	৩	৬
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ গ্রাহকগণকে বিনিয়োগ প্রদানে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এইচপিএসএম পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ৫৮%, বায়‘ মুরাবাহাতে ২০%, মুশারাকাতে ১০%, বায়‘ মুয়াজ্জালে ৬% ও বায়‘ সালামে ৬% ব্যাংকার।

সারণি-৮ : শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?	মুশারাকা	২৩	৪৬
	বায়‘ সালাম	১২	২৪
	এইচপিএসএম	৭	১৪
	বায়‘ মুরাবাহা	৪	৮
	বায়‘ মুআজ্জাল	৪	৮
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে যে সব বিনিয়োগ পদ্ধতি বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে সে সম্পর্কে সর্বোচ্চ ৪৬% মত ব্যক্ত করেছেন মুশারাকা, ২৪% বায়‘ সালাম, ১৪% এইচপিএসএম, ৮% বায়‘ মুরাবাহা ও ৮% বায়‘ মুআজ্জাল পদ্ধতি।

সারণি-৯ : শারি‘আহ সম্মত বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শারি‘আহ সম্মত বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?	মোটামুটি	৩২	৬৪
	স্বল্প	১০	২০
	অনেক	৫	১০
	মন্তব্য নেই	২	৪
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে শারি‘আহ সম্মত বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন সর্বোচ্চ ৬৪% মোটামুটি, ২০% স্বল্প, অনেক ১০%, মন্তব্য নেই ৪% ও তেমন ভূমিকা রাখছে না ২%।

সারণি-১০ : প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সেবা কতখানি পৌঁছেছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সেবা কতখানি পৌঁছেছে?	স্বল্প	২৫	৫০
	মোটামুটি	১২	২৪
	পর্যাপ্ত	১০	২০
	মোটেওনা	২	৪
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সেবা পৌঁছা সম্পর্কে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৫০% স্বল্প, ২৪% মোটামুটি, ২০% পর্যাপ্ত, মোটেওনা ৪% ও মন্তব্য নেই ২%।

সারণি-১১ : বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকারগণের সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন?	গ্রাহকের অসহযোগিতা	১৮	৩৬
	কোন সমস্যা নেই	১৫	৩০
	দীর্ঘসূত্রিতা	১০	২০
	চাপ প্রয়োগ	৫	১০
	মন্তব্য নেই	২	৪
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকারগণের সমস্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাপারে জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৩৬% গ্রাহকের অসহযোগিতা, ৩০% কোন সমস্যা নেই, ২০% দীর্ঘসূত্রিতা, চাপ প্রয়োগ ১০% ও মন্তব্য নেই ৪%।

সারণি-১২ : বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকারগণের সমস্যা সমাধানে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
১৪ নং প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে করণীয় কি?	যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান	২২	৪৪
	দ্রুত সেবা প্রদান	১৫	৩০
	গ্রাহকদেরকে মোটিভিশন	১০	২০
	কোন সমস্যা নেই	২	৪
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকারগণের সমস্যা সমাধানে করণীয় সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৪% যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, ৩০% দ্রুত সেবা প্রদান, ২০% গ্রাহকগণের মোটিভিশন, ৪% কোন সমস্যা নেই ও ২% মন্তব্য নেই।

সারণি-১৩ : যেসব খাতে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
কোন ধরনের খাতে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি বলে আপনি মনে করেন?	ম্যানুফ্যাকচারিং	৩০	৬০
	ট্রেডিং	১২	২৪
	সার্ভিস	৪	৮
	সকল খাত	৩	৬
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ব্যাংকারগণ যেসব খাতে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি সে সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে সর্বোচ্চ ৬০% ম্যানুফ্যাকচারিং, ২৪% ট্রেডিং, ৮% সার্ভিস, ৬% সকল খাতে ও ২% মন্তব্য নেই।

সারণি-১৪ : শারি'আহ পরিপালনের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামি ব্যাংকিং-এ উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সফলতা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শারি'আহ পরিপালনের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামি ব্যাংকিং-এ উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি সফল?	অনেক	৩৬	৭২
	মোটামুটি	১০	২০
	স্বল্প	৩	৬
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোটেও সফল নয়	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শারি'আহ পরিপালনের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামি ব্যাংকিং-এ উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সফলতা সংক্রান্ত বিষয়ে জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৭২% অনেক, ২০% মোটামুটি, ৬% স্বল্প, ও ২% মন্তব্য নেই। তবে মোটেও সফল নয় বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেনি।

সারণি-১৫ : শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা যথাযথ মনে করেন কি?	অনেক	৩৮	৭৬
	মোটামুটি	৮	১৬
	স্বল্প	২	৪
	মোটেও যথার্থ নয়	১	২
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ব্যাংকারগণ শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৭৬% অনেক, ১৬% মোটামুটি, ৪% স্বল্প, ২% মন্তব্য নেই ও ২% মোটেও যথার্থ নয়।

সারণি-১৬ : শারি'আহ অনুযায়ী পরিচালিত ইসলামি ব্যাংকসমূহ দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যে ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শারি'আহ অনুযায়ী পরিচালিত ইসলামি ব্যাংকসমূহ দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কতখানি অবদান রাখছে?	অনেক	৪০	৮০
	মোটামুটি	৬	১২
	স্বল্প	২	৪
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	১	২
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শারি'আহ অনুযায়ী পরিচালিত ইসলামি ব্যাংকসমূহ দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যে ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮০% অনেক, ১২% মোটামুটি, ৪% স্বল্প, তেমন ভূমিকা রাখছে না ২% ও ২% মন্তব্য নেই।

সারণি-১৭ : বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?	অনেক	৩৬	৭২
	মোটামুটি	১০	২০
	স্বল্প	৪	৮
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	-	-
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭২% অনেক, ২০% মোটামুটি ও ৮% স্বল্প। এ অংশে তেমন ভূমিকা রাখছে না ও মন্তব্য নেই প্রশ্নে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১৮ : ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইন সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি জ্ঞাত সে সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইন সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি জ্ঞাত?	মোটামুটি	৩৪	৬৮
	অনেক	৯	১৮
	স্বল্প	৫	১০
	তেমন জ্ঞাত নয়	১	২
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইন সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি জ্ঞাত সে সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৮% মোটামুটি, ১৮% অনেক, ১০% স্বল্প, তেমন জ্ঞাত নয় ২% ও মন্তব্য নেই ২%।

সারণি-১৯ : শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহের আন্তরিকতা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৫০)**	**শতকরা হার (%)**
শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/ উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহ কতখানি আন্তরিক?	স্বল্প	২৮	৫৬
	মোটামুটি	১৬	৩২
	অনেক	৪	৮
	মোটেও আন্তরিক নয়	১	২
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহের আন্তরিকতা সংক্রান্ত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৬% স্বল্প, ৩২% মোটামুটি, ৮% অনেক, ২% মোটেও আন্তরিক নয় ও মন্তব্য নেই ২%।

সারণি-২০ : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শারি‘আহ আইন প্রয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতটুকু সক্ষম সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৫০)**	**শতকরা হার (%)**
বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শারি‘আহ আইন প্রয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতটুকু সক্ষম?	যথেষ্ট সক্ষম	২৫	৫০
	মোটামুটি সক্ষম	২১	৪২
	স্বল্প সক্ষম	৩	৬
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোটেও সক্ষম নয়	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শারি‘আহ আইন প্রয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে ৫০% যথেষ্ট সক্ষম, ৪২% মোটামুটি সক্ষম, ৬% স্বল্প সক্ষম ও ২% মন্তব্য নেই। এ অংশেও মোটেও সক্ষম নয় বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-২১ : বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় ইসলামি ব্যাংকসমূহের সক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি সক্ষম?	পুরোপুরি সক্ষম	২৯	৫৮
	মোটামুটি সক্ষম	১৩	২৬
	স্বল্প সক্ষম	৬	১২
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোটেও সক্ষম নয়	-	-
	মোট	৫০	১০০

উপরোক্ত ২১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণ বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় ইসলামি ব্যাংকসমূহের সক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৫৮% পুরোপুরি সক্ষম, ২৬% মোটামুটি সক্ষম, ১২% স্বল্প সক্ষম ও মন্তব্য নেই ২%। মোটেও সক্ষম নয় বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-২২ : ব্যাংকে ইসলামি শারি'আহ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দূর করার পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
ব্যাংকে ইসলামি শারি'আহ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর হতে পারে?	ইসলামী শারই' জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে	১৮	৩৬
	স্বতন্ত্র ইসলামি ব্যাংকিং আইন প্রবর্তন করে	১৬	৩২
	উপরের সবগুলো	১২	২৪
	পরিচালকগণের সদিচ্ছার উন্নয়ন ঘটিয়ে	৪	৮
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	৫০	১০০

উপরোক্ত ২২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংকে ইসলামি শারি'আহ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দূর করার পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৬% ইসলামি শারই' জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে, ৩২% স্বতন্ত্র ইসলামি ব্যাংকিং আইন প্রবর্তন করে, ২৪% উপরের সবগুলো, ৮% পরিচালকগণের সদিচ্ছার উন্নয়ন ঘটিয়ে। এখানে মন্তব্য নেই বলে কেউ উল্লেখ করেননি।

বাস্তবিকপক্ষে বলা যায় যে, গবেষণাকর্ম বাস্তবমুখী করার জন্য ইসলামি ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত ৫০ জন সম্মানিত নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট পৌঁছা সম্ভব হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে অধিকাংশ ব্যাংকারের বয়স ৩০-৫০ বছর সীমার মধ্যে ছিল (দ্র. সারণি-১) এবং তাদের সর্বোচ্চ সংখ্যক পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারি (দ্র. সারণি-২)। এ ব্যাংকারগণের মূল্যবান মতামতের আলোকে জানা গেছে ইসলামি শারি'আহ আইন পরিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা অনেক (দ্র. সারণি-৫)। তবে এরপরও তারা আশাবাদী ইসলামি ব্যাংকসমূহ যদি মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে আরও বেশি বিনিয়োগ প্রদান করে ও বিশেষ করে উৎপাদনমুখী বিভিন্ন

খাতের উন্নয়নে (দ্র. সারণি-১৩) অর্থায়ন আরো জোরদার করে তাহলে ইসলামি ব্যাংকসমূহের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইসলামি শারি'আহ বাস্তবায়নের সাথে সাথে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শারি‘আহ আইনের প্রায়োগিক বাস্তবতা : গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

ইসলামি ব্যাংকসমূহের গ্রাহকগণ ব্যাংকারগণের পাশাপাশি ইসলামি শারি‘আহ আইন পরিপালন সাপেক্ষে ব্যাংকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অগ্রগতিতে যথেষ্ঠ অবদান রেখে চলেছে। নতুন ও পুরাতন উদ্যক্তাগণ ইসলামি ব্যাংকসমূহ থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করে নতুনভাবে উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন, পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে করছেন গতিশীল। প্রশ্নমালার এ অংশে ইসলামি ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শাখা থেকে বিনিয়োগ গ্রহণকারী সম্মানিত গ্রাহকগণের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখানে সম্মানিত গ্রাহকগণের সামনে ২৫টি প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছিল যার প্রথম তিনটি প্রশ্ন ছিল যথাক্রমে মতামত ব্যক্তকারী গ্রাহকের নাম, ব্যবসায়িক ঠিকানা ও বিনিয়োগকারী ব্যাংক ও শাখা সম্পর্কিত। চতুর্থ ও পঞ্চম প্রশ্নদ্বয় ছিল যথাক্রমে উত্তরদাতার বয়স/জন্ম তারিখ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ক, যা তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। নিচে প্রশ্নমালার আলোকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণসহ উপস্থাপিত হলো :

সারণি-২৩ : গ্রাহকগণের বয়স/জন্ম তারিখ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)*	শতকরা হার (%)
বয়স/জন্ম তারিখ	৩০-৫০ বছর৫০	৩০	৬০
	বছর ও তদুর্দ্ধ	১৮	৩৬
	২০-৩০ বছর	২	৪
	২০ বছরের নিচে	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

* N = গবেষণার অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যার সংখ্যা

বিনিয়োগ গ্রাহকগণের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার উপরোক্ত ৪নং প্রশ্নে উত্তরের জন্য কোন নির্দেশনা ছিল না। উত্তরদাতাগণের প্রদত্ত বয়স/জন্ম তারিখ থেকেই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে। উপরোক্ত ২৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫০ জন গ্রাহকের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০% মত দিয়েছেন ৩০-৫০ বছর বয়সের মধ্যে, ৩৬% উত্তর দিয়েছেন ৫০ বছর ও তদুর্দ্ধ এবং ৪% উত্তর দিয়েছেন ২০-৩০ বছর বয়সের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী গ্রাহকগণের মধ্যে কারও বয়স ২০ বছরের নিচে ছিল না।

সারণি-২৪ : গ্রাহকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	গ্রাজুয়েট	২২	৪৪
	এইচ.এস.সি	১২	২৪
	পোস্ট গ্রাজুয়েট	৮	১৬
	এস.এস.সি	৬	১২
	অন্যান্য	২	৪
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ গ্রাহকদের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার ৫নং প্রশ্নে উত্তরদাতা গ্রাহকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৪% গ্রাজুয়েট, ২৪% এইচ.এস.সি, ১৬% পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী, ১২% এস.এস.সি ও ৪% অন্যান্য।

সারণি-২৫ : গ্রাহকগণের ইসলামি ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণের কারণ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
আপনি ইসলামি ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করেছেন কেন?	ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবায়নে অংশ নিতে	২৮	৫৬
	ভাল সুযোগ-সুবিধার জন্য	১২	২৪
	অন্য ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা না পাওয়ায়	৮	১৬
	মন্তব্য নেই	২	৪
	কোনটিই নয়	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের ইসলামি ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণের কারণ সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তরদাতা গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৬% ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবায়নে অংশ নিতে, ২৪% ভাল সুযোগ-সুবিধার জন্য, ১৬% অন্য ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা না পাওয়ায়, ৪% মন্তব্য নেই। এখানে কোনটিই নয় প্রশ্নে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-২৬ : ইসলামি ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
ইসলামি ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আপনি কতটুকু অবহিত?	মোটামুটি	২৪	৪৮
	তেমন অবহিত নই	১৮	৩৬
	স্বল্প	৬	১২
	সম্পূর্ণ	১	২
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামি ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৮% মোটামুটি, ৩৬% তেমন অবহিত নই, ১২% স্বল্প, ২% সম্পূর্ণ ও ২% মন্তব্য নেই।

সারণি-২৭ : ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?	মোটামুটি	৩৫	৭০
	অনেক	৯	১৮
	স্বল্প	৫	১০
	মন্তব্য নেই	১	২
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	-	-
মোট		৫০	১০০

উপরোক্ত ২৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭০% মোটামুটি, ১৮% অনেক, ১০% স্বল্প ও ২% মন্তব্য নেই। তেমন ভূমিকা রাখছে না বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-২৮ : ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?	স্বল্প	৩০	৬০
	মোটামুটি	১৪	২৮
	তেমন ভূমিকা নেই	৩	৬
	মন্তব্য নেই	২	৪
	অনেক	১	২
মোট		৫০	১০০

উপরোক্ত ২৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০% স্বল্প, ২৮% মোটামুটি, ৬% তেমন ভূমিকা নেই, ৪% মন্তব্য নেই ও ২% অনেক।

সারণি-২৯ : ইসলামি ব্যাংক থেকে গ্রাহকগণ কোন্ ধরনের বিনিয়োগ গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
কোন্ ধরনের বিনিয়োগ গ্রহণ করতে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন?	বায়‘ মুরাবাহা	২৪	৪৮
	এইচপিএসএম	১৩	২৬
	মুশারাকা	১০	২০
	বায়‘ মুআজ্জাল	৭	১৪
	বায়‘ সালাম	৬	১২
মোট		৫০	১০০

উপরোক্ত ২৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামি ব্যাংক থেকে গ্রাহকগণ কোন্ ধরনের বিনিয়োগ গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সে সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৮% বায়' মুরবাহা, ২৬% এইচপিএসএম, ২০% মুশারাকা, ১৪% বায়' মুআজ্জাল ও ১২% বায়' সালাম।

সারণি-৩০ : শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?	মুশারাকা	১৮	৩৬
	এইচপিএসএম	১২	২৪
	বায়' মুআজ্জাল	৮	১৬
	বায়' সালাম	৭	১৪
	বায়' মুরাবাহা	৫	১০
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে সে সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর প্রদান করেছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৬% মুশারাকা, ২৪% এইচপিএসএম, ১৬% বায়' মুআজ্জাল, ১৪% বায়' সালাম ও ১০% বায়' মুরাবাহা।

সারণি-৩১ : শারি'আহ সম্মত বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শারি'আহ সম্মত বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?	মোটামুটি	২৪	৪৮
	অনেক	১৬	৩২
	স্বল্প	৭	১৪
	তেমন ভূমিকা রাখছেনা	২	৪
	মন্তব্য নেই	১	২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শারি'আহ সম্মত বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৮% মোটামুটি, ৩২% অনেক, ১৪% স্বল্প, ৪% তেমন ভূমিকা রাখছে না ও ২% মন্তব্য নেই।

সারণি-৩২ : প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সেবা কতখানি পৌঁছেছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সেবা কতখানি পৌঁছেছে?	স্বল্প	২২	৪৪
	মোটামুটি	২০	৪০
	পর্যাপ্ত	৫	১০
	মোটেওনা	২	৪
	মন্তব্য নেই	১	২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সেবা কতখানি পৌঁছেছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে মত ব্যক্ত করেছেন সর্বোচ্চ ৪৪% স্বল্প, ৪০% মোটামুটি, ১০% পর্যাপ্ত, ৪% মোটেওনা ও ২% মন্তব্য নেই।

সারণি-৩৩ : বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন?	দীর্ঘসূত্রিতা	২৪	৪৮
	কোন সমস্যা নেই	১৮	৩৬
	ব্যাংকের অসহযোগিতা	৪	৮
	অযথা হয়রানি	৩	৬
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন সে সম্পর্কিত বিষয়ে বেশির ভাগই বলেছেন দীর্ঘসূত্রিতা ৪৮%, কোন সমস্যা নেই ৩৬%, ব্যাংকের অসহযোগিতা ৮%, অযথা হয়রানি ৬ ও মন্তব্য নেই ২%।

সারণি-৩৪ : বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তা সমাধানে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
১৪ নং প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে করণীয় কি?	দ্রুত ও উন্নত সেবা প্রদান	২০	৪০
	যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান	১৭	৩৪
	নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন	৭	১৪
	কোন সমস্যা নেই	৫	১০
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তা সমাধানে করণীয় সম্পর্কিত বিষয়ে গ্রহাকগণ জবাব দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৪০% দ্রুত ও উন্নত সেবা প্রদান, ৩৪% বলেছেন যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা, ১৪% নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন, ১০% বলেছেন কোন সমস্যা নেই, ২% গ্রাহক মন্তব্য নেই বলে জবাব দিয়েছেন।

সারণি-৩৫ : যে সব খাতে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
কোন ধরনের খাতে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি বলে আপনি মনে করেন?	ট্রেডিং	১৭	৩৪
	ম্যানুফ্যাকচারিং	১৫	৩০
	সকল খাত	১২	২৪
	সার্ভিস	৫	১০
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, যে সব খাতে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি সে সম্পর্কিত বিষয়ে জরিপে অংশগ্রহণকারী গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৪% ট্রেডিং, ৩০% ম্যানুফ্যাকচারিং, ২৪% সকল খাতে ও ২% মন্তব্য নেই।

সারণি-৩৬ : শারি'আহ পরিপালনের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামি ব্যাংকিং-এ উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সফলতা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শারি'আহ পরিপালনের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামি ব্যাংকিং-এ উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি সফল?	মোটামুটি	৩৪	৬৮
	স্বল্প	১০	২০
	অনেক	৩	৬
	মোটেও সফল নয়	২	৪
	মন্তব্য নেই	১	২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শারি'আহ পরিপালনের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামি ব্যাংকিং-এ উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সফলতা সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৮% মোটামুটি, ২০% স্বল্প, ৬% অনেক, ৪% মোটেও সফল নয় ও ২% মন্তব্য নেই বলে মত দিয়েছেন।

সারণি-৩৭ : শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা যথাযথ কি না সে সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা যথাযথ মনে করেন কি?	অনেক	২৫	৫০
	মোটামুটি	১৯	৩৮
	স্বল্প	৪	৮
	মোটেও যথার্থ নয়	১	২
	মন্তব্য নেই	১	২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা যথাযথ কি না সে সংক্রান্ত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০% অনেক, ৩৮% মোটামুটি, ৮% স্বল্প, ২% মোটেও যথার্থ নয় ও ২% মন্তব্য নেই বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

সারণি-৩৮ : শারি'আহ অনুযায়ী পরিচালিত ইসলামি ব্যাংকসমূহ দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যে অবদান রাখছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শারি'আহ অনুযায়ী পরিচালিত ইসলামি ব্যাংকসমূহ দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কতখানি অবদান রাখছে?	অনেক	২৬	৫২
	মোটামুটি	১৫	৩০
	স্বল্প	৫	১০
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	৩	৬
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শারি'আহ অনুযায়ী পরিচালিত ইসলামি ব্যাংকসমূহ দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যে অবদান রাখছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে মত দিয়েছেন অংশগ্রহণকারী গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫২% অনেক, ৩০% মোটামুটি, ১০% স্বল্প, ৬% তেমন ভূমিকা রাখছে না ও ২% মন্তব্য নেই।

সারণি-৩৯ : বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?	অনেক	২৪	৪৮
	মোটামুটি	১৬	৩২
	স্বল্প	৭	১৪
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	২	৪
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৮% অনেক, ৩২% মোটামুটি, ১৪% স্বল্প, ৪% তেমন ভূমিকা রাখছে না ও ২% মন্তব্য নেই।

সারণি-৪০ : ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইন সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি জ্ঞাত সে সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইন সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি জ্ঞাত?	অনেক	২৮	৫৬
	মোটামুটি	১৫	৩০
	স্বল্প	৩	৬
	তেমন জ্ঞাত নয়	২	৪
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৪০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইন সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি জ্ঞাত সে সংক্রান্ত সে সংক্রান্ত বিষয়ে মত দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৬% অনেক, ৩০% মোটামুটি, ৬% স্বল্প, ৪% তেমন জ্ঞাত নয়, ও ২% মন্তব্য নেই।

সারণি-৪১ : শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহের আন্তরিকতা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহ শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে কতখানি আন্তরিক?	স্বল্প	২৪	৪৮
	মোটামুটি	১৭	৩৪
	মোটেও আন্তরিক নয়	৪	৮
	অনেক	৩	৬
	মন্তব্য নেই	২	৪
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৪১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহের আন্তরিকতা সংক্রান্ত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন সম্মানিত গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৮% স্বল্প, ৩৪% মোটামুটি, ৮% মোটেও আন্তরিক নয়, ৬% অনেক ও ৪% মন্তব্য নেই।

সারণি-৪২ : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শারি'আহ আইন প্রয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শারি'আহ আইন প্রয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতটুকু সক্ষম?	যথেষ্ট সক্ষম	২৭	৫৪
	মোটামুটি	১৪	২৮
	স্বল্প	৫	১০
	মোটেও সক্ষম নয়	৩	৬
	মন্তব্য নেই	১	২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৪২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শারি'আহ আইন প্রয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সক্ষমতা সম্পর্কিত সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারি গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৪% যথেষ্ট সক্ষম, ২৮% মোটামুটি সক্ষম, ১০% স্বল্প সক্ষম, ৬% মোটেও সক্ষম নয় ও ২% মন্তব্য নেই।

সারণি-৪৩ : বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামি ব্যাংকসমূহের সক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি সক্ষম?	পুরোপুরি সক্ষম	২৫	৫০
	মোটামুটি সক্ষম	১৫	৩০
	স্বল্প সক্ষম	৫	১০
	মোটেও সক্ষম নয়	৩	৬
	মন্তব্য নেই	২	৪
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৪৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা গ্রাহকগণের মধ্যে বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামি ব্যাংকসমূহের সক্ষমতা সম্পর্কে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৫০% পুরোপুরি সক্ষম, ৩০% মোটামুটি সক্ষম, ১০% স্বল্প সক্ষম, ৬% মোটেও সক্ষম নয় ও ৪% মন্তব্য নেই।

সারণি-৪৪ : ব্যাংকে ইসলামি শারি'আহ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দূর করার পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
ব্যাংকে ইসলামি শারি'আহ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা যায়?	উপরের সবগুলো	১৪	২৮
	ইসলামি ব্যাংকিং আইন প্রবর্তন করে	১৩	২৬
	ইসলামি অর্থনীতি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে	১২	২৪
	পরিচালকগণের সদিচ্ছার উন্নয়ন ঘটিয়ে	১০	২০
	মন্তব্য নেই	১	২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৪৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংকে ইসলামি শারি'আহ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দূর করার ব্যাপারে উত্তরদাতা গ্রাহকগণের মধ্যে মত ব্যক্ত করেছেন সর্বোচ্চ ২৮%

উপরের সবগুলো, ২৬% ইসলামি ব্যাংকিং আইন প্রবর্তন করে, ২৪% ইসলামি অর্থনীতি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে, ২০% পরিচালকগণের সদিচ্ছার উন্নয়ন ঘটিয়ে ও ২% মন্তব্য নেই ।

মূলত দেখা যায় যে, গবেষণাকর্ম বাস্তবমুখী করার জন্য ইসলামি ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শাখা থেকে বিনিয়োগ গ্রহণকারী ৫০ জন সম্মানিত গ্রাহকের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে অধিকাংশ গ্রাহকের বয়স ৩০-৫০ বছর সীমার মধ্যে ছিল (দ্র. সারণি ২৩)। সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রাহক গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী (দ্র. সারণি-২৪)। এ গ্রাহকগণের মূল্যবান মতামতের আলোকে জানা গেছে ইসলামি শারি'আহ আইন পরিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা মোটামুটি (দ্র. সারণি-২৭)। তবে তারা আশাবাদী ইসলামি ব্যাংকসমূহ যদি মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে আরও বেশি বিনিয়োগ করে ও বিশেষ করে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী খাতের উন্নয়নে (দ্র. সারণি-৩০) অর্থায়ন জোরদার করে তাহলে ইসলামি ব্যাংকসমূহের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইসলামি শারি'আহ আইন বাস্তবায়নের সাথে সাথে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দ্রুত অগ্রসর হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গবেষণালব্ধ প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা নিরসনে সুপারিশমালা

সুদভিত্তিক আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূচনা হয় ষোড়শ শতকে। এরপর চলে যায় কয়েক শতাব্দী। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ১৯৬৩ সালে ড. আহমাদ নাজ্জারের উদ্যোগে মিশরের মিটগামারে সর্বপ্রথম ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে এর সূচনা হয় ১৯৮৩ সালে। এরপর শুরু হয় এর ক্রমবিকাশ। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যাবধি এ স্বল্প সময়ে ইসলামি ব্যাংকগুলোর সাফল্য ঈর্ষণীয়।

ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের ধারণা অতি প্রাচীন হলেও মধ্যযুগে বিশেষত ইউরোপের শিল্প বিপ্লবকালে পাশ্চাত্যের শোষণমূলক নীতি, মুসলিমদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অর্থনীতি বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা ও ইসলামি অর্থনীতি প্রয়োগে কার্যকরী উদ্যোগের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের আত্মপ্রকাশে বিলম্ব ঘটে। এ সুযোগে পাশ্চাত্যের শোষক শ্রেণির উদ্ভাবিত ও চাপিয়ে দেয়া সুদভিত্তিক ব্যাংকিং গোটা পৃথিবীর অর্থনীতিকে গ্রাস করে নেয়। সে বিবেচনায় সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে তদুপরি নবীন হিসেবে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের পথচলা সহজ ছিল না। বহুমুখী সংকট ও সমস্যা মুকাবিলা করেই তাকে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হতে হয়েছে ও হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশোর্ধ দেশে ইসলামি ব্যাংকগুলো সাফল্যের সাথে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে অভিবাদনযোগ্য। এ অগ্রযাত্রায় ব্যাংকগুলোর উদ্যোক্তা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতা ও শ্রম অনস্বীকার্য।

সাফল্য ঈর্ষণীয় হলেও ইসলামি ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। এ অভিযোগগুলো দুই শ্রেণির। কিছু অভিযোগ একান্তই ইলমি ও ফিকহি জ্ঞান নির্ভর; ইসলামি অর্থায়ন নীতিমালা ও তার আধুনিক রূপায়ন বিষয়ক। অবশ্য ফিকহি তথা ইসলামি আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারা কেন্দ্রিক মতানৈক্য একটি স্বাভাবিক ও চলমান বিষয়। এতে ফকিহগণের দ্বিমত থাকতেই পারে। প্রবন্ধ-পুস্তক রচনা, ফিকহি সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে তারা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে স্বীয় মতামত ও মতানৈক্যের কারণ বর্ণনা করে থাকেন। তবে ফকিহ, ইসলামি অর্থনীতিবিদ, আলিম-উলামা ও বিদগ্ধ মহলেই এর বিচরণ সীমাবদ্ধ। সাধারণ্যে এর প্রভাব অতি সামান্যই। বাকি ব্যাপক ও মূল অভিযোগ হচ্ছে প্রায়োগিক। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম-উলামা ও সাধারণ্যে এ ধারণা বিরাজমান ও বদ্ধমূল যে, ইসলামি ব্যাংকগুলোর বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি মোটামুটিভাবে শারি‘আহসম্মত হলেও বাস্তবে ও কার্যত এর যথার্থ প্রয়োগ নেই। কেউ কেউ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এমন মন্তব্য করলেও অনেকে না জেনেই নিছক জনশ্রুত ও গুজব নির্ভর সূত্রে এমন মন্তব্য করে থাকেন। এদেরই অনেকে আবার ইসলামি ব্যাংককে সুদভিত্তিক ব্যাংকের চেয়েও মারাত্মক, জঘন্য ও ক্ষতিকর বলে সমালোচনা করে থাকেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে ইসলামি ব্যাংকও সুদ গ্রহণ করে। বাকি সুদি ব্যাংকগুলো সরাসরি গ্রহণ করে আর ইসলামি ব্যাংক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গ্রহণ করে।

অপরপক্ষে আরেকটি শ্রেণি কিছু সমস্যা রয়েছে স্বীকার করে একে সামগ্রিকভাবে ইসলামি ব্যাংক হিসেবেই মূল্যায়ন করে থাকেন। পক্ষের কেউ কেউ আবার এতে শতভাগ ইসলামি নীতিমালার বাস্তবায়ন হচ্ছে বলে দাবি করেন। তবে বিদগ্ধ জনের দৃষ্টিতে উভয় পক্ষেরই এখানে কিছু বাড়াবাড়ি

রয়েছে। তাদের মতে এতে শতভাগ শারি'আহ পরিপালন এখনো হয়ে উঠেনি; এটা সত্য। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অনেক ক্ষেত্রেই শারই' নীতিমালা লজ্ঘিত হয়। কিন্তু তাই বলে ইসলামি ব্যাংকগুলোকে সুদভিত্তিক ব্যাংকের সমতুল্য বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট আখ্যা দেয়া সমীচিন নয়। ইসলামিকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ ধারা অব্যাহত রয়েছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে।

যাহোক, বিরোধীদের সকল অভিযোগ সঠিক না হলেও ইসলামি ব্যাংকগুলো নিজেদের দায় এড়াতে পারে না। তাদের সাফল্যের পিছনে ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতির সুবিধাদি ছাড়াও ইসলামপ্রিয় আমানতকারীদের ভাবাবেগ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সুদমুক্ত, নির্ভেজাল ও বৈধ মুনাফা অর্জনের প্রেরণা থেকেই মানুষ তাদের হিসাবে অর্থ জমা রাখে। কর্মচারীরাও হালাল জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যেই এখানে চাকুরি করে। সে হিসেবে ব্যাংকের নীতি নির্ধারকগণ তাদের নিকট দায়বদ্ধ। কাজেই তাদের কর্তব্য হচ্ছে সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা না করে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে অভিযোগগুলোকে বিবেচনায় নেয়া এবং সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তার সমাধানে ব্রতী হওয়া।

নিম্নে সমস্যাসমূহের কিছু উৎস ও সমাধানে কিছু প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হলো। আন্তরিকতার সাথে এগুলোকে আমলে নেয়া হলে আশা করা যায় পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি ও সমস্যাবলির অনেকাংশ হ্রাস পাবে।

সমস্যার উৎস ও কারণ :

- সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে পরকালের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ভয় ও জ্ঞান না থাকা।
- সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার জাগতিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক কুফল সম্পর্কে ধারণা, ভাবনা ও ভয় না থাকা।
- রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনৈসলামি ও সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু থাকা।[২৪]
- সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রভাবে সর্বত্র অনৈসলামি ও শারি'আহ পরিপন্থী চুক্তি ও লেনেদেনের অবাধ বিস্তার।
- ইসলামি অর্থায়ন পদ্ধতি ও লেনদেনের শারই' রূপরেখা বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যাংকার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভাব।
- শারি'আহ ও জেনারেলের সমন্বিত জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অভাব।
- গ্রাহক পর্যায়ে ইসলামি নীতিমালা সম্পর্কে অজ্ঞতা।
- সুদ ও মুনাফার পার্থক্য না বুঝা।
- সুদভিত্তিক লেনদেনে তুলনামূলক পদ্ধতিগত সহজ লভ্যতা।
- ইসলামি অর্থনীতিকে যুগোপযোগী ও সহজভাবে উপস্থাপনে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত কৌশলের অপ্রতুলতা।
- ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ভোক্তাদের শারি'আহ পরিপালনে অবহেলা প্রদর্শন।

---

২৪. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

- সার্বিকভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দায়বোধের অভাব।
- অধিক ও দ্রুত মুনাফা অর্জনের প্রবণতা।
- শারি‘আহ লঙ্ঘনে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা না থাকা বা এর ঘাটতি থাকা।
- কেবল বিকল্প পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা।
- সহযোগী প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সমন্বয়ের অভাব।
- পর্যাপ্ত গবেষণা ও গবেষকের অভাব।
- মূলধারার আলিম-উলামাদের সাথে ইসলামি ব্যাংকারদের দূরত্ব ও সমন্বয়হীনতা।
- মাযহাব কেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্য ও সংকীর্ণতা।
- তড়িৎ মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রবণতা।
- ভিন্ন বিষয়ে যেমন রাজনৈতিক বা আদর্শগত বিষয়ে পারস্পরিক মত পার্থক্য এবং ক্ষেত্র বিশেষ বৈরী মনোবৃত্তি।

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিংয়ে শারি‘আহ আইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে আরো কিছু বিশেষ সমস্যাবলী রয়েছে। যেমন–

(ক) ইসলামি অর্থবাজারের অনুপস্থিতি;
(খ) নিয়ন্ত্রণমূলক ও তত্ত্বাবধানমূলক স্বতন্ত্র কাঠামোর অভাব;
(ঘ) সহযোগী ও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব।

ইসলামি অর্থবাজারের অনুপস্থিতি :

- বাংলাদেশে ইসলামি অর্থবাজারের অনুপস্থিতির কারণে ইসলামি ব্যাংকসমূহ তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল অর্থাৎ সাময়িক অতিরিক্তি তারল্য ‘সরকারি ট্রেজারি বিল’, ‘অনুমোদিত সিকিউরিটিজ’ বা ‘বাংলাদেশ ব্যাংক বিল’ ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। সুদের কারণে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামি ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত তারল্য-সঞ্চিতির অনুমোদিত অংশ এবং অতিরিক্ত তারল্য ঐ সমস্ত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করতে পারে না।[২৫]
- ইসলামি ব্যাংককে তার সকল জামানত বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ টাকায় জমা রাখতে হয়। এভাবে ইসলামি ব্যাংকের অতিরিক্ত তারল্য বিনিয়োগবিহীন অবস্থায় অলস পড়ে থাকে। ফলে ইসলামি ব্যাংকসমূহের মুনাফা অর্জনের উপর এর অবশ্যম্ভাবী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ইসলামি ব্যাংকসমূহের ‘ইসলামি মুদারাবা বন্ড’ চালুর দাবি ছিল দীর্ঘদিনের, যা অতি সম্প্রতি কার্যকরী হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ নেয়ায় গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (জিআইআইবি) নামে একটি শারি‘আহ অনুমোদিত বন্ড বাজারে এসেছে। এর বহুল প্রচার ও ব্যবহার প্রয়োজন।
- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর উদ্যোগে সম্প্রতি ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড (আইএমএফ) প্রবর্তন করা হয়েছে। এটিও শারি‘আহভিত্তিক হালাল ফান্ডে

---

২৫. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

ইসলামি ব্যাংকগুলোর অলস তহবিল বিনিয়োগে নতুন মাত্রা সংযোজন করবে। এ জাতীয় ইনস্ট্রুমেন্ট প্রচলিত ব্যাংকসমূহের সাথে অসম প্রতিযোগিতা হ্রাস করতে সহায়ক হবে। উপরন্তু ইসলামি কমন মার্কেট উন্নয়নে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

নিয়ন্ত্রণমূলক ও তত্ত্বাবধানমূলক স্বতন্ত্র কাঠামোর অভাব :

- বাংলাদেশ সরকার আইডিবি প্রতিষ্ঠার সনদে স্বাক্ষরকারী অন্যতম দেশ হিসেবে এ দেশের ব্যাংকব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে ইসলামিকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ এখনো খুব আশাপ্রদ নয়।

- আশির দশকের শুরুর দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জাতীয়করণকৃত ব্যাংকিং খাত পর্যায়ক্রমে ইসলামিকরণের লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল, যা নানা কারণে সফল হয়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক জাতীয়করণকৃত ব্যাংকিং খাত ইসলামিকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর বেসরকারি খাতে ইসলামি ব্যাংকিং চালু হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদেরকে ইসলামি শারি'আহর আলোকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে।

- বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে উৎসাহজনকভাবে দ্রুত বিকাশমান ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থাকে সহযোগিতা দান রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির অংশ। ইসলামি ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক ও তত্ত্বাবধানমূলক স্বতন্ত্র কাঠামো এখনো তৈরি হয়নি। অবিলম্বে এ ঘাটতি পূরণ হলে তা এ দেশের ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমে শৃঙ্খলা বিধানে সহায়ক হবে।

- ইসলামি ব্যাংকসমূহের জন্য একটি পৃথক আইনব্যবস্থা, লাইসেন্স-এর জন্য যথাযথ আবশ্যকতা নির্ধারণ, ন্যূনতম মূলধন ও তারল্যের পরিমাণ নির্ধারণ, ঝুঁকি পরিমাপিত সম্পদ শ্রেণিকরণের ব্যবস্থাসহ ইসলামি ব্যাংকসমূহের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বতন্ত্র সুবিবেচনাপ্রযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত।

- সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগে ইসলামি ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য একটি 'গাইড লাইন' প্রণয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন মহাব্যবস্থাপককে প্রধান করে একটি 'ফোকাস গ্রুপ' গঠন করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপটি ইসলামি ব্যাংকগুলোর জন্য একটি 'গাইড লাইন' প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

- সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কুয়ালালামপুর ভিত্তিক ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ডের সদস্য হয়েছে। দেশের ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ।

সহযোগী ও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব :

- কোন পদ্ধতিই কেবলমাত্র তার নিজস্ব উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারে না। তাকে আরো অনেক সহযোগী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হয়। এটা ইসলামি ব্যাংকের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। কোন উপযুক্ত প্রকল্প চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকগুলো অর্থনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, ব্যবস্থাপনা পরামর্শক, নিরীক্ষক এবং এরূপ আরো অনেক

প্রতিষ্ঠানের সেবার দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকসমূহের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট প্রয়োজন এবং চাহিদা পূরণের জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এখনো গড়ে উঠেনি।

- সিনিয়ার ইসলামি ব্যাংকারদের উন্নততর প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে কেন্দ্রীয়ভাবে কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নেই। এছাড়া কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানও এদেশে গড়ে উঠেনি।
- গ্রাহকদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্যও ইসলামি ব্যাংকসমূহের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ফোরামের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে এ ধরনের সহযোগী ও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেনি।

লক্ষ্যণীয় যে, ইসলামি ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং কার্যক্রমে শারি'আহর বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখী হচ্ছে। দেশের প্রচলিত আইন, আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি-প্রকৃতি, শারি'আহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণার অভাব, সমাজে ইসলামি অনুশাসনের অনুপস্থিতি ও নৈতিকতার অভাবসহ নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে শারি'আর প্রয়োগ কাঙ্খিত মানে হচ্ছে না। তবে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকিং কোম্পানি আইন প্রবর্তন করতে পারলে এবং যতটুকু আইন দেশে বলবৎ আছে তার আলোকে ক্রয়-বিক্রয় যতখানি সম্ভব কার্যকর করতে পারলে ইসলামি ব্যাংকিংয়ে শারি'আহ পরিপালনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে।

মূলত ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও তা ইসলামি শারি'আহ আইন পরিপালন সাপেক্ষে পরিচালনা করা শুধুমাত্র কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের একক দায়িত্ব নয়। বরং প্রত্যেক মুসলিমেরই দায়িত্ব এ লক্ষ্যে নিজের সাধ্যানুসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এ জন্য সকলেরই বিত্তশালী হওয়াও আবশ্যক নয়। সমর্থন, জনমত গঠন, জ্ঞানার্জন ইত্যাদির মাধ্যমেও কেউ এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। দায়িত্ব যেহেতু সকলের; কাজেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সকলেরই ইসলামি ব্যাংকের সমস্যা সমাধানকল্পে কিছু করণীয় রয়েছে।

উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে করণীয়

- সুদি অর্থনীতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলকে বিশেষত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সদা সতর্ক রাখার জন্য তাদের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনা জাগ্রত করা এবং এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ সেমিনার, এতদসংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রচার এবং এ লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিকস ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সংলাপ, আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- আখিরাতের ভয় আনয়ন ও তা জাগ্রত রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা।
- রাষ্ট্রীয়ভাবে সুদ বর্জনের উপায় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সচেতনতা তৈরি এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে এ বিষয়ে নিয়মিত মত বিনিময় করা।
- সুদ বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল করা।
- ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত যোগ্য কর্মীদল নিয়োগ করা।

- বিশেষত আরবি ও ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিতদের এ বিষয়ে বিবেচনা করা। তাদের জন্য জ্ঞানের পরিধি অনুসারে উপযোগী কার্যক্ষেত্রে নির্বাচন করা।
- কর্মীদের ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে অবগত করানোর উদ্দেশ্যে নিয়মিত ফিকহি সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ইসলামি অর্থনীতির খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক গ্রন্থাবলী সম্বলিত গ্রন্থাগার ও উন্মুক্ত পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা।
- ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে গবেষণাগার নির্মাণ, বাস্তব অর্থে গবেষক নিয়োগ ও গবেষণার যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করা।
- ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে লিখিত সহজপাঠ্য পুস্তক গ্রাহক, অনুসন্ধিৎসু ও শুভানুধ্যায়ীদের মাঝে বিতরণ করা।
- আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রহীতাদের অভিযোগ-অসন্তোষ জানা ও তাদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণের জন্য শীর্ষ কর্তাদের উপস্থিতিতে উন্মুক্ত গ্রাহক সভার আয়োজন করা।
- শারি'আহ পরিপালনে গ্রাহকরা কি জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হন, তা সরাসরি তাদের থেকে জেনে নিয়ে সমস্যার সমাধান করা।
- ইসলামি মনোভাবাপন্ন গ্রাহক বৃদ্ধির চেষ্টা করা।
- সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন ইসলামি বীমা কোম্পানি, ইসলামি এজেন্সি গঠনে অর্থায়ন করা।
- কার্যকরী ও দায়বদ্ধতাসম্পন্ন শারি'আহ বোর্ড গঠন করা।
- শারি'আহ বোর্ডে কেবল নিজ অঙ্গনের লোক বা হাইলাইটস লোক নির্বাচন না করে গ্রহণযোগ্য, মুখলিস, দায়বোধসম্পন্ন ও ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করা।
- শারি'আহ পরিপালন যথাযথভাবে হচ্ছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা।
- শারি'আহ পালনে অবহেলা ও শারি'আহ লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া।
- অর্থায়নের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শিরকাত ও মুদারাবা পদ্ধতি অবলম্বন করা।
- মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, ইজারা, সালাম বা ইসতিসনা চুক্তির ক্ষেত্রে এতদসংক্রান্ত শারই' নীতিমালা যথাযথ অনুসরণ করা।
- মুদারাবা ও মুশারাকার ক্ষেত্রে গ্রাহক সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছে কি না তা যাচাই করা এবং ব্যবসায়ের যাবতীয় হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষিত রাখতে বাধ্য করা।
- মুরাবাহা চুক্তির জন্য পৃথক বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়া।
- উকালা চুক্তির ক্ষেত্রে উকিল স্বীয় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা।
- কোন বিশেষ পর্যায়ে সুদি লেনদেনে জড়িত হতে বাধ্য হলে তার জন্য পৃথক হিসাবের ব্যবস্থা রাখা।
- বাধ্যতামূলক সুদ ও অন্য কোন অবৈধ খাত থেকে অর্জিত অর্থ ও জরিমানার বিকল্প বাধ্যতামূলক দানের অর্থ বৈধ, প্রশ্নমুক্ত ও শারই' কল্যাণমুখী খাতে ব্যয় নিশ্চিত করা।

- এ জাতীয় খাতের অর্থ শেয়ার হোল্ডার ও আমানতকারীদের মাঝে বণ্টিত না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আসলে গুজামিল ও এড়িয়ে যাওয়ার অভ্যাস পরিহার করা। গুরুত্ব সহকারে অভিযোগ আমলে নিয়ে, তা খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সকল পর্যায়ে শতভাগ সততা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

সাধারণ গ্রাহক, বিনিয়োগ গ্রাহক ও অন্যান্যদের করণীয়

- ইসলাম সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা।
- আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয় হৃদয়ে লালন করা।
- ইসলামি অর্থনীতির সাধারণ নীতিমালা সম্পর্কে জানা।
- ইসলামি অর্থনীতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুফল সম্পর্কে ও সুদভিত্তিক অর্থনীতির কুফল সম্পর্কে নিজে জানা এবং অন্যকে জানানো।
- আমানত সঞ্চয় বা বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ উলামাদের পরামর্শ নেয়া।
- যে পদ্ধতিতে সে বিনিয়োগ গ্রহণ করবে সে বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা।
- ব্যাংক থেকে প্রদত্ত নীতিমালার পাশাপাশি বিজ্ঞ আলিমগণ থেকেও তা জেনে নেয়া।
- সম্ভব হলে এ সম্পর্কে কোন সংক্ষিপ্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করা।
- বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামি অর্থায়ন নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়া। যেনতেনভাবে অর্থ প্রাপ্তির প্রবণতা পরিহার করা।
- ব্যাংককে তাদের শারি'আহ নীতি বাস্তবায়নে বাধ্য করা।
- কোন কর্মকর্তার শারি'আহ অনুকরণে অবহেলা বা গাফিলতি পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক তা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
- শারি'আহ পরিপালনে ন্যায়সংগত উপায়ে ব্যাংকের উপর চাপ অব্যাহত রাখা।
- পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিংকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এরূপ মনোবৃত্তি হৃদয়ে লালন করা।
- শারি'আহ পরিপালনে ব্যাংকের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকলে সেটাকে সাময়িক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা।
- কোন পর্যায়ে মুনাফা সন্দেহযুক্ত ও অবৈধ সাব্যস্ত হলে তা যথাযথ খাতে সদকা করে দেয়া।
- ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে নিজে বা বিজ্ঞ আলিমগণ থেকে সঠিক তথ্য যাচাই করা। যার তার কথায় প্রভাবিত না হওয়া।
- কেবল ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রেই নয়; বরং স্বীয় গোটা অর্থনৈতিক জীবনেই ইসলামি অর্থনীতি অনুসরণ করা।
- ইসলামি অর্থনীতির প্রসারে ভূমিকা রাখা।
- সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং মেধা ও শ্রমের সর্বাত্মক নিয়োগ করা।

- ইসলামি অর্থনীতির বিকাশ ও গবেষণায় অর্থায়ন করা এবং বিত্তবানদের এ মর্মে উৎসাহিত করা।
- আরবি ও ইসলামি শিক্ষার শিক্ষার্থীদের ইসলামি অর্থনীতির পাশাপাশি এর আধুনিক রূপায়ন ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের পরিভাষার সাথে পরিচিত করানো।
- কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামি অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফিন্যান্স বিভাগ প্রবর্তন করা।
- বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- ইসলামি অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফিন্যান্স সম্পর্কে না জেনে বা কেবলমাত্র সমালোচনার অভ্যাস বর্জন করা। জেনে-শুনে, বাস্তবতা উপলব্ধি করে গঠনমূলক সমালোচনা ও পর্যালোচনা অব্যাহত রাখা দোষণীয় নয়।
- কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা দলের উপর মিথ্যারোপের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করা।
- দীর্ঘ মেয়াদি বৃহত্তর লক্ষ্য ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা। 'বৃহত্তর স্বার্থে তুলনামূলক ক্ষুদ্র বিষয়ে সাময়িক ছাড়'– এ মূলনীতির বিষয়ে সচেতন থাকা।

সর্বশেষ সুপারিশমালা : বর্তমান পরিবেশে কিছু সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা মানবতার কল্যাণে এর কার্যক্রমের উন্নতি ও প্রসারের সুযোগ কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে। ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশ ও এর কল্যাণ জনগণের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে নিচে কয়েকটি ব্যাপারে বিশেষ কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো :

- দ্রুত বিকাশমান ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি সরবরাহের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে 'ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং' বিষয় এবং এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য কোর্স প্রবর্তন করা দরকার।
- ইসলামি ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ ও প্রেষণার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি ও তার পরিসর বিস্তৃত করা আবশ্যক।
- একজন ইসলামি ব্যাংকারের প্রশিক্ষণ-চাহিদা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (ক) আদর্শিক প্রশিক্ষণ, যা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত হবে; (খ) তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ, যা ব্যাংকারকে পদ্ধতিগত ব্যাংকিংয়ের সাথে সাথে ইসলামি মূল্যবোধ ও জীবনব্যবস্থা এবং ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দিবে এবং (গ) প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা।
- বিভিন্ন স্তরের ব্যাংকারদের জন্য নিয়মিত ইসলামি অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা, কেইস পর্যালোচনা, ওয়ার্কশপ, বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে।
- গ্রাহকদেরকে ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে অবগত করানোর জন্য ওয়েব সাইটের উন্নয়ন করা কর্তব্য।
- সকল ইসলামি ব্যাংকারদের জন্য ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করা যেতে পারে।

- মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতির অধীনে ইসলামি ব্যাংকের বিনিয়োগ পোর্টফোলিওকে বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘমেয়াদি খাতে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।
- ইসলামি ব্যাংকের গ্রাহকগণকে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে জরুরিভিত্তিতে উদ্যোগ নেয়া আবশ্যক।
- দৈনন্দিন কার্যক্রমের ব্যাপারে সমন্বিত নির্দেশনা লাভ ও গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইসলামি ব্যাংকসমূহ একটি সর্বসম্মত 'শারি'আহ ম্যানুয়েল' বা 'গাইড লাইন' প্রণয়ন করতে পারে।
- সকলের কাছে ইসলামি ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় ইসলামি ব্যাংকসমূহের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা আবশ্যক।
- ইসলামি ব্যাংকিং, অর্থনীতি এবং অর্থায়ন বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।
- বিশ্বব্যাপী ইসলামি ব্যাংকসমূহের মধ্যে সম্পর্ক-সহযোগিতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া দরকার।
- মুসলিম বিশ্বের যেসব দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতে আন্তঃবাণিজ্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুদবিহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে এবং এভাবেই ইসলামি কমন মার্কেট গঠনের পথ সুগম হতে পারে।
- মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহের সেন্ট্রাল ব্যাংকগুলো আরো অধিক দায়িত্বশীলতার সাথে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।
- এ্যাকাউন্টিং এন্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস (আওইফি) উদ্ভাবিত অভিন্ন ও সমন্বিত হিসাবপদ্ধতি ও মানদণ্ড সকল ইসলামি ব্যাংক তাদের সকল কার্যক্রমে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।
- লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অর্থায়নের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্য ব্যাংকার, বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও গবেষণার সমন্বয় সাধন করা দরকার।
- ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ক বইপত্র, জার্নাল, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, গবেষণপত্র ও প্রয়োজনীয় টেক্সট বুক রচনা ও প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।
- বিশ্বব্যাপী প্রচলিত পদ্ধতির কারণে সাধারণ ব্যাংকের মত ইসলামি ব্যাংকগুলোও পুঁজিপতিদের অর্থায়ন করছে। ফলে পুঁজিবাদকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকগুলোর অবদান থাকছে। এ অবস্থা থেকে বের হতে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের জন্য পৃথক আইন প্রণয়ন করা জরুরি।[২৬]
- প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিকস মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার ধারণা জনসাধারণের নিকটে ব্যাপকভাবে পরিচিত করার জন্য ইসলামি ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদগণকে ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সমন্বিত উদ্যোগের বিষয়ও বিবেচনা করা যেতে পারে।
- ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থায় আমানতকারী হবেন সম্পদের মালিক। তবে বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবস্থায় সঞ্চয়কারীর সম্পদ নেই। আর যারা সম্পদের মালিক তাদের সঞ্চয় নেই; ঋণের টাকায় তারা

---

২৬. সম্পাদক : মতিউর রহমান, *প্রথম আলো*(ঢাকা : ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২৯ অক্টোবর ২০১৭, বর্ষ ১৯, সং. ৩৪৯), পৃ. ১৩, কলাম-১

সম্পদশালী। বৈশ্বিক এ পদ্ধতির সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে ইসলামি ব্যাংকগুলোও পুঁজিপতিদের অর্থায়ন করছে। ভিন্ন আইনের মাধ্যমে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি।[২৭]

- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে অনলাইন ব্যাংকিং। তবে দুর্ঘটনা বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অনলাইন ব্যাংকিংয়ে চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে তথ্যের সঠিক উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ রয়েছে শতকরা ৬০ ভাগ ব্যাংকে; দক্ষ জনবলের অভাব ৮০ ভাগ ব্যাংকে; আইটি ও সাধারণ ব্যাংকিং বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের অভাব রয়েছে ৮০ ভাগ ব্যাংকে; দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনায় তহবিলের অভাব রয়েছে ৪৫ ভাগ ব্যাংকে। সাইবার হামলা, অগ্নিকাণ্ডসহ নানা দুর্ঘটনা আঘাত হানতে পারে দেশের ব্যাংকিং খাতে। আর এ দুর্ঘটনায় ডাটা সেন্টার ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা মুকাবিলায় দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যাংকেই ডাটা সেন্টারের দুর্ঘটনা মুকাবিলায় দক্ষ জনবল নেই। এছাড়া ৪০ ভাগ ব্যাংকের ডাটা সুরক্ষায় ব্যাক-আপ নেই। এতে ৭৫ ভাগ ব্যাংকের আইটি ম্যানেজমেন্ট সঠিক সেবা দিতে পারবে কি না প্রতিদিন সে আশংকায় থাকেন। দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় ঘটলে অনলাইন ব্যাংকিংয়ের সুরক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে। গ্রাহকদের স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত এ বিষয়ে গাইডলাইনের পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হবে। ব্যাংকিং খাতের আইটি কর্মকর্তাদের ব্যাংক বিজনেসের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। একই সাথে শাখা ব্যবস্থাপকদের আরো ভাল ধারণা থাকতে হবে। ব্যাংকিং খাতে দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অডিট সিস্টেম আরো শক্তিশালী করতে হবে। এছাড়া জেনারেল ব্যাংক কর্মকর্তাদের আইটি নলেজ বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলে গ্রাহকদের আমানত যথাযথভাবে সংরক্ষিত হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামি ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং কার্যক্রমে শারি'আহর বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখী হচ্ছে। দেশের প্রচলিত আইন, আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি-প্রকৃতি, শারি'আহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণার অভাব, সমাজে ইসলামি অনুশাসনের অনুপস্থিতি ও নৈতিকতার অভাবসহ নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে শারি'আর প্রয়োগ কাঙ্খিত মানে হচ্ছে না। তবে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকিং কোম্পানি আইন প্রবর্তন করতে পারলে এবং যতটুকু আইন এ দেশে প্রচলিত আছে তার আলোকে ক্রয়-বিক্রয় যতখানি সম্ভব কার্যকর করতে পারলে ইসলামি ব্যাংকিংয়ে শারি'আহ পরিপালনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হতে পারে।

---

২৭. সম্পাদক : মতিউর রহমান, *প্রথম আলো*, প্রাগুক্ত

উপসংহার

উপসংহার

আধুনিক সমাজের মানুষ তাদের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকব্যবস্থার বিকল্প চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা সুদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুদি অর্থায়নের ফলে একটি রূপক অর্থনীতির জন্ম নেয়; যা অস্থিরতা, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব এবং ধারাবাহিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে আকারেই সুদ খাওয়া হোক সুদখোররা আল্লাহর অপছন্দের মধ্যেই নিপতিত হবে। পৃথিবীর সুদখোরির ইতিহাস এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে। সুদ উচ্ছেদে সচেষ্ট হওয়া নিঃসন্দেহে সৎকাজ। আল্লাহতা'আলা ঘোষিত হারাম বর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে। এজন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে মু'মিনদের প্রস্তুত থাকা কাম্য। সুদের ভয়াবহ জুলুম শোষণ থেকে মানবতা মুক্তি পাক এটাই প্রত্যাশা। সুদের মত একটি মারাত্মক অভিশাপ ও জঘন্য পাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য অর্থনীতির সকল পর্যায় থেকে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং যাকাত-উশরসহ ইসলামের সকল সম্পদ ট্রান্সফার ম্যাকানিজম চালু করা বাঞ্ছনীয়। সর্বোপরি জনপ্রিয় ও সকলের জন্য কল্যাণকর ইসলামি অর্থনীতির প্রচলন করার জন্য সকল বিবেকবান নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে। সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলে ইহকালীন কল্যাণের পাশাপাশি পরকালের সাফল্যও নিশ্চিত হবে। এসব ধারণাকে সামনে রেখেই পৃথিবীতে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার উৎপত্তি ও তার ক্রমবিকাশ।

বাংলাদেশের মানুষও স্বভাবতই ধর্মানুরাগী। তাই 'ব্যবসা হালাল; সুদ হারাম' মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকের কিছু শাখা ও উইন্ডোও একই ধারায় পরিচালনা করার প্রয়াস পেয়ে যাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণ। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিদেশী ব্যাংকও ইসলামি আদর্শের আলোকে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ইসলামি ধারার ব্যাংকের ও শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচার-আচরণ, গ্রাহককে সেবা প্রদানের মানসিকতা সবকিছুতেই ভিন্ন ধরনের একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ এ ধারার ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে লেনদেন করতে সবচেয়ে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এ কারণে বিশ্বব্যাপী ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ধারণা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা পরিচালিত হয় শারি'আহ আইনের আলোকে। শারি'আহ আইন ইসলামেরই আইন। আর ইসলাম হচ্ছে আল্লাহতা'আলার মনোনীত দীন, যার বিভিন্ন বিধান রাসুলুল্লাহ সা.-এর উপর বিভিন্ন সময় নাযিল হয়েছে। সে সকল বিধানের আইনগত দিকটিই হল শারি'আহ। আর তার সম্মিলিত রূপ হলো আল-কুরআন। অতএব শারি'আহ আইন হচ্ছে কুরআনেরই আইন। অন্য কথায় বলা যায়, শারি'আহ আইনের অন্যতম প্রধান উৎস হল আল-কুরআন। এছাড়া সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসও শারি'আহ আইনের অন্যতম প্রধান উৎস। সৃষ্টির ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণই ইসলামি শারি'আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যে শারি'আহর নীতিমালাসমূহ সম্পর্কে সকল ব্যবসায়ী ও ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সকল জনগোষ্ঠীর অবগত হওয়া ও অনুসরণে আন্তরিক প্রয়াসী হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে

কোন প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার তার নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি প্রতষ্ঠান থাকা দরকার। তাই ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থায় শারি'আহর নীতিমালা বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য রয়েছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান; যাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে ইসলামি ব্যাংকসমূহ পর্যাক্রমে অতি দ্রুততার সাথে আর্থিক ও তাত্ত্বিক উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ইসলামি ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং কার্যক্রমে শারি'আহর বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখী হচ্ছে। দেশের প্রচলিত আইন, আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি-প্রকৃতি, শারি'আহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণার অভাব, সমাজে ইসলামি অনুশাসনের অনুপস্থিতি ও নৈতিকতার অভাবসহ নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে শারি'আর প্রয়োগ কাঙ্খিত মানে হচ্ছেও না। তবে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকিং কোম্পানি আইন প্রবর্তন করতে পারলে এবং যতটুকু আইন দেশে বিদ্যমান রয়েছে তার আলোকে ব্যবসা-বাণিজ্য যতখানি সম্ভব বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারলে ইসলামি ব্যাংকিংয়ে শারি'আহ পরিপালনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে। যার ফলশ্রুতিতে হালাল পন্থার অনুসরণ ও হারাম পন্থা বর্জনের প্রতিফল স্বরূপ ইহকালীন শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ এবং পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হবে।

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

শারি‘আহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সমাধান : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ বিষয়ে গ্রাহক ও ব্যাংকারগণের উপর জরিপের প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি

(এ জরিপ শুধুমাত্র গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য)

সাক্ষাৎকার বিবরণী (ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ)

Questionnaire for the Bankers

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারী‘আহ আইনের প্রয়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামি শারি‘আহ মুতাবিক পরিচালিত একটি ভিন্ন ধারার ব্যাংকব্যবস্থা। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামি ব্যাংকসমূহের অবদান অনেক। কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ আইনের প্রয়োগ কতটুকু হচ্ছে, কোন সমস্যা আছে কি না, সমস্যা থাকলে তা থেকে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরণের উপায় কি? এসব বিষয়ে ব্যাংকারগণ কতটুকু জানেন তা নির্ণয়ের জন্য এ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হচ্ছে। সংগৃহীত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং শুধু গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে।

১. নাম : ... .

২. পদবী : ... .

৩. ব্যাংক ও শাখার নাম : ... .

৪. বয়স/জন্ম তারিখ : ... .

৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা : (ক) এস.এস.সি (খ) এইচ.এস.সি (গ) গ্রাজুয়েট
: (ঘ) পোস্ট গ্রাজুয়েট (ঙ) অন্যান্য

৬. আপনি ইসলামি ব্যাংকে চাকুরি করছেন কেন?

(ক) চাকুরির উদ্দেশ্যে (খ) ভাল সুযোগ-সুবিধার জন্য
(গ) ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবায়নে অংশ নিতে (ঘ) কোনটিই নয়।

৭. ইসলামি ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?

(ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প
(ঘ) তেমন অবহিত নই (ঙ) মন্তব্য নেই।

৮. ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?
ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প
ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

৯. ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প
ঘ. তেমন ভূমিকা নেই ঙ. মন্তব্য নেই

১০. বিনিয়োগ গ্রাহকগণকে কোন ধরনের বিনিয়োগ প্রদানে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন?

ক. বায়' মুরাবাহা খ. বায়' মুয়াজ্জাল গ. এইচপিএসএম
ঘ. বায়' সালাম ঙ. মুশারাকা

১১. শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ক. বাই' মুরাবাহা খ. বাই' মুয়াজ্জাল গ. এইচপিএসএম
ঘ. বাই' সালাম ঙ. মুশারাকা

১২. শারি'আহ সম্মত বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

১৩. প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সেবা কতখানি পৌঁছেছে?

ক. পর্যাপ্ত খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেওনা ঙ. মন্তব্য নেই

১৪. বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন?

ক. গ্রাহকের অসহযোগিতা খ. দীর্ঘসূত্রিতা গ. চাপ প্রয়োগ
ঘ. কোন সমস্যা নেই ঙ. মন্তব্য নেই

১৫. ১৪নং প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে করণীয় কি?

ক. গ্রাহকদেরকে মোটিভিশন খ. দ্রুত সেবা প্রদান গ. যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান
ঘ. কোন সমস্যা নেই ঙ. মন্তব্য নেই

১৬. কোন ধরনের খাতে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি বলে আপনি মনে করেন?

ক. ট্রেডিং খ. ম্যানুফ্যাকচারিং গ. সার্ভিস ঘ. সকল খাত ঙ. মন্তব্য নেই

১৭. শারি'আহ পরিপালনের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামি ব্যাংকিং-এ উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি সফল?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেও সফল নয় ঙ. মন্তব্য নেই

১৮. শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা যথাযথ মনে করেন কি?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেও যথার্থ নয় ঙ. মন্তব্য নেই

১৯. শারি'আহ অনুযায়ী পরিচালিত ইসলামি ব্যাংকসমূহ দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কতখানি অবদান রাখছে?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

২০. বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

২১. ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইন সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি জ্ঞাত?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ওয়াকিফহাল নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২২. ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহ শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে কতখানি আন্তরিক?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেও আন্তরিক নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২৩. বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শারি'আহ আইন প্রয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতটুকু সক্ষম?

ক. যথেষ্ট সক্ষম খ. মোটামুটি সক্ষম গ. স্বল্প সক্ষম ঘ. মোটেও সক্ষম নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২৪. বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি সক্ষম?

ক. পুরোপুরি সক্ষম খ. মোটামুটি সক্ষম গ. স্বল্প সক্ষম
ঘ. মোটেও সক্ষম নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২৫. ব্যাংকে ইসলামি শারি'আহ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর হতে পারে?

ক. ইসলামি শারই' জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে খ. স্বতন্ত্র ইসলামি ব্যাংকিং আইন প্রবর্তন করে
গ. পরিচালকগণের সদিচ্ছার উন্নয়ন ঘটিয়ে ঘ. উপরের সবগুলো ঙ. মন্তব্য নেই

শারি'আহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সমাধান : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ বিষয়ে গ্রাহক ও ব্যাংকারগণের উপর জরিপের প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি

(এ জরিপ শুধুমাত্র গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য)

সাক্ষাৎকার বিবরণী (গ্রাহক দৃষ্টিকোণ)

Questionnaire for the Customer

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারী'আহ আইনের প্রয়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামি শারি'আহ মুতাবিক পরিচালিত একটি ভিন্ন ধারার ব্যাংকব্যবস্থা। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামি ব্যাংকসমূহের অবদান অনেক। কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইনের প্রয়োগ কতটুকু হচ্ছে, কোন সমস্যা আছে কি না, সমস্যা থাকলে তা থেকে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরণের উপায় কি? এসব বিষয়ে গ্রাহকসাধারণ কতটুকু জানেন তা নির্ণয়ের জন্য এ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হচ্ছে। সংগৃহীত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং শুধু গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে।

১. গ্রাহকের নাম : ... .

২. ব্যবসায়িক ঠিকানা : ... .

৩. ব্যাংক ও শাখার নাম : ... .

৪. বয়স/জন্ম তারিখ : ... .

৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা : (ক) এস.এস.সি (খ) এইচ.এস.সি (গ) গ্রাজুয়েট
(ঘ) পোস্ট গ্রাজুয়েট (ঙ) অন্যান্য

৬. আপনি ইসলামি ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করেছেন কেন?

(ক) অন্য ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা না পাওয়ায় (খ) ভাল সুযোগ-সুবিধার জন্য
(গ) ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবায়নে অংশ নিতে (ঘ) কোনটিই নয় (ঙ) মন্তব্য নেই

৭. ইসলামি ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আপনি কতটুকু অবহিত?

(ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প
(ঘ) তেমন অবহিত নই (ঙ) মন্তব্য নেই।

৮. ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

৯. ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?
ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা নেই ঙ. মন্তব্য নেই

১০. কোন ধরনের বিনিয়োগ গ্রহণ করতে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন?

ক. বায়‘ মুরাবাহা খ. বায়‘ মুয়াজ্জাল গ. এইচপিএসএম
ঘ. বায়‘ সালাম ঙ. মুশারাকা

১১. শারি‘আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ক. বায়‘ মুরাবাহা খ. বায়‘ মুয়াজ্জাল গ. এইচপিএসএম
ঘ. বায়‘ সালাম ঙ. মুশারাকা

১২. শারি‘আহ সম্মত বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

১৩. প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ব্যাংকসমূহের সেবা কতখানি পৌঁছেছে?

ক. পর্যাপ্ত খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেওনা ঙ. মন্তব্য নেই

১৪. বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন?

ক. ব্যাংকের অসহযোগিতা খ. দীর্ঘসূত্রিতা গ. অযথা হয়রানি
ঘ. কোন সমস্যা নেই ঙ. মন্তব্য নেই

১৫. ১৪ নং প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে করণীয় কি?

ক. নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন খ. দ্রুত ও উন্নত সেবা প্রদান গ. যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান
ঘ. কোন সমস্যা নেই ঙ. মন্তব্য নেই

১৬. কোন ধরনের খাতে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি বলে আপনি মনে করেন?
ক. ট্রেডিং খ. ম্যানুফ্যাকচারিং গ. সেবা ঘ. সকল খাত ঙ. মন্তব্য নেই

১৭. শারি‘আহ পরিপালনের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামি ব্যাংকিং-এ উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি সফল?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেও সফল নয় ঙ. মন্তব্য নেই

১৮. শারি‘আহ আইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ভূমিকা যথাযথ মনে করেন কি?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেও যথার্থ নয় ঙ. মন্তব্য নেই

১৯. শারি‘আহ অনুযায়ী পরিচালিত ইসলামি ব্যাংকসমূহ দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কতখানি অবদান রাখছে?
ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

২০. বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

২১. ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি‘আহ আইন সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি জ্ঞাত?
ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন জ্ঞাত নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২২. ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহ শারি'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে কতখানি আন্তরিক?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেও আন্তরিক নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২৩. বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শারি'আহ আইন প্রয়োগে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতটুকু সক্ষম?

ক. যথেষ্ট সক্ষম খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেও সক্ষম নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২৪. বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামি ব্যাংকসমূহ কতখানি সক্ষম?

ক. পুরোপুরি সক্ষম খ. মোটামুটি সক্ষম গ. স্বল্প সক্ষম
ঘ. মোটেও সক্ষম নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২৫. ব্যাংকে ইসলামি শারি'আহ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা যায়?

ক. ইসলামি অর্থনীতি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে খ. স্বতন্ত্র ইসলামি ব্যাংকিং আইন প্রবর্তন করে
গ. পরিচালকগণের সদিচ্ছার উন্নয়ন ঘটিয়ে ঘ. উপরের সবগুলো ঙ. মন্তব্য নেই

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

আরবি উৎস

١. القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم

٢. أبو عبدالله محمد ابن اسماعيل البخاري : صحيح البخاري، بيروت : دار ابن كثير للنشر والطباعة، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

٣. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري : الصحيح لِمسلم، دمشق : دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ

٤. أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي : جامع الترمذي، لاهور : مكتبة العلم بدون التاريخ

٥. أبو داود سليمان بن الأشعث : سنن أبي داود، الرياض : مكتبة دار السلام، ٢٠٠٨م

٦. شاه ولي الله الدهلوي : حجة الله البالغة، بيروت : دار الفكر، ١٤١٠هـ

٧. مجلس الْمراجعة : دائرة الْمعارف الإسلامية، بيروت : دار الفكر، ١٩٣٣م

٨. الفقه الإسلامي وأصوله

বাংলা উৎস

৯. মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী : *আরবী বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

১০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৭

১১. ড.আবদুল আজিজ আল-নাজ্জার : *ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন?* অনূঃ ও সম্পাদনা, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা : আইবিবিএল, ১৯৮৪

১২. সম্পাদনা পরিষদ : *ফিকহে হানাফরি ইতিহাস ও দর্শন*, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৪

১৩. সম্পাদনা পরিষদ : *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫

১৪. এম. আযীযুল হক : *ইসলামী ব্যাংক : কতিপয় ভ্রান্তিমোচন*, অনূঃ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬

১৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, জুলাই ২০১০

১৬. মোহাম্মদ জিয়াউল হক : *আল কুরআনের আলোকে অর্থনীতি*, ঢাকা : প্রিয়বই প্রকাশনী, ২০০২

১৭. এ. জেড. এম. শামসুল আলম : *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, মে, ১৯৯৯

১৮. এ. জেড. এম. শামসুল আলম : *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, ঢাকা : ইফাবা, নভেম্বর ২০০৩

১৯. প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী : রাজশাহী স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, এপ্রিল, ২০০৫

২০. প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : *ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৪

২১. এম. এ হামিদ : *ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, অনুবাদ ও সম্পাদনা, প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯

২২.	সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী	:	*সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*, অনূঃ আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০০
২৩.	ড. এম ওমর চাপড়া	:	*ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, অনূঃ ড. মাহমুদ আহমদ, ঢাকা : বিআইআইটি, ২০০০
২৪.	ড. এম ওমর চাপড়া	:	*ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, অনূঃ ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, এ কে এম সালেহ উদ্দীন, খন্দকার রাশেদুল হক, আমানুল্লাহ, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০
২৫.	ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী	:	*ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা*, অনূঃ এম.এম. ছলিমুল ওয়াহেদ, ঢাকা : জাবাল-এ-নূর প্রকাশনী, মার্চ ২০০৭
২৬.	অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন	:	*ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংকব্যাবস্থা*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, অক্টোবর ১৯৯৬
২৭.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম	:	*ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯৮
২৮.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম	:	*ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, মে ১৯৯৬
২৯.	ইকবাল কবীর মোহন	:	*ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, ঢাকা : জেরিন পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১০
৩০.	ইকবাল কবীর মোহন	:	*আধুনিক ব্যাংকিং*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, অক্টোবর ২০০৩
৩১.	মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী	:	*সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?* ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৮
৩২.	মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী	:	*ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা*, ঢাকা : আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, এপ্রিল ২০০১
৩৩.	তাজুল ইসলাম ও আবু তাহের মোঃ সালেহ	:	*ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, মে ১৯৮৪
৩৪.	মোহাম্মদ ইসমাঈল খান	:	*ইসলামের দৃষ্টিকে সুদ ও ব্যবসা*, ঢাকা : মীর পাবলিকেশন্স, ২০০১
৩৫.	মোঃ শামসুল কবির খান	:	*বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ডিসেম্বর ২০০০
৩৬.	ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী	:	*ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, চট্টগ্রাম : গাউছিয়া হক মঞ্জিল, মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, ১৯৯৮
৩৭.	মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী	:	*ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, ঢাকা : দারুল ইবতিকার, এপ্রিল ২০০০
৩৮.	এম. এ মান্নান	:	*ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, অনূঃ আলী আহমেদ রুশদী, ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩
৩৯.	মাওলানা হিফজুর রহমান	:	*ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, অনূঃ মাওলানা আব্দুল আওয়াল, ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০০২
৪০.	মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী	:	*তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, অনূঃ ও সম্পা. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.
৪১.	মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী	:	*ইসলামের অর্থ বন্টন ব্যবস্থা*, অনূঃ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৫

৪২.	সম্পাদনা পরিষদ	:	*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫
৪৩.	ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী	:	*শরীয়তের দৃষ্টিতে অংশীদারী কারবার*, অনূঃ কারামত আলী নিযামী, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০০
৪৪.	ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী	:	*সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা*, অনূঃ কারামত আলী নিযামী, ঢাকা : আঞ্জুমানে মুছান্নিফিন, ১৯৯৫
৪৫.	এ. বি. এম হোসাইন	:	*ইসলামে বাণিজ্য আইন*, অনূঃ এম রুহুল আমিন, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০০
৪৬.	মুহাম্মদ মুবারক হুসেইন	:	*ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*, সপ্তপদী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯
৪৭.	মুহাম্মদ মুবারক হুসেইন	:	*জেনারেল ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*, সপ্তপদী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২
৪৮.	এ.এ.এম হাবীবুর রহমান	:	*ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : প্রকাশিকা- হেলেনা পারভীন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, জানুয়ারি ২০০৪
৪৯.	বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী	:	*ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : সমস্যা ও সমাধান*, অনূঃ মুফতী মুহাম্মদ জাবের হোসাইন, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, অক্টোবর ২০০৫
৫০.	বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী	:	*সুদ নিষিদ্ধ পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, অনূঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা : নতুন সফর প্রকাশনী, মার্চ ২০০৭
৫১.	মোঃ মুখলেছুর রহমান	:	*ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শারী‘আহ্ বোর্ড*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শারী‘আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, জুন ২০০৪
৫২.	ড. মুহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা	:	*এ হ্যান্ডবুক অব ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন*, ঢাকা : প্রকাশিকা- সাহেরা হায়দার, ডিসেম্বর ২০০০
৫৩.	ড. মুহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা	:	*এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং কাস্টমস এন্ড প্র্যাকটিস*, ঢাকা : প্রকাশিকা- সাহেরা হায়দার, ২০০৮
৫৪.	মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান,	:	*ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্ : পরিপালন * প্রয়োগ * পদ্ধতি*, ঢাকা কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৬
৫৫.	মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা	:	*ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা : ইসলামী শরীয়াহ্‌র আলোকে সঠিক বক্তব্য*, ঢাকা : ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০০৪
৫৬.	এ.কে.এম. নুরুল ইসলাম	:	*ইউনিক ব্যাংকিং*, ঢাকা : প্রকাশক- তাসনীম জাহান, ডিসেম্বর ২০০৫
৫৭.	আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ	:	*ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব ● প্রয়োগ ● পদ্ধতি*, ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, এপ্রিল ২০০৪
৫৮.	এম. জামান হোসেন	:	*শিল্প অর্থনীতি*, ঢাকা : সুপ্রীম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৫৯.	রেজাউল করিম সিদ্দিক ও মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার	:	*ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : ন্যাশনাল লাইব্রেরী, জুন ২০০৪

৬০.	মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান	:	*বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন,* ঢাকা : দি যমুনা পাবলিশার্স, অক্টোবর ২০০৫
৬১.	ড. মোল্লা জালালউদ্দিন	:	*শিল্প অর্থনীতি,* ঢাকা : মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০৮
৬২.	সম্পাদকমণ্ডলী	:	*শিল্পায়ন ও উন্নয়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষিত,* ঢাকা : প্যানোরমা পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ১৯৯৭
৬৩.	মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা	:	*ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহর নীতিমালা,* ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, সেপ্টেম্বর ২০১১
৬৪.	সম্পাদনা পরিষদ	:	*ইসলামী ফিকহ্ বিশ্বকোষ,* ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, নভেম্বর ২০১৫
৬৫.	সম্পাদনা পরিষদ	:	*ইসলামী আইন,* ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, মে ২০১৭
৬৬.	মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী	:	*ইসলামী ফিকহের ঐতিহাসিক পটভূমি,* অনূঃ আবদুল মান্নান তালিব, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ডিসেম্বর ২০১৭
৬৭.	মুহাম্মদ রুহুল আমিন	:	*ইসলামী আইনের উৎস,* ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, আগস্ট ২০১৩
৬৮.	এ. বি. সিদ্দিক	:	*চুক্তি আইন,* ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, নভেম্বর ২০১১
৬৯.	বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী	:	*আল-হিদায়া,* অনূঃ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ, ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ২০১৪
৭০.	ড. মুসতাফা হুসনী আস-সুবায়ী	:	*ইসলামী শরীআহ ও সুন্নাহ,* অনূঃ এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০৭
৭১.	সম্পাদনা পরিষদ	:	*ইসলামী অর্থনীতি,* ঢাকা : ইফাবা, অক্টোবর ২০০৪
৭২.	ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ	:	*ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্ট ব্যবস্থা,* ঢাকা : ইফাবা, ফেব্রুয়ারি ২০১০
৭৩.	আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী	:	*ইসলামে হালাল-হারামের বিধান,* অনূঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা : কায়রুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
৭৪.	আল্লামা মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান	:	*ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার,* অনূঃ ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ঢাকা : ইফাবা, সেপ্টেম্বর ২০১০

ইংরেজি উৎস

75.	Nasiruddin Ahmed	:	*Banking, Finance and Economics,* Dhaka : published by Shamarukh Nasir, 2nd Edition, October 2000
76.	Abdur Raquib	:	*Principle & Practice of Islamic Banking,* Dhaka : Panam Press Ltd., 2007
77.	Dr. Khurshid Ahmed	:	*Economic Development in an Islamic Framework,* Leicester : The Islamic Foundation, 1979
78.	Board of Editors	:	*Thought on Islamic Banking,* Dhaka : Islamic Economic Research Bureau, 1982
79.	M. Umar Chapra	:	*Islam and economic development : a strategy for development with justice and stability,* Islamabad : International Institute of Islamic Thoughts, Islamic Research Institute, 1993

80. Dr. M. Nejatullah Siddiqui : *Banking Without Interest,* Leicester : The Islamic Foundation, 1983

81. Board of Editors : *Text Book on Islamic Banking,* Dhaka : Islamic Economics Research Bureau, November 2008

82. Ansar Ali Khan : *The Negotiable Instruments Act, 1881,* Dhaka : New Warsi Book Corporation, 2007

83. Board of Editors : *Bangladesh Economic Review 2016,* Dhaka : Economic Adviser's Wing, Finance Division, Ministry of Finance, 2017

বিভিন্ন বই, পুস্তিকা ও প্রতিবেদনসমূহ

৮৪. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি, ঢাকা : আইবিবিএল, জুলাই ২০১০

৮৫. ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, জানুয়ারি ২০১৪

৮৬. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১০-২০১৬)

৮৭. বাংলাদেশ ব্যাংক-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১০-২০১৬)

৮৮. ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬

৮৯. অর্থনীতি গবেষণা, ঢাকা, সংখ্যা ৩, নভেম্বর ২০০২, সংখ্যা ৪, জুলাই ২০০৩, সংখ্যা ১০, ডিসেম্বর ২০০৮, সংখ্যা ১৪, নভেম্বর ২০১৩

৯০. শিল্পনীতি ২০১০, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯১. শিল্পনীতি ২০১৬, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯২. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯৩. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০১৬।

৯৪. ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট।